বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত গবেষণা-নিবন্ধ(কলাবিভাগ)

গবেষিকা

তিথি নস্কর

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervixion of Prof. Gangadhar Kar. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted befoere for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Candidate :

Professor (Dr.) Gangadhar Kar (Tithi Naskar)

Dated : Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদগুরুম্।

পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ'।

শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর অশেষ কৃপা এবং পিতা-মাতা-গুরুজনদের আশীর্বাদে আমি আমার গবেষণা-নিবন্ধটির একটি আকার প্রদানে সমর্থ হয়েছি। নিবন্ধীকৃত গবেষণা-নিবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রদত্ত হয়েছে। আমার গবেষণা-নিবন্ধটির শিরোনাম হল – 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ'।

প্রদত্ত গবেষণা-নিবন্ধখানি রচনা করতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধার সহিত বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি। মহান ঋষিগণের চিন্তাপ্রসূত নানা তত্ত্ব ও তথ্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সংগ্রহ করেছি। ইতিহাস, পুরাণ, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নানা গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, চর্চা গ্রন্থ, আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থ, বিভিন্ন প্রকাশনা হতে প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থ এবং অসংখ্য পত্র-পত্রিকা হতে মর্মার্থ গ্রহণ করেছি। স্থলবিশেষে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ ও অনুবাদ গ্রন্থ হতে অংশবিশেষ এই গবেষণা নিবন্ধটিতে অবিকলভাবে গৃহীত হয়েছে। তাই এইসকল শাস্ত্রাচার্য, অনুবাদক, গ্রন্থকার সকলের প্রতি বিনম্র চিত্তে ঋণ স্বীকার করি।

যাঁর আশীর্বাদ ও সহযোগীতায় এই গবেষণা নিবন্ধটির নির্দিষ্ট আকার প্রদান সম্ভবপর হয়েছে, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক শ্রী গঙ্গাধর কর মহাশয়। যখন নানান সাংসারিক ও শারীরিক ক্লেশাদিতে জর্জরিত, নিজ কাজের অভিমুখ হতে বিচ্যুত তখন যিনি পিতার ন্যায় কখনও শাসন করে, আবার কখনও পরম স্নেহে বুঝিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় যখনই কোনও বিষয় আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তখনই তিনি তার শত ব্যস্ততার মাঝে তাঁর মূল্যবান সময় আমার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। দীর্ঘ গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সুচিন্তিত মূল্যবান উপদেশাবলী আমার বিচ্ছিন্ন চিন্তারাশিকে সুমার্জিত ও সুসংহত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। আমি তাঁর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

এরপর সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাব আমার পরমারাধ্য পিতা শ্রী জগদীশ নস্কর এবং মাতা শ্রীমতী রীনা নস্করকে; যাঁদের আশীর্বাদ, অশেষ স্নেহ ও নিরন্তর উৎসাহ আমাকে আজ আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিশেষ সহায়তা করেছে। স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ হালদার, পিতৃসম শ্বশুর মহাশয় শ্রী সুবল চন্দ্র হালদার এবং মাতৃসমা শাশুড়ি-মাতা শ্রীমতী বন্দনা হালদারের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ কাজের শেষের দিকে পারিবারিকভাবে ওনাদের সহযোগীতা না পেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করাই সম্ভব হত না। তাই ওনাদেরকে আমার বিনম্র প্রণাম ও সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এখন আমি কৃতজ্ঞতা জানাব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকামণ্ডলীকে, যাঁরা নানানভাবে প্রতিনিয়ত আমাকে সহায়তা করে গেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মীবৃন্দের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ সকল সময় বিনয়ের সঙ্গে গ্রন্থ প্রভৃতি সরবরাহ করে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করেছেন। একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক) গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) -এর সকল কর্মীবৃন্দের প্রতিও আমি সমভাবেই কৃতজ্ঞ।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধিক সময় ধরে বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে নানান বই, নথি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য ভাই সুমন নস্করকে আন্তরিক শুভকামনা ও সাধুবাদ জানাই। আমার সহপাঠীনি শ্রীমতী নিরুপমা দাস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমার সমস্ত লেখাগুলির প্রুফ-সংশোধন, অংশবিশেষে সংযোজন এবং সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি নানাভাবে সহায়তা করেছে। তাই ঈশ্বরের নিকট এদের সকলের প্রতিকূলতাহীন নীরোগ দীর্ঘজীবন এবং সর্বাঙ্গীন সমুন্নতি কামনা করি।

বিনীতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ, কলকাতা – ৭০০০৩২
তাং -

(তিথি নস্কর)
রেজিঃ নং - A00PH1201318

বিষয় সূচী

	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	i-vi
প্রথম অধ্যায়ঃ ভারতীয়দর্শনে পদার্থতত্ত্ব	**১-৭৩**
পদার্থ-বিষয়ে চার্বাকদর্শনের অভিমত	৩-৭
পদার্থ-বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের অভিমত	৭-১৬
বৈভাষিক মত	৮-৯
সৌত্রান্তিক মত	৯-১০
যোগাচার মত	১০-১১
মাধ্যমিক মত	১২-১৬
পদার্থ-বিষয়ে জৈনদর্শনের অভিমত	১৬-২২
পদার্থ-বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের অভিমত	২২-২৮
পদার্থ-বিষয়ে যোগদর্শনের অভিমত	২৮-৩১
পদার্থ-বিষয়ে ন্যায়দর্শনের অভিমত	৩১-৩৪
পদার্থ-বিষয়ে মীমাংসাদর্শনের অভিমত	৩৫-৪৭
পদার্থ-বিষয়ে বেদান্তদর্শনের অভিমত	৪৭-৭০
অদ্বৈত মত	৪৮-৫৪
বিশিষ্টাদ্বৈত মত	৫৫-৬৩
দ্বৈত মত	৬৩-৭০
পদার্থ-বিষয়ে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অভিমত	৭০-৭৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বৈশেষিক-দর্শনে পদার্থতত্ত্ব	**৭৪-২৩২**
ন্যায় পদার্থতত্ত্ব	৭৬-১১৪
বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব	১১৪-২৩২
দ্রব্য	১১৯-১৫৭
গুণ	১৫৭-১৭৫
কর্ম	১৭৫-১৭৯
সামান্য	১৭৯-১৮৮
বিশেষ	১৮৮-১৯৭
সমবায়	১৯৭-২০৬
অভাব	২০৭-২১৮
রঘুনাথ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্ব	২১৮-২৩২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বৈশেষিক-দর্শনে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয় ২৩৩-২৬১

চতুর্থ অধ্যায়ঃ আধুনিক-বিজ্ঞানে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয় ২৬২-২৭৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উপসংহার ২৭৭-২৯২

সহায়ক-গ্রন্থপঞ্জী ২৯৩-৩০৫

প্রস্তাবনা

অসংখ্য বস্তু-সমন্বিত আমাদের এই জগৎ বৈচিত্র্যময়, যা সেই আদিম কাল হতে মানুষকে প্রতিনিয়ত বিমোহিত ও বিস্মিত করে আসছে। একটা সময় ছিল যখন নক্ষত্র-খচিত রাতের আকাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করতো, ঠিক একইভাবে দিনের আলোতে নীল চাদরের অন্তরালে তাদের হারিয়ে যাওয়া মানুষের মনে প্রশ্ন জাগাতো। তাই মানব সভ্যতার সেই ঊষালগ্ন হতেই মানুষের মধ্যে জগৎকে জানবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। এই বৈচিত্র্যময় জগতের পরতে পরতে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা উদ্ঘাটনে কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক প্রত্যেকেই নিরন্তর রত।

সেই সুপ্রাচীন কাল হতে আদ্যাবধি মানুষ জগৎকে জানার হাজার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও জগতের কতটুকুই বা জানা সম্ভব হয়েছে? আমাদের মত সসীম জীব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই জগতের ভগ্নাংশমাত্রকে জানতে সক্ষম হয়েছে। এর বাইরে যে প্রতিদিন সহস্রাধিক ঘটনা ঘটেই চলেছে তার হদিশ আমরা কেউ পাই না।

বর্তমান নিবন্ধটিতে 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ' শিরোনামে আমি মূলত বৈচিত্র্যময় এই নানাত্বের জগৎ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জানার চেষ্টা করেছি মাত্র। যদিও একথা ঠিক যে, আমার এই আলোচনাটি নতুন নয়। সেই প্রাচীন কাল হতে বহু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্,, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্, প্রমুখ এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে নিয়ে বহু আলোচনা করে গেছেন; বর্তমানে করছেনও। কাজেই আমার এই গবেষণা নিবন্ধটি জগৎ বিষয়ে কোনও নতুন আবিষ্কার তুলে ধরছে না। বরং এটাকে একটি অনুসন্ধিৎসু মনের জগৎকে জানবার কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে; যেটি অনুসন্ধিৎসু দর্শনানুরাগীর ভারতীয়-দর্শনের দৃষ্টিতে জগৎ সম্পর্কে নিজ ধারণাগুলিকে সহজবোধ্য ও পরিমার্জিত করতে সহায়তা করতে পারে। যদিও মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশালতা এবং গভীরতা যে শাস্ত্রের, সেই দর্শনশাস্ত্রে আমার জ্ঞান অতীব সীমিত। এই সীমিত জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের অনুকম্পায় বৈশেষিকশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বজাল কিঞ্চিৎ ভেদ করে এই পরিদৃশ্যমান

জগতের স্বরূপ যতটুকু অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে, তা প্রদত্ত নিবন্ধে বর্তমান প্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই বিশ্ব-জগৎকে জানার ইচ্ছা আমাদের যে দুর্নিবার, তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতেও পরিস্ফুট হয়েছে –

‘বিশাল বিশ্বে চারিদিক্ হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে’।

(উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থ)

ভূমিকা

জগৎ ও জীবনের অন্তরালে চলেছে 'মহন্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে' – তাঁরই অনন্ত লীলা। যুগপ্রয়োজনে ও যুগচিত লীলায় যুগে যুগে ধরাবক্ষে দিব্য তনুকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হতেন মহামানব – মহান পুরুষ। অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত এক ও অদ্বিতীয় সেই পরমাত্মা হতে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, তাঁকে অবলম্বন করে সকলে জীবিত থাকে, অন্তে সবকিছু তাঁতে বিলীন হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই প্রবাহ-ধারা এভাবেই আবর্তিত হয়ে বয়ে চলেছে সেই অনাদি অনন্তকে অবলম্বন করে, কয়েকটি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ কিংবা কার্য-কারণের কারাবন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়; এসবের ঊর্ধ্বে প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে যিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন, যাঁর আদেশে সূর্যালোক দেন, বায়ু বয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, মেঘ বর্ষণ করে, ঋতুচক্র আবর্তিত হয়, মহময়ী ধরণী ফুলে-ফলে ভরে ওঠে, নদী বয়, পাখি গায়, তিনিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিয়ন্তা বিরাট পুরুষ।

আর্য-মনীষার বিস্ময়কর সৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্ররাজি, বেদ-বেদান্তে, সাহিত্যে, উপনিষদে, ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধ্যাত্মজ্ঞানদীপ্ত যে চিত্র আমরা পাই, তা এক কথায় অতুলনীয়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আধ্যাত্মিকতা। একদিন এই দেশে অধ্যাত্ম-ভাবধারার পীঠস্থান পবিত্র তপোবনে ব্রহ্মধ্যাননিরত ব্রহ্মর্ষি এবং ব্রহ্মবাদিনী ঋষিপত্নী বিরাজ করতেন। শিষ্যগণের বেদ-পাঠে তপোবন মুখরিত হত। রাজাই ঋষি এবং শিষ্যগণের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ঋষির পরামর্শ নতমস্তকে গ্রহণ করতেন। ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা ভারতবাসীর সমগ্র জীবন চর্চা যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির অপর প্রতিষ্ঠিত, তার মূলে ছিলেন ঋষিগণ। দেশের ও দশের হিতকামনায়রত ঋষিগণের মধ্যে আত্মবোধ ও দেশাত্মবোধ যুগপৎ বিকশিত হত।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক বেদ। ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকল্পে আর্য ঋষিগণ বেদশাসিত ভারতবর্ষের উপযোগী বিবিধ মুক্তিমার্গ প্রদর্শন পূর্বক, মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শাস্ত্রমুখে বিবিধ কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ করে গেছেন। আমরা দেখি সভ্যতার সূচনাপড়বে অরণ্যচারী মানুষ বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম দেখেছিল এই সুনীল আকাশ ও মোহময়ী ধরণীকে। আকাশে মাত্যণ্ডের প্রখর অগ্নিবান, ঝড়ের তাণ্ডবলীলা, বজ্রের নির্ঘোষ মানুষকে সেদিন ভয়ে বিহ্বল করে তুলেছিল, তেমনি পৃথিবীর বুকে শ্যামল বনানী, শীতল বায়ু প্রবাহ, বর্ষার অবিরল বারিধারা তাদের মনে যুগিয়েছিল পরম প্রশান্তি। শুধু সেদিনই বা কেন পরবর্তিকালে সাহিত্যে, দর্শনে, এমনকি বিজ্ঞানেও বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দুতে এই আকাশ ও পৃথিবী। আর আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে মহাকাশের মহাবিস্ময়ে বিমোহিত সারা বিশ্ব। গ্রহসম্পৃক্ত নক্ষত্র বিশ্বে চলছে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, ধাবিত হচ্ছে চন্দ্রযান, মঙ্গলযান, সূর্যযান। আর নীচে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার সূত্র ধরে নিরবে এগিয়ে চলেছে সমুদ্র বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। সর্বত্রই শুধু ধরা-অধরার খেলা। আর দিগন্তে – যেখানে আকাশ নুয়ে পড়ে পৃথিবীর সঙ্গে পরম আত্মীয়তায় করে কানাকানি কিংবা সুবিশাল পাহাড় যখন আকাশের কোলে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে থাকে; তখন এই দুই-এর সব ভেদ ঘুচে যায়; জেন মনে হয় 'তদেব গগনং সৈব ধরা' – সব মিলেমিশে একাকার। জানি, কালের বক্ষে সময়ের তালে একদিন হয়তো সবকিছু হারিয়ে যাবে; কিন্তু এই নীলাকাশ ও সজিব প্রাণচঞ্চল নীল গ্রহটি চীরকাল আমাদের চেতনা অধিকার করে থাকবে। আর এই গ্রহটির কোলে জেগে থাকবে গঙ্গা-গোদাবরী-বিধৌত ভরতভূমি – আমাদের গর্বের দেশ ভারতবর্ষ।

নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই জন্মভূমি। জীব তার পূর্বার্জিত প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং এখান থেকেই জীব তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। তাই সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হতে শুরু করে আপামর সাধারণ মানুষের জগৎকে জানবার দুর্নিবার ইচ্ছা সেই সুপ্রাচীন কাল হতে পরিলক্ষিত। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তা হলে দেখতে পাব

একটা সময় ছিল যখন মানুষ অরণ্যে বিচরণ করতো, বনের ফল, মূল ও পাতা সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করতো। সে সময় মোহময়ী পৃথিবীর বৈচিত্র্য তাদের নিকট রহস্যাবৃত মনে হত। ফলস্বরূপ তারা এই বৈচিত্র্যে মোড়া জগতের পরতে পরতে মিশে থাকা রহস্যজাল ভেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এই জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে? কি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে? এই জগতের শেষ কোথায়? তা কি কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে যাবে? কীভাবে এই জগতের ধ্বংস হতে পারে? এত যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূ-কম্প, বিধ্বংসী ঝড়, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ, দাবানল – এসবের কারণ কি? এমন হাজার প্রশ্ন সেই আদিকাল হতে মানুষকে ভাবিয়ে আসছে। কাজেই জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি সেই সুপ্রাচীন কাল হতে শুরু করে বর্তমান দিনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'জগৎ' কথাটির অর্থ হল – যা গমনরত; অথবা বলা যায় নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে এগিয়ে চলেছে, তাই জগৎ। বস্তুতঃ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু, অণু-পরমাণু – সবই গতিশীল। তাই সূর্যও গতিশীল। যদিও এই সূর্যকে আমরা স্থিঢ় বলে মনে করি। পৃথিবী হতে সূর্য বহুদূরবর্তী হওয়ায় এবং সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ায় আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সূর্যকে স্থির বলে মনে হয় বটে এবং পৃথিবীর গতি সূর্যের ওপর আরোপ করে সূর্যের উদয়-অস্ত কল্পনা করি বটে। বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই স্থির নয়, সবই সচল, গতিমান অর্থাৎ জগৎ। এই অর্থে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই, যা আমরা দেখি আবার যাকিছু আমরা দেখি না – এসমস্ত কিছু নিয়েই হল আমাদের এই জগৎ।

আমার গবেষণানিবন্ধের শিরোনাম হল – 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ'। জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় যাবতীয় মৌলিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রদান দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রায় সব ভারতীয়দর্শন-সম্প্রদায়ই জগৎ এবং জাগতিক বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে স্বল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে সুবিশ্লেষিত ও সুসংহত

আলোচনা যে দর্শনসম্প্রদায়গুলি করেছে তাদের মধ্যে বৈশেষিক-দর্শন অন্যতম। কারণ বৈশেষিক-দর্শনের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল জগৎ এবং জাগতিক বিষয়সমূহ। তাই বৈশেষিক-দর্শন 'প্রমেয় শাস্ত্র' নামে অভিহিত। 'প্রমা' তথা যথার্থ অনুভবের বিষয়রূপে যা কিছু আমরা পাই তা হল এই জগৎ এর নানা বস্তুসমূহ। এগুলিকেই বৈশেষিকাচার্যগণ প্রমেয়, পদার্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

আমি আমার সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আলোচনা করব –

প্রথম অধ্যায়ে মূলত ভারতীয়দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিতে যে পদার্থ-বিষয়ক অভিমত প্রদর্শিত হয়েছে তা আলোচনা করা হবে। আমরা জানি জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ একে অপরের পরিপূরক। জগৎকে বাদ দিয়ে যেমন জাগতিক বিষয়সমূহের কল্পনা সম্ভব হয় না; তদনুরূপ জাগতিক বিষয়শূন্য জগতের ধারণাটি অর্থহীন। তাই জগতের স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে জাগতিক বিষয়সমূহের আলোচনা এসে পড়ে। যদিও আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন। কাজেই, পদার্থ-বিষয়ে বৈশেষিক-দর্শনের অভিমত এস্থলে প্রাসঙ্গিক মনে হলেও বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বকে সম্যগ্‌ভাবে অনুধাবন করতে হলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত পদার্থ-বিষয়ক অভিমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই প্রথম অধ্যায়ে নাস্তিক এবং আস্তিক ভেদে ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে নয়টি সম্প্রদায় অধিক প্রসিদ্ধ, তাদের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত পদার্থ-বিষয়ক অভিমতের ওপরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত পূর্বক বৈশেষিকমতের সঙ্গে তাদের পদার্থতত্ত্বের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের ওপর আলোকপাত করা হবে। এপ্রসঙ্গে সমানতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে ন্যায়দর্শনের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনাপূর্বক ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ যে বৈশেষিকসম্মত সপ্ত-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তা বৈশেষিকশাস্ত্র অনুসরণে

আলোচিত হবে। এই সঙ্গে পদার্থ-বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমণির যে অভিমত, তাও অনুধাবন করা হবে। কারণ তিনিই একমাত্র প্রসিদ্ধ দার্শনিক যিনি প্রচলিত বৈশেষিকমত হতে বেরিয়ে নতুন আঙ্গিকে বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বৈশেষিক-দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি কণাদ আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত জাগতিক বিষয়সমূহকে মূল সাতটি শ্রেণীতেই বিভক্ত করেছিলেন, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। মহর্ষি কণাদ নিয়ত-পদার্থবাদী হওয়ায় উক্ত সপ্ত-পদার্থের অধিক পদার্থ যেমন তিনি স্বীকার করেননি, তদনুরূপ তা হতে অল্প পদার্থও মহর্ষি-কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিকসম্মত বিশেষ পদার্থটিকে স্বীকারই করেননি। শুধু তাই নয়, মহর্ষি কণাদসম্মত দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থাতিরিক্ত অতিরিক্ত ঘটাত্যন্তাভাবাভাব, বিষয়ত্ব, প্রতিযোগীত্ব, অধিকরণত্ব, শক্তি, স্বত্ব, সাদৃশ্য, সংখ্যা প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্র পদার্থের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই রঘুনাথকৃত পদার্থতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে পদার্থ-বিষয়ে বৈশেষিক-দর্শনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই এই অধ্যায়ে রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থতত্ত্ববিষয়েও আলোকপাত করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কারণ সেই প্রাচীনকাল হতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অপার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত ও বিস্মিত মানুষের মনে প্রথম যে প্রশ্নটি জাগরিত হয়েছিল, তা হল – এই জগৎ এলো কোথা থেকে? এর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল? জাগতিক বস্তুসমূহের ন্যায় এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ কি একদিন কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে? কীভাবে প্রলয় আসবে? তাই এই অধ্যায়ে মূলত সেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে অনুধাবন করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যে অভিমত তা তুলে ধরা হবে। কারণ আমরা জানি আজকের যুগের মানুষ অধিক মাত্রায় বিজ্ঞানমুখী। তাঁরা ধর্মীয় লোকগাথা কিংবা আপ্তের বাণী অপেক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর অধিক আস্থাশীল। বিজ্ঞান যা সত্য বলে দাবী করে কিংবা যা কিছু বিজ্ঞানের

সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকেই তাঁরা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেয়। তাই এই অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যে অভিমত তা অনুধাবন পূর্বক বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে বিজ্ঞানের মতের পর্যালোচনা করব।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের মতগুলিকে পর্যালোচনা করি তা হলে বুঝতে পারবো আজকে উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান যেগুলিকে নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবী করছে, বহু বহু বছর পূর্বে আমাদের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ তার ওপর আলোকপাত করে গেছেন।

প্রথম অধ্যায়
ভারতীয়দর্শনে পদার্থতত্ত্ব

'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' অর্থাৎ পদের অর্থ হল পদার্থ। একটি পদ তার স্বনিষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা যে অর্থকে উপস্থাপিত করে, তা পদার্থ। এই অর্থে অসংখ্য পদার্থ সমন্বিত আমাদের এই জগৎ, যার মধ্যে তৃণ, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ পর্বতরাজি, নক্ষত্ররাজি, বৃক্ষরাজি – এ সমস্তই বিদ্যমান। তাই এ সবই পদার্থ। জীবমাত্রই পূর্বজন্মে কৃত প্রারব্ধকর্মের ফলভোগের নিমিত্ত এই পদার্থসম্বলিত জগতেই জন্মগ্রহণ করেন, এখান থেকেই জীব তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। তাই মানুষ যেদিন থেকে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করল, বেঁচে থাকার লড়াই এর পরিবর্তে নিজেকে চেনার লড়াই-এ লিপ্ত হল, অর্থাৎ 'আমি কে?" এই প্রশ্নের সম্মুখে নিজেকে দাঁড় করাল, তখন থেকেই তথা দর্শনালোচনার আদি লগ্ন হতেই প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনাচার্যগণের আলোচনায় পদার্থের প্রসঙ্গ বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। কখনও দর্শনাচার্যগণ অসংখ্য পদার্থ সমন্বিত যে জগৎ তার উৎপত্তি কীভাবে হল? কোথা হতে এলো? ধ্বংসের পর এগুলির পরিণাম কি হবে? তা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন। আবার কখনও পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মানবজীবনের পরম অভীষ্ট মোক্ষ-প্রাপ্তির নিমিত্ত পদার্থের আলোচনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। যদিও ভারতীয়দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ আঙ্গিকে পদার্থের আলোচনায় প্রয়াসী ছিলেন। তাই পদার্থের স্বরূপ, লক্ষণ, বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেকটি দর্শনসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। যেমন, বৈশেষিক সম্প্রদায় দ্রব্যাদি সপ্তবিধ পদার্থের উল্লেখ করেন। তথাপি সমানতন্ত্র হয়েও ন্যায়দর্শন মোক্ষোপযোগী হিসাবে ষোড়শ-পদার্থের উল্লেখ করেন। যদিও নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশেষিকসম্মত সপ্তপদার্থই স্বীকার করেছেন। আবার রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিকস্বীকৃত দ্রব্যাদি পদার্থ স্বীকার করলেও বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ নামক পদার্থটিকে তিনি স্বীকারই করেননি। বৈশেষিকস্বীকৃত ষট্-পদার্থ অতিরিক্ত অত্যন্তাভাবাভাব, ক্ষণ, শক্তি, কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়ত্বকে

অতিরিক্ত পদার্থ বলেন। কাজেই ভারতীয়দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে, এমনকি একই সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন দার্শনিকগণের পদার্থের আলোচনার মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান।

ভারতীয়দর্শনসম্প্রদায়গুলি মূলত দ্বিধাবিভক্ত, যথা– আস্তিক ও নাস্তিক। *মনুস্মৃতি*তে বলা হয়েছে – 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'[১] অর্থাৎ যাঁরা বেদকে নিন্দা করেন, বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করেন না, তাঁরা হলেন নাস্তিক। অপরপক্ষে যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থের মান্যতা প্রদান করেন, তাঁরা হলেন আস্তিক। ভারতীয়দর্শনের এই দ্বিবিধ ধারার অন্তর্ভুক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলির আলোচ্য বিষয়ের ভেদ হেতু তাঁদের পদার্থ-বিষয়ক আলোচনায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, প্রতিটি ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু আলোচ্য বিষয় রয়েছে। আর যে পদার্থসমূহ যে সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত বিষয় প্রতিপাদনে সহায়ক, সেই দর্শন সেই সেই পদার্থের আলোচনা করেছেন। আর যে সমস্ত পদার্থ যে সমস্ত দর্শনের অভিপ্রেত বিষয় উপপাদনে উপযোগী নয়, সেই সমস্ত দর্শনে সেই সমস্ত পদার্থের আলোচনা হয়নি। যাই হোক, আমার গবেষণার মূল বিষয় হল বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন। এখন আমরা জানি জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ একে অপরের পরিপূরক। জগৎকে বাদ দিয়ে যেমন জাগতিক বিষয়সমূহের কল্পনা সম্ভব হয় না; তদনুরূপ জাগতিক বিষয়শূন্য জগতের ধারণাটি অর্থহীন। তাই জগতের স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে জাগতিক বিষয়সমূহের আলোচনা এসে পড়ে। যদিও আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন। কাজেই, পদার্থ-বিষয়ে বৈশেষিক-দর্শনের অভিমত এস্থলে প্রাসঙ্গিক মনে হলেও বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বকে সম্যগ্‌ভাবে অনুধাবন করতে হলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত পদার্থ-বিষয়ক অভিমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আত্মার স্বরূপ বোঝার জন্য আত্মেতর পদার্থ-সকলের নিরূপণ করা হয়েছে, তদনুরূপ বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বকে বুঝতে গেলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়গুলির পদার্থ-বিষয়ক যে অভিমত তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

---

[১] সপ্ততীর্থ, শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা – ১০৩।

কেননা, অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়গুলির পদার্থ-বিষয়ক অভিমতের সঙ্গে বৈশেষিকসম্মত পদার্থতত্ত্বের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনুধাবনের মধ্য দিয়েই বৈশেষিকাচার্যগণের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত সম্পর্কে যথার্থরূপে অবহিত হওয়া যাবে। তাই এখন ভারতীয়-দর্শনে আস্তিক-নাস্তিকভেদে যে নয়টি সম্প্রদায় রয়েছে তাঁদের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। একই সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে তথা আয়ুর্বেদশাস্ত্রাদিতে কিংবা ব্যাকরণশাস্ত্রাদিতে পদার্থ-বিষয়ক যে অভিমত রয়েছে, তাও কিঞ্চিৎ আলোচনা করর।

পদার্থ-বিষয়ে চার্বাক-দর্শনের অভিমতঃ

চার্বাকমতে, ঘট-পটাদি অসংখ্য পদার্থসমন্বিত আমাদের এই জগৎ, যা ইন্দ্রিয়গম্য। যার ইন্দ্রিয়গম্যতা নেই তার অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। যেমন, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদি চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত হয়নি, যেহেতু এগুলির ইন্দ্রিয়গম্য নয়। চার্বাকগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগৎ-এর যাবতীয় বস্তুসমূহের মূল উপাদান হিসাবে চারটি তত্ত্ব স্বীকার করেন, যথা - পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। *বার্হস্পত্যসূত্রে*তে বলা হয়েছে –‘পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি’[২]। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শনের ন্যায় চার্বাক দর্শনে পদার্থ-বিষয়ক কোনো বিস্তারিত আলোচনা আমরা পাই না। অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য দর্শনে পদার্থের স্বরূপ, লক্ষণ কিংবা শ্রেণীবিভাগ যেভাবে সুবিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, চার্বাক দর্শনে সেভাবে পদার্থের পৃথক উদ্দেশ, লক্ষণাদি আলোচিত হয়নি। যদিও একথা ঠিক যে, চার্বাক দর্শনের কোনো মূল আকর গ্রন্থ আমরা পাই না, যা পাই তা অন্যান্য দর্শনের আচার্যগণকর্তৃক উপস্থাপিত মত-মাত্র। অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ নিজ নিজ মতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকমতের উপস্থাপন, খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন করেছেন। কাজেই অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের আচার্যগণকর্তৃক উপস্থাপিত চার্বাকমতের ওপর ভিত্তি করে চার্বাক সম্প্রদায়ের মূল্যায়ন হয়তো যথাযথ হবে না। তথাপি চার্বাক মত হিসাবে আমরা যা তথ্য পাই, সেখানে পদার্থ-বিষয়ে স্বতন্ত্র বিস্তারিত কোনো আলোচনা আপাতভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না।

[২] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১৮৭।

তা হলে প্রশ্ন হল, প্রাত্যহিক জীবনে চার্বাকগণের কি নির্দিষ্ট পদ হতে নির্দিষ্ট অর্থের বোধ হয় না? তাঁরা কি নির্দিষ্ট কোনও অর্থকে বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনও পদ ব্যবহার করেন না? এর উত্তরে বলা যায়, চার্বাকগণও দৈনন্দিন জীবনে 'মৃগ' পদ হতে মৃগ বস্তুকে বোঝেন, 'হংস' পদ হতে হংসকে বুঝে থাকেন। নির্দিষ্ট পদ হতে নির্দিষ্ট অর্থের বোধ তাঁদেরও হয়ে থাকে। কাজেই ঘট, পটাদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থসমূহ চার্বাকগণও স্বীকার করেন। তবে ঘট পটাদি জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুসমূহ যেহেতু পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতের সমন্বয়ে গঠিত সে'হেতু অনেকে মনে করেন, চার্বাকমতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু – এই চারটিই হল মূল তত্ত্ব বা পদার্থ। *চার্বাকষষ্ঠিতে* বলা হয়েছে – 'অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ'[৩]।

বৈশেষিক-দর্শনে আকাশকে একটি বিভুদ্রব্য বলে স্বীকার করা হলেও চার্বাক দর্শনে আকাশকে পদার্থ হিসাবেই স্বীকার করা হয় না। কারণ চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। চার্বাক দর্শনে যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু যা প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য নয় তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। পৃথিবী, জল ও তেজের রূপ ও স্পর্শ আছে; বায়ুর রূপ না থাকলেও স্পর্শ আছে, তাই এগুলি চার্বাক দর্শনে পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আকাশের উদ্ভুত রূপ কিংবা স্পর্শ না থাকায়, তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তাই চার্বাকগণ আকাশকে পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। চার্বাক দর্শনে পৃথিব্যাদি জড়াত্মক ভূতচতুষ্টয় সমগ্র জগৎ -এর মূল উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায়, চার্বাক দর্শনকে 'জড়বাদী দর্শন' আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

চার্বাক দর্শনে অতীন্দ্রিয়-নিত্য-বিভু আত্মাও স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে, 'শরীরমাত্মাঃ'[৪]। অভিপ্রায় এই যে, চার্বাকমতে দেহ হল পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতের সংহতিমাত্র। আর 'চৈতন্য-

---

[৩] বসু, রণদীপম, *চার্বাকের খোঁজে : ভারতীয়দর্শন*, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭, পৃষ্ঠা – ৫৬৯।

[৪] শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমৎ-সায়ণমাধবকৃত সর্বদর্শন-সংগ্রহে *প্রথমং চার্বাকদর্শনম্*, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা – ৯৬।

বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ'[৫] অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে চার্বাকগণ বিশ্বাসী নন, যেহেতু তা প্রমাণগম্য নয়। দেহ আছে যেহেতু তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন 'আমি কৃশ'; 'আমি স্থূল' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করি, তখন 'আমি' বলতে আমরা দেহকেই বুঝিয়ে থাকি। যেহেতু দেহই কৃশ কিংবা স্থূল প্রভৃতি হতে পারে। দেহাতিরিক্ত অমূর্ত আত্মার স্থৌলাদি নেই। আবার যখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 'তুমি শতবর্ষ জীবিত থাক' – এরূপ শুভ আশীর্বাদবাণী প্রদান করেন, তখন তিনি দেহকে লক্ষ্য করেই প্রদান করেন, দেহাতিরিক্ত আত্মাকে নয়। তাই চার্বাকমতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই। যদিও পরবর্তিকালে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ জড়দেহ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে যথাক্রমে আত্মা বলে স্বীকার করেন। তবে দেহাতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মনের অভিজ্ঞতা আমাদের না হওয়ায় অনেকেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেছেন।

চার্বাকমতে চৈতন্য আত্মার কোনও গুণ নয়, তা দেহেরই গুণ বিশেষ। পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। আর দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ভূতচতুষ্টয়ে তো পৃথকভাবে চেতনা থাকে না তা হলে ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে যে দেহ তাতে চেতনা থাকে কীভাবে? *চার্বাক-ষষ্টিঃ* তে এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপমার উল্লেখ রয়েছে। উপমাটি হল – 'তেভ্য এব দেহাকার-পরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেসু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি'[৬] অর্থাৎ কিণ্বাদিতে তথা মদ্য তৈরির উপাদান সামগ্রীতে, যেমন - তণ্ডুল, গুড় প্রভৃতিতে মাদকতা থাকে না। কিন্তু যখন তা মদ্যরূপে পরিণত হয়, তখন তাতে মাদকতাশক্তি পরিলক্ষিত হয়। তদনুরূপ দেহাদির উপাদান অবিকৃত ভূত পদার্থসমূহে তথা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে পৃথকভাবে চৈতন্য বিদ্যমান না থাকলেও, যখন সেগুলি দেহাকারে পরিণত হয় তখন তাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় এবং দেহ বিনষ্ট হলে অর্থাৎ

[৫] ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৬।
[৬] ঐ, পৃষ্ঠা-৭।

চতুর্ভূতে উৎপন্ন দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহের সঙ্গে অন্বয়-ব্যভিচার হেতু চার্বাকগণ চৈতন্যকে দেহের গুণ বলেন। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে, ব্রাম্ভী-ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য দেহকে পরিপুষ্ট করে, ফলস্বরূপ আমাদের প্রজ্ঞা তথা চেতনাও পরিপুষ্ট হয়। আবার দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে চেতনাও হ্রাস পায়। এর থেকে প্রমানিত যে, দেহের সঙ্গেই চেতনা সম্পর্কিত। কজেই চার্বাকমতে চেতনা দেহেরই একপ্রকার আগন্তুক গুণ বিশেষ।

চার্বাকগণ ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত জগৎকর্তারূপী ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী নন। কারণ তাঁদের মতে, চতুর্ভূতের আপন স্বভাব নিয়মেই জগৎ ও জগৎবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। তার জন্য জগৎ অতিবর্তীরূপে কোনও ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। চার্বাকগণের বক্তব্য হল –

‘অগ্নিরুষ্ণঃ জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতেঃ’[৭]।

আগুন যে উষ্ণ, জল যে শীতল, বায়ু যে সমস্পর্শযুক্ত – এরূপ বিধান কে করেছেন? কেউই না, বস্তুর আপন স্বভাব নিয়মেই জগৎ -এর যাবতীয় বৈচিত্র্য ব্যবস্থিত হয়েছে। কণ্টকের তীব্রতা, মৃগ-পক্ষীগণের বিচিত্র স্বভাব, ঈক্ষুর মধুরতা, নিম্বের তিক্ততা, পলাশের রক্তিমাভা, হংসের শুক্লতা, নদীর প্রবহমানতা, বনানীর নিবিড়তা, প্রত্যুষের সজীবতা – এসবের জন্য চার্বাকগণ কোনও অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনায় বিশ্বাসী নন। চার্বাকমতে ‘স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম্’ অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব নিয়মেই এ জগৎ -এর সবকিছু ব্যবস্থিত হয়েছে। ‘স্বভাব’ বলতে চার্বাকগণ ‘পদার্থের প্রতিনিয়ত শক্তি’কে বোঝান। এই স্বভাব হতেই জগৎবৈচিত্র্যের উৎপত্তি-স্থিতি-বিলয়। যদিও অন্য একটি চার্বাক সম্প্রদায় মনে করেন, জগৎবৈচিত্র্য যাদৃচ্ছিক বা আকস্মিক। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় যদৃচ্ছভাবে এই জগৎ ও জগৎ -এর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছে।

---

[৭] চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৫।

চার্বাক দর্শনে জগৎকর্তৃরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়নি। *বার্হস্পত্যসূত্রে* বলা হয়েছে – 'লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ'[৮] – অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই হলেন ঈশ্বর। অভিপ্রায় এই যে, যিনি দুষ্টকে দমন করেন এবং শিষ্টের পালন করেন – এমন লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই 'পরমেশ্বর' পদবাচ্য। আর 'দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ'[৯] অর্থাৎ দেহের বিনাশই হল মোক্ষ বা মুক্তি। যেহেতু দেহের বিনাশেই সকল দুঃখের অবসান ঘটে। যদিও চার্বাকগণ অধ্যাত্মবাদী দর্শন সম্মত তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত যে মোক্ষ তা স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁরা প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী। সেহেতু তাঁদের মতে, যাকিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা অস্তিত্বশীল। আর যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য নয়, যেমন – অতীন্দ্রিয় আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, পরলোক এসবের অস্তিত্বে চার্বাকগণ বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে অঙ্গনালিঙ্গনাজন্য যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা পরম অভীষ্ট। দেহের বিনাশই হল অপবর্গ। আর কণ্টকাদিজন্য ব্যথারূপ যে দুঃখ তাই নরক। যদিও পরবর্তিকালে অন্য একটি চার্বাক সম্প্রদায় একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, সঙ্কীর্ণ, স্থূল ইন্দ্রিয়োপভোগজন্য সুখকে পরম পুরুষার্থ না বলে উদার, বহুজনোপভোগ্য, সূক্ষ্মতর সুখানুভূতিকে পরমপুরুষার্থ বলেন। যদিও কেউ কেউ আবার মনুষ্যোচিত অল্প জৈব সুখ বর্জন করে পরিতৃপ্তিহীন যে সুখ, যাকে তাঁরা ভূমা বা আনন্দ বলেন, তাকেই পরমপুরুষার্থ বলেন।

পদার্থ-বিষয়ে বৌদ্ধ-দর্শনের অভিমতঃ

ভারতীয়দর্শন চর্চার ইতিহাসে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রচলিত বেদবাদ ও ব্রাহ্মন্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এই দর্শন আত্মপ্রকাশ করেছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ দর্শন কতকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে চারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা – বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং শূন্যবাদী। এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের নানা মৌলিক বিষয়ে

---

[৮] শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমৎ-সায়ণমাধবকৃত *সর্বদর্শন-সংগ্রহে প্রথমং চার্বাকদর্শনম্*, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা – পরিশিষ্ট।
[৯] ঐ, পৃষ্ঠা- পরিশিষ্ট।

বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায় ছিলেন হীনযানী, এনারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে বস্তুবাদী মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মতে বাহ্যবস্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। অপরদিকে মহাযানী সম্প্রদায়ভুক্ত যোগাচার সম্প্রদায় বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে ভাববাদী মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, একমাত্র বিজ্ঞানই অস্তিত্বশীল। তাই এনারা বিজ্ঞানবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। আবার এক সম্প্রদায় বাহ্যজগৎ -এর শূন্যত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা মূলত শূন্যবাদী নামে খ্যাত ছিলেন। কাজেই যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় সে বিষয়ে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিস্তর মতানৈক্য বিদ্যমান।

বৈভাষিকমতঃ

বৈভাষিকগণ সর্বাস্তিবাদী। কারণ তাঁদের মতে ধর্ম্ম বা পদার্থ অতীত, অনাগত ও বর্তমান – এই তিন কালে স্বরূপতঃ সৎ[১০]। তাঁরা মনে করেন, 'অতীতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন মনীষী ছিলেন' কিংবা 'তুমি বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হবে' ইত্যাদি বাক্য ব্যবহারের দ্বারা প্রতীত হয় যে, সমস্ত বস্তুই তিন কালে সৎ। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বস্তু যদি ত্রিকালসৎ হয় তা হলে তা নিত্য বা শাশ্বত হয়ে পড়বে। কিন্তু বৈভাষিকমতে পদার্থ বা ধর্ম্ম দু'প্রকার – সংস্কৃত ও অসংস্কৃত[১১]। যা হেতু প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন অর্থাৎ যেগুলি জন্য পদার্থ তাদের সংস্কৃত ধর্ম্ম বলা হয়েছে। আর যা হেতু প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন নয়, সেগুলিকে অসংস্কৃত ধর্ম্ম বলেছেন। এখন যা জন্য পদার্থ (সংস্কৃত) তা কীভাবে ত্রিকালসৎ হতে পারে? এর উত্তরে বৌদ্ধাচার্যগণ বলেন, পদার্থ বা ধর্ম্মগুলি তিন কালে স্বরূপতঃ সৎ, শুধুমাত্র তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যেমন – একজন নারী, যখন তিনি মহাবিদ্যালয়ে পড়াতে যান তখন তিনি অধ্যাপিকা, কিন্তু যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান তখন তিনি ছাত্রী, আবার যখন তিনি বাড়িতে পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন তখন তিনি সন্তান, আবার তিনিই যখন স্বামীর কাছে থাকেন তখন তিনি স্ত্রী,

---

[১০] ভট্টাচার্য্য, শ্রী অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ, *বৈভাষিকদর্শন,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা – ২৪।
[১১] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪।

সন্তানদের কাছে তিনিই আবার মাতা। এস্থলে অবস্থাভেদে যেমন একই নারী কখনও মাতা, কখনও স্ত্রী, কখনও সন্তান তেমনই সংস্কৃত ধর্ম্মগুলি স্বরূপতঃ তিন কালে সৎ। কিন্তু যখন তা বর্তমান কালের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তখন তাকে বর্তমান বলি, যখন তা বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করবে তখন তাকে অতীত বলব। আর পূর্বে যখন সেটি অপ্রাপ্তকর ছিল তখন তাকে অনাগত বলতাম। পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, বৌদ্ধদর্শনে তো নিত্য স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, তা হলে বৈভাষিকগণ কীভাবে বস্তুকে ত্রিকাল সৎ বলেন? এর উত্তরে বলা যায়, বৈভাষিকমতে কোনও বস্তুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, তা প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়। আমরা প্রথম ক্ষণে যে বস্তুটি পাই, দ্বিতীয় ক্ষণে সেই বস্তু থাকে না; তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যেমন, একটি বীজ হতে যখন চারাগাছ জন্মায়, তখন প্রতিক্ষণে বীজটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু গাছটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিন কালে স্বরূপতঃ অস্তিত্বশীল।

পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বৈভাষিকগণ বস্তুবাদী মনোভাব পোষণ করেন। তাঁদের বক্তব্য হল, যখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয় তখন ঐ ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট তা জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। তা আমাদের জ্ঞানের বিষয় না হলেও তার অস্তিত্বের কোনওরূপ হানি ঘটে না। তাঁরা মনে করেন জ্ঞাতা ও জ্ঞান অতিরিক্তভাবে বস্তু অস্তিত্বশীল হয়। তা হলে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে, বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয় কীভাবে? বৈভাষিকমতে বাহ্য বিষয়কে আমরা জানতে পারি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সাক্ষাৎভাবে। তাই বৈভাষিকগণ বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী নামে পরিচিত।

সৌত্রান্তিকমতঃ

বৈভাষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় সৌত্রান্তিকগণও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সৌত্রান্তিকমতে জ্ঞান অতিরিক্তভাবে বস্তু অস্তিত্বশীল, যেহেতু তা সর্বজনবিদিত। জ্ঞান হল আন্তর বস্তু আর বিষয় হল বাইরের বস্তু – এভাবেই সকলের নিকট প্রতীত হয়। তা ছাড়া জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় যদি এক হত তা হলে তারা একদেশে এককালে অবস্থান করত। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় সমদেশে সমকালে অবস্থান করে না। জ্ঞানের

অবস্থান আমাদের অন্তর্দেশে, অপরদিকে বিষয়ের অবস্থান বহির্দেশে। কাজেই তাদের সমদেশে সমকালে অবস্থান সম্ভব নয়। এর থেকে সৌত্রান্তিকগণ সিদ্ধান্ত করেন, জ্ঞান অতিরিক্তভাবে বস্তু অস্তিত্বশীল।

বাহ্যবস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা বৈভাষিকগণের ন্যায় সৌত্রান্তিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হলেও সৌত্রান্তিকগণ মনে করেন বাহ্যবস্তুর জ্ঞান আমাদের সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় না। বাহ্যবস্তুকে আমরা জানি পরোক্ষভাবে অনুমানের মাধ্যমে। যেহেতু এ জগতে স্থায়ী নিত্য কোনও বস্তু নেই – 'সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং'। সৌত্রান্তিকমতে বস্তু যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তার পরক্ষণেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞানই সম্ভব নয়। যদি বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হত, তা হলে তাকে অন্ততঃ দু'টি ক্ষণ অস্তিত্বশীল হতে হত। প্রথম ক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ, তথা জ্ঞানের উদ্বোধক হিসাবে বস্তুটিকে অস্তিত্বশীল হতে হত এবং দ্বিতীয়ক্ষণে জ্ঞানের বিষয়রূপে বস্তুটিকে অস্তিত্বশীল হতে হত। কিন্তু বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, তা একক্ষণমাত্র অস্তিত্বশীল। তাই সৌত্রান্তিকমতে বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব নয়। অভিপ্রায় এই যে, সৌত্রান্তিকমতে প্রথমক্ষণে বিষয় ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতঃপর বিষয় জ্ঞানে তার আকার সমর্পণ করে বিনষ্ট হয়ে যায়। জ্ঞানে সমর্পিত বিষয়ের আকারের দ্বারাই আমরা বিষয়কে অনুমান করে থাকি। তাই সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যানুমেয়বাদী[১২] নামে অ্যাখ্যায়িত হন।

যোগাচারমতঃ

যোগাচার বৌদ্ধসম্প্রদায় একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলে স্বীকার করেন। তাঁরা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্তায় বিশ্বাসী নন। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডনে তাঁদের যুক্তি হল – জ্ঞানের বিষয়রূপে যদি বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় তা হলে প্রশ্ন হল, বাহ্যবস্তু কি উৎপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিষয় হয়, নাকি উৎপন্ন না হয়ে জ্ঞানের বিষয় হয়? বাহ্যবস্তু যদি উৎপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিষয় হত তা হলে তাকে অন্ততঃ দু'টি ক্ষণ স্থায়ী হতে হত। একক্ষণে

[১২]চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০১৯, পৃষ্ঠা – ৫৮।

বস্তুটি উৎপন্ন হত আর দ্বিতীয়ক্ষণে জ্ঞানের বিষয় হত। কিন্তু বৌদ্ধমতে বস্তুমাত্র একক্ষণ স্থায়ী। যে ক্ষণে বস্তুটি উৎপন্ন হয়, তার পরক্ষণেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করে বলা যায় না, বস্তু উৎপন্ন হয়ে জ্ঞানের বিষয় হয়। আবার দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করে এমন বলা যায় না যে, বস্তুটি উৎপন্ন না হয়েই জ্ঞানের বিষয় হয়। কারণ যা উৎপন্ন হয়নি তা অসৎ, আর যা অসৎ তা কখনও জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। এখন যদি বলা হয় বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলেও তা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমক্ষণে বস্তুটি উৎপন্ন হল, দ্বিতীয়ক্ষণে তা জ্ঞানের বিষয় হল, এভাবে অতীত বস্তু বর্তমান জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। যোগাচারবাদিগণ বলেন এমন আপত্তিও যথাযথ নয়। কারণ বর্তমানকালে আমাদের যখন জ্ঞান হয় তখন আমাদের বর্তমানকালীন প্রতীতি জন্মায় অর্থাৎ 'আমি ঘট দেখেছি' এরূপ প্রতীতি জন্মায়, 'আমি ঘট দেখেছিলাম' এরূপ প্রতীতি জন্মায় না। কাজেই অতীতকালীন বস্তু বর্তমান জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। এভাবে নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক যোগাচারবাদিগণ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক স্বীকৃত বাহ্যার্থবাদ খণ্ডন করেন। তাঁদের বক্তব্য হল, জ্ঞান অতিরিক্তভাবে বাহ্যবস্তুর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় অভিন্ন।

এখানে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে একমাত্র বিজ্ঞান অস্তিত্বশীল হলে, বাহ্যবস্তু বলে কিছু না থাকলে কার বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে? অন্যভাবে বলা যায়, বাহ্য-জগতে যদি নীল, পীতাদি বস্তু না থাকত তা হলে নীল কিংবা পীতের প্রতীতি কীভাবে উৎপন্ন হবে? এর উত্তরে যোগাচারী বৌদ্ধগণ বলেন, বাহ্যবস্তু বলে বস্তুতঃ কিছু নেই, তা কল্পনামাত্র। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নে অনুভূত বিষয়ের জ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু নিদ্রা-ভঙ্গ হলে আমরা বুঝতে পারি, স্বপ্নে অনুভূত বিষয়গুলির জ্ঞানাতিরিক্ত কোনও অস্তিত্ব নেই, তা জ্ঞানসৃষ্ট প্রত্যয়মাত্র। তদনুরূপ বাহ্য বস্তু বলে কিছু নেই, সবই জ্ঞানের আকারমাত্র। আর এই বিজ্ঞান অনাদি কাল হতেই নীল-পীতাদি আকারপ্রাপ্ত হয়েই আছে। তার নীলাকার কিংবা পীতাকার বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না। আন্তর সাকার বিজ্ঞানই সংস্কারবশতঃ বাহ্যবস্তু রূপে প্রতিভাত হয়।

মাধ্যমিকমতঃ

যোগাচার সম্প্রদায় বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক স্বীকৃত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করলেও আন্তর বস্তু তথা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু মাধ্যমিকগণ বাহ্য কিংবা আন্তর উভয় বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে বাহ্য কিংবা আন্তর সমস্ত পদার্থই স্বভাবতঃ শূন্য। তাঁদের মূল বক্তব্য হল, 'সর্বং শূন্যং শূন্যম্' অর্থাৎ সমস্ত কিছুই শূন্য। তবে মাধ্যমিকসম্প্রদায় শূন্য বলতে নাস্তিত্বকে বোঝাননি। তাঁরা 'শূন্য' শব্দটির অর্থ করেছেন স্বভাবশূন্যতা। অভিপ্রায় এই যে, মাধ্যমিকমতে এ জগৎ -এর সমস্ত পদার্থই, যা অভিধেয় সমস্তই নিঃস্বভাব অর্থে শূন্য, যেহেতু সেগুলি পরিবর্তিত হয়। এ জগতে স্থায়ী বা নিত্য কোনও বস্তুই নেই। সবকিছু পরিবর্তনশীল। আর যা পরিবর্তনশীল, তা কোনও কিছুর সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ তা কোনও কিছু জন্য। আর যা জন্য তার স্বভাব থাকতে পারে না। স্বভাব হল এমন ধর্ম, যা কোনও কিছুর সাপেক্ষেই পরিবর্তিত হয় না। যেমন - আগুনের স্বভাব হল উষ্ণতা। উষ্ণতা কখনও আগুনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তদনুরূপ আগুনও উষ্ণতা ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। যদি আগুন উষ্ণতা ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল হত তা হলে তাকে আগুনের স্বভাব বলা যেত না। কাজেই যার যা স্বভাব তা কখনওই পরিবর্তিত হয় না। পদার্থের যদি স্বভাব থাকত তা হলে তা কখনও পরিবর্তিত হত না। কিন্তু পদার্থমাত্রই পরিবর্তনশীল হওয়ায় স্বীকার করতে হয়, পদার্থমাত্রই নিঃস্বভাব অর্থাৎ শূন্য। জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্বে শূন্যতার ধারণা পোষণ করায় এঁদের শূন্যবাদী নামে অভিহিত করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্ট যে, পদার্থ-বিষয়ক আলোচনায় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলি সহমত পোষণ করেন না। পদার্থের সংখ্যাভেদ প্রসঙ্গেও উক্ত চতুর্বিধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি বৈভাষিকসম্মত পদার্থগুলির কিছু গ্রহণ ও কিছু খণ্ডনের মাধ্যমে নিজ নিজ পদার্থ-বিষয়ক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৈভাষিকমতে ধর্ম্ম বা পদার্থ দু'প্রকার – সাস্রব ও অনাস্রব। বৌদ্ধদর্শনে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিকে আস্রব বলা হয়েছে। আর এই আস্রবগুলি যাতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাকে সাস্রব বলা হয়ে থাকে।

মার্গসত্য ভিন্ন সমস্ত সংস্কৃত ধর্মগুলি আস্রবের পরিপোষণ করায় সেগুলিকে সাস্রব বলা হয়েছে। মার্গসত্যে অনুরক্ত পুদ্গল রাগাদি আস্রবের পরিহার করে থাকেন। তাই রাগাদি আস্রবগুলি মার্গসত্যে পরিপুষ্ট বা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। আস্রবের পরিপোষক না হওয়ায় মার্গসত্যকে সাস্রব বলা যায় না। অনুরূপভাবে আকাশাদি অসংস্কৃত ধর্মে রাগাদি আস্রবগুলি প্রতিষ্ঠালাভ না করায় এগুলিও অনাস্রব নামে কথিত হয়েছে। যাই হোক বৈভাষিকসম্মত পদার্থ বা ধর্ম্মসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – সংস্কৃত ও অসংস্কৃত। 'হেতুপ্রত্যয়জনিতা রূপাদয়ঃ সংস্কৃতাঃ' অর্থাৎ যা হেতু ও প্রত্যয় জন্য অর্থাৎ সহেতুক ধর্মসমূহ হল সংস্কৃত ধর্ম্ম। সহেতুক ধর্ম্মগুলিকে বৈভাষিকগণ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা – রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ। উক্ত সংস্কৃত ধর্ম্মগুলি পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান না করে কতকগুলি মিলে একত্রে গুচ্ছাকারে থাকে, তাই এগুলিকে স্কন্ধ বলা হয়েছে। অপরদিকে যা হেতু ও প্রত্যয় জন্য নয়, তাদের অসংস্কৃত ধর্ম্ম বলা হয়েছে। বৈভাষিকমতে অসংস্কৃত ধর্ম্মগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। যা স্বয়ং অন্য পদার্থকে আবরণ করে না এবং নিজেও অন্য পদার্থের দ্বারা আবৃত হয় না, তাকে আকাশ বলা হয়েছে। আর যার উৎপত্তি আদৌ হবে না এমন সংস্কৃত ধর্ম্মের উৎপত্তির আত্যন্তিক নিরোধকে বলা হয় প্রতিসংখ্যানিরোধ। অপরদিকে যা সংস্কৃত ধর্মের উৎপত্তিকে আত্যন্তিকভাবে নিরোধ করে অথচ প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্য নয় তাকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে বৈভাষিকসম্মত নিরোধ অভাবাত্মক নয়, তা ভাবভূত ধাতু বা ধর্ম্মবিশেষ। সৌত্রান্তিকগণ কিন্তু বৈভাষিক-স্বীকৃত অসংস্কৃত পদার্থসমূহ স্বীকার করেন না। যেহেতু আকাশাদি অসংস্কৃত পদার্থগুলি উৎপত্তি-বিনাশ রহিত। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ পদার্থমাত্রেরই ক্ষণিকত্বে বিশ্বাসী। হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন নয় এমন অসংস্কৃত ধর্ম্ম সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায় অস্বীকার করলেও বৈভাষিকসম্মত সংস্কৃত ধর্ম্মসমূহ সৌত্রান্তিকগণও স্বীকার করেছেন। এই সংস্কৃত ধর্ম্মসমূহ বৈভাষিকমতে পাঁচ প্রকার, যথা - 'রূপস্কন্ধ', 'বেদনাস্কন্ধ', 'সংজ্ঞাস্কন্ধ', 'সংস্কারস্কন্ধ' ও 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। বৈভাষিকশাস্ত্রে 'রূপস্কন্ধ' বলতে

পঞ্চদশপ্রকার ধর্ম্মকে বোঝানো হয়েছে, যথা – পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ অর্থ এবং পঞ্চ অবিজ্ঞপ্তি। ভূতবিকার গোলকসমূহ হল ইন্দ্রিয়। যদিও বৈশেষিকশাস্ত্রে ভূতনির্মিত যে গোলকসমূহ সেগুলিকে ইন্দ্রিয় না বলে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলা হয়েছে। আর বৈশেষিকমতে ইন্দ্রিয় মাত্রই অতীন্দ্রিয়, তাদের জ্ঞান হয় আমাদের অনুমানের সাহায্যে। কিন্তু বৈভাষিকমতে ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয় নয়, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে জানতে পারি। যেমন – ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে জানতে পারি, অনুরূপভাবে চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়কে জানতে পারি। কাজেই ইন্দ্রিয়গুলি এই মতে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। বৈভাষিকমতে চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ধর্ম্ম গৃহীত হয় তা হল রূপ। বৈশেষিকশাস্ত্রে নীল, পীতাদি বর্ণসমূহকেই রূপ বলা হয়েছে। কিন্তু বৈভাষিকগণ নীল, পীতাদি বর্ণকে যেমন রূপ বলেন, তদনুরূপ হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্বাদি পরিমাণগুলিকেও রূপ নামে অভিহিত করেছেন। যদিও বৈশেষিকসম্মত বর্ণ বা পরিমাণ দ্রব্য নয়, সেগুলি হল গুণ। কিন্তু বৈভাষিকশাস্ত্রে নীল, পীতাদি বর্ণ কিংবা হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্বাদি পরিমাণ সকলকে এক একটি পৃথক দ্রব্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। বৈভাষিকমতে রূপ নামক ধর্ম্মটি আবার বিংশতি প্রকার, যথা – নীল, লোহিত, পীত, শুভ্র – এই চার প্রকার প্রধান বর্ণ; মেঘ, বাষ্প, রজঃ, মিহিকা, আতপ, আলোক, তমঃ – এই আট প্রকার অপ্রধান বর্ণ এবং দীর্ঘত্ব, হ্রস্বত্ব, বর্ত্তুলত্ব, পরিমাণ্ডল্য, উন্নতি, অবনতি, সাত ও বিসাত – এই আট প্রকার সংস্থান। এদের মধ্যে দীর্ঘাত্বাদি সংস্থানগুলি কায়বিজ্ঞপ্তিরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ এক প্রকারের ক্রিয়া। এখানে উল্লেখ্য যে বৈশেষিকসম্মত ক্রিয়ার ধারণা হতে বৈভাষিকসম্মত ক্রিয়ার ধারণার পার্থক্য আছে। বৈশেষিক-দর্শনে ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে একটি স্থায়ী দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু বৈভাষিক দর্শনে ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে কোনও দ্রব্যাত্মক পদার্থ স্বীকৃত হয়নি। বৈশেষিকাদি দর্শনে যে ধর্ম্মগুলি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু নামে পরিচিত; সেগুলি বৈভাষিকসম্মত রূপেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ বৈভাষিকমতে উক্ত ধর্ম্মগুলিও বর্ণ ও সংস্থানরূপ পরমাণুর সমষ্টি। বৈভাষিকগণ ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য ধর্ম্মকে শব্দ বলেন। তবে তা বৈশেষিকসম্মত গুণ-পদার্থ নয়, তা ঘট-পটাদির ন্যায় একজাতীয় পরমাণু-সঙ্ঘাত। অনুরূপভাবে রূপস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি

ধর্ম্মসমূহ বৈশেষিকসম্মত রস, গন্ধাদি হতে ভিন্ন। কারণ এগুলি গুণাত্মক নয়। বৈভাষিকমতে এগুলিও এক এক জাতীয় পরমাণু সমষ্টি।

বিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরা বিজ্ঞানকেই একমাত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেন। কারণ তাঁদের মতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অভিন্ন। যেহেতু উভয়ের একসঙ্গে উপলব্ধি হয়। বিজ্ঞানবাদীগণের মতে বাহ্য বা আন্তর উভয় বস্তুই বিজ্ঞানের পরিণামমাত্র। তবে শূন্যবাদী দার্শনিক নাগার্জুনের মতে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত ধর্ম্ম বলে কিছু নেই। তিনি সমস্ত প্রকার পদার্থকেই অস্বীকার করেন। তাঁর মতে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ প্রভৃতির সাহায্যে যে সংস্কৃত ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হয়েছে তা যথাযথ নয়। কারণ ঐগুলির জ্ঞানই আমাদের হয় না। যে বস্তু উৎপন্ন তার নতুন করে উৎপত্তি হয় না, আবার যে বস্তু অনুৎপন্ন তার উৎপত্তি হচ্ছে – এমনও বলা যায় না। একইরকম ভাবে যে বস্তু স্থিত তার আর স্থিতি হচ্ছে বলা যায় না, আবার অস্থিত অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্বই নেই তার স্থিতি সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যেটি ভগ্ন বা বিনষ্ট তার র বিনাশ সম্ভব নয়, আবার যেটি অভগ্ন অর্থাৎ যার বিনাশ নেই তার আর বিনাশ করা যায় না। এভাবে পরস্পর বিকল্পের উপস্থাপন পূর্বক নাগার্জুন দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ বলে কিছু নেই। ফলত তাদের ভিত্তিতে সংস্কৃত ধর্ম আছে বলা যায় না। আর সংস্কৃত ধর্ম না থাকলে অসংস্কৃত ধর্ম আছে – এমনও বলা যায় না। তাই নাগার্জুনের সিদ্ধান্ত হল সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ধর্ম বলে কিছু নেই। '*শূন্যতাসপ্ততি*'তে বলা হয়েছে –

'উৎপাদস্থিতিভঙ্গা ন ত্রয়ং সংস্কৃতলক্ষণম্'।
তস্মান্ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতং নাপ্যসংস্কৃতম্'।

জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় সেগুলিকে বৈভাষিক দর্শনে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ। 'স্বলক্ষণ' শব্দটিকে ভাঙলে আমরা দু'টি অংশ পাই – 'স্ব' এবং 'লক্ষণ'। 'স্ব' মানে নিজের, আর 'লক্ষণ' মানে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। কাজেই যা একটি বস্তুর একান্ত নিজের ধর্ম তা হল স্বলক্ষণ। আর

সামান্যলক্ষণ হল স্বলক্ষণ এর ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ যা বস্তুর নিজের ধর্ম নয়, যা কল্পিত বা আরোপিত তা হল সামান্যলক্ষণ। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করা গেল – যখন আমরা প্রাত্যহিক জীবনে ঘট, পটাদি বস্তুকে বুঝি তখন ঐ বস্তুগুলির সঙ্গে তাদের রূপ, নাম, ক্রিয়া প্রভৃতি যুক্ত হয়ে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়। জ্ঞানে প্রতিভাসিত ঐ রূপ কোনও নির্দিষ্ট ঘটের বা নির্দিষ্ট পটের রূপ নয়, তা সব ঘটের সাধারণ এক রূপ। তাই ঐ রূপকে ঘটের সামান্য রূপ বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটের নিজস্ব এক রূপ আছে, যা তাকে সজাতীয় অন্য সমস্ত ঘট হতে পৃথক করে, তেমনই বিজাতীয় পটাদি বস্তু হতেও তাকে পৃথক করে। ঐ ঘট বা পটের নিজস্ব যে রূপ সেটিই তার অসাধারণ রূপ বা বিশেষ রূপ। আচার্য দিঙ্‌নাগ বস্তুর সামান্য ও বিশেষ রূপকে যথাক্রমে সামান্যলক্ষণ ও স্বলক্ষণ বলেছেন। বৌদ্ধমতে প্রমাণ দু'প্রকার – প্রত্যক্ষ ও অনুমান। স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় হয় আর সামান্যলক্ষণ অনুমান প্রমাণের বিষয় হয়। বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সৎ, কারণ তা অর্থক্রিয়াসমর্থ। যখন তা নিকটে অবস্থান করে তখন তা স্পষ্টরূপে এবং যখন তা দূরে অবস্থান করে তখন তা অস্পষ্টরূপে আমাদের জ্ঞানে ভেসে ওঠে। কাজেই যার সন্নিধান বা দূরস্থানের ওপর জ্ঞানের প্রতিভাসের তারতম্য দেখা দেয়, তাকে স্বলক্ষণ বলে। আর স্বলক্ষণ ভিন্ন হল সামান্যলক্ষণ। যে বস্তুটির সন্নিধান বা দূরস্থান জ্ঞানের প্রতিভাসের কোনওরূপ তারতম্য ঘটাতে পারে না, তাকে সামান্যলক্ষণ বলে। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বস্তুর স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ – এরূপ ভেদ মানেন না। কারণ তাদের মতে জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর কোনও অস্তিত্বই নেই। কাজেই স্বলক্ষণ সামান্য লক্ষণ ভেদ নিরর্থক।

পদার্থ-বিষয়ে জৈন-দর্শনের অভিমতঃ

অন্যান্য ভারতীয়দর্শনের ন্যায় জৈনদর্শনেও জীবের মূল লক্ষ্য মোক্ষ-প্রাপ্তির সহায়করূপ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। জৈন মতে, 'সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি

মোক্ষমার্গঃ'[১৩] - অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যগ্‌চরিত্র – এই ত্রিবিধ হল মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। সম্যগ্‌দর্শন বলতে বোঝায় তত্ত্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থাৎ তত্ত্ব (বস্তু) এবং অর্থ (জীবাদি)-এর স্বরূপ অনুধাবন পূর্বক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হল সম্যগ্‌দর্শন। কাজেই মোক্ষপ্রাপ্তিতে আবশ্যক সম্যগ্‌দর্শনের নিমিত্ত পদার্থের স্বরূপ অনুধাবন আবশ্যক।

পদার্থ-বিষয়ে জৈনমত বৌদ্ধমতের বিপরীত। বৌদ্ধদর্শনে পদার্থমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত। কিন্তু জৈনগণ পদার্থমাত্রের ক্ষণিকত্বে বিশ্বাসী নন। তাঁদের যুক্তি হল, যদি পদার্থমাত্রকে ক্ষণিক বলা হয়, আত্মার নিত্য স্থায়ী অবস্থা না স্বীকার করা হয় তা হলে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ দোষ অবশ্যম্ভাবী হবে। অভিপ্রায় এই যে, ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। যে ক্ষণে তা উৎপন্ন হয়, ঠিক পরক্ষণেই তার বিনাশ সাধিত হয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি পূর্বে কর্ম করেছে আর যে ব্যক্তি ফলভোগ করবে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন। কাজেই যিনি ফলভোগ করবেন, তিনি কর্ম করেননি, অকৃত-কর্মের ফলের ভোগ হওয়ায় অকৃতাভ্যাগম দোষ দেখা দেবে। আবার যিনি কর্ম করছেন তিনি তাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ করছেন না, কৃত ফলভোগের হানি হওয়ায় কৃতহানি বা কৃতপ্রণাশ দোষও দেখা দেবে। ফলত ইহলোক ও পরলোকের ফললাভের নিমিত্ত যে সকল কর্মানুষ্ঠান উপদিষ্ট হয়েছে তাও ব্যর্থ হবে। তাই জৈনমতে পদার্থমাত্রেরই কোনও একরকম ভাবে স্থায়ীত্ব আছে – এটা স্বীকার করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, জৈনদর্শনে পদার্থমাত্রেরই দু'টি দিক্ স্বীকার করা হয় – একটি তার গুণের দিক্ এবং অন্যটি তার পর্যায়ের দিক্। গুণের দিক্ দিয়ে পদার্থমাত্রই স্থায়ী, কিন্তু পর্যায়ের দিক্ দিয়ে পদার্থমাত্রই পরিবর্তনশীল। জৈনমতে পদার্থমাত্রই পরিণামী স্বভাববিশিষ্ট। যে শক্তির জন্য পদার্থের মধ্যে পরিণাম উৎপন্ন হয় তাকে ঐ পদার্থের গুণ বলে। আর গুণের জন্য যে পরিণাম উৎপন্ন হয় তাকে জৈনদর্শনে পর্যায় বলা হয়। যেমন, আত্মায় চৈতন্য হল গুণ। কারণ চৈতন্যরূপ শক্তির জন্যই আত্মায় নানা পরিণাম, তথা – জ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আর চৈতন্য গুণজন্য যে বিবিধ পরিণাম, অর্থাৎ

---

[১৩] Jain, Vijay K. (ed.), Acharya Umasvami's *Tattvartha Sutra*, Calcutta, Vira Sasana Sangha, 1960, page-2.

চেতনা জনিত বোধশক্তি তা হল পর্যায়। কাজেই জৈনমতে গুণ ও পরিণামবিশিষ্টত্ব হল পদার্থের লক্ষণ।

জৈনদর্শন একান্তবাদের বিরোধী। একান্তবাদ অনুসারে, কোনও একটা মতকে চরম অর্থে সত্য ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু জৈনমতে কোনও মতই চরম অর্থে সত্য – এমনটা মানা যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে অন্য মতের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হয়। পদার্থের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেও জৈনাচার্যগণ একান্তবাদকে পরিহার করেন। তাঁদের মতে, 'উৎপাদব্যয়ধ্রৌবযুক্তং সৎ'[১৪] - অর্থাৎ যা উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতি বিশিষ্ট তা সৎ। এজগৎ -এর সমস্ত বস্তুই উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যেমন, একটি হরিণশাবক – এর উৎপত্তি (জন্ম) রয়েছে, স্থিতি রয়েছে, বিনাশ (মৃত্যু)ও রয়েছে। যদি স্বীকার করা হয় হরিণশাবকটির উৎপত্তি কিংবা ব্যয় নেই, তা চীরকালই স্থায়ী। তা হলে তার বৃদ্ধি তথা বিকাশকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আবার ঐ শাবকটি যদি একান্তভাবে পরিবর্তনশীল হত তা হলে হরিণশাবকটি হরিণে পরিণত হত না, মেষে পরিণত হতে পারত; কিন্তু তা হয় না। কাজেই মানতে হয় হরিণশাবক ও পরিণত হরিণটির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা স্থায়ী। তাই জৈনগণ পদার্থমাত্রেরই যেমন পরিবর্তনশীলতার দিক্ স্বীকার করেন তেমন তার স্থায়ীত্বের দিক্টিও স্বীকার করেন। তবে এখানে এমন ভাবা ভুল হবে যে, জৈনদর্শনে একই পদার্থে পরস্পর বিরোধী ধর্মের আরোপ মানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জৈনমতের অন্তর্নিহিত অর্থ হল, যা এক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থায়ী বলে মনে হয়, তা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনশীলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তাই জৈনদর্শনে পদার্থমাত্রকেই পরিণামী নিত্য হিসাবে স্বীকার করা হয়। পদার্থমাত্রই পরিণামী স্বভাবের হওয়ায় তার মধ্যে যেমন ক্রমাগত পরিণাম সংঘটিত হচ্ছে অর্থাৎ ক্রমাগত উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রিয়া চলছে, কিন্তু গুণের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা স্থির বা নিত্য থাকছে।

জৈনমতে সৎপদার্থ অনন্তধর্মবিশিষ্ট। কিন্তু আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের জ্ঞানে যা প্রকাশিত হয় তা

---

[১৪] ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৫।

পদার্থের খণ্ডিত চিত্রমাত্র। যেমন, একজন অন্ধব্যক্তি যখন হাতিকে জানতে আগ্রহী হন এবং হাতিটির পদ স্পর্শ করেন, তখন তাঁর কাছে ‘হাতিটি একটি স্তম্ভ সদৃশ’ এরূপ জ্ঞান হয়। আবার যখন হাতিটির কান স্পর্শ করেন তখন ‘হাতিটি কুলাসদৃশ’ এরূপ জ্ঞান হয়। কিন্তু এগুলি হাতির প্রকৃত স্বরূপ নয়, তা আংশিক স্বরূপ। তদনুরূপ কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ জীবের নিকট অনন্তধর্ম সম্পন্ন পদার্থসমূহের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না। এজন্য জৈনমতে বদ্ধজীবের জ্ঞানমাত্রই আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতাকে বোঝাতে জৈনাচার্যগণ ‘স্যাৎ’ শব্দের প্রয়োগ করেন। ‘স্যাৎ’ শব্দের অর্থ হল ‘কথঞ্চিৎ’ বা ‘কোনও অপেক্ষায়’। যখন আমরা বলি ‘ঘট অস্তি’ তখন জৈনমতে আমাদের বলা উচিত ‘স্যাৎ ঘটঃ অস্তি’ অর্থাৎ ঘটটি কথঞ্চিৎ অস্তিত্ববান। অভিপ্রায় এই যে, জৈনমতে ঘটটি যে ক্ষণে এস্থলে উপস্থিত, সেই একই ক্ষণে অন্যত্র উপস্থিত নয় – এই উভয় জ্ঞানই সত্য। আবার ঘটটি টেবিলের ওপর সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রূপে অস্তিত্বশীল হলেও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে অস্তিত্বশীল নয়। তাই একান্তভাবে ‘ঘট অস্তিত্বশীল’ এমন বলা যায় না। তদনুরূপ একান্তভাবে ‘ঘট অস্তিত্বশীল নয়’ এমনও বলা যায় না। কাজেই জৈনমতে সাধারণ জীবের দৃষ্টিতে পদার্থমাত্রেরই স্বরূপ আপেক্ষিক। কিন্তু যিনি কর্মবন্ধনের নাগপাশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেছেন, এমন কেবল জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটই পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। কাজেই একমাত্র কেবলজ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিই অনন্তধর্মবিশিষ্ট-পদার্থসমূহকে নানারূপে সর্বতোভাবে জানতে পারেন।

জৈনমতে আমাদের জগৎ যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেগুলিকে মূলত দু’শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা – জীব ও অজীব। জৈনমতে যা বোধাত্মক অর্থাৎ যার চেতনা জনিত বোধ আছে তা হল জীব। আর যা অবোধাত্মক অর্থাৎ যার চেতনা জনিত বোধ নেই তা হল অজীব। জীবকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা – মুক্ত ও সংসারী বা বদ্ধ। যিনি কর্মবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি দীর্ঘ ধ্যান, তপস্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষয় করে মুক্তিলাভ করেছেন, তিনি হলেন মুক্ত জীব। এই মুক্ত জীব অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের অধিকারী। অপরদিকে কর্মবন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমন করে যে জীব, তারা হল সংসারী বা বদ্ধ জীব। এই সংসারী জীব আবার জৈন মতে দু'প্রকার, যথা – সমনস্ক ও অমনস্ক। যার মন আছে তাকে সমনস্ক জীব আর যার মন নেই তাকে অমনস্ক জীব বলা হয়। সংসারী জীবকে আরও একভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা – ত্রস ও স্থাবর। সাধারণত যে জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে পারে, তাদের ত্রস বলা হয়। আর যারা এরূপ গমন করতে পারে না, তাদের স্থাবর বলা হয়। কিন্তু জৈনদর্শনে যারা শুভ ও অশুভ কর্ম গ্রহণ করতে পারে তাদের ত্রস বলা হয়, আর যারা শুভ ও অশুভ কর্মের অধীন তাদের স্থাবর বলা হয়। স্থাবর জীব পৃথিবীকায়িক, জলকায়িক, অগ্নিকায়িক, বায়ুকায়িক ও বনস্পতিকায়িক ভেদে পঞ্চবিধ। 'কায়' বা 'শরীর'-এর ন্যায় স্থান ব্যেপে থাকে বলে কায়িক বলা হয়েছে। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি পৃথিবীকায়িকের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার জল, শিশির, শিল প্রভৃতি অপ্ কায় এর অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি, অঙ্গার, উল্কা প্রভৃতি অগ্নিকায়; বাতাস, ঘূর্ণবাত প্রভৃতি বায়ুকায়ের এবং বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শৈবালাদি বনস্পতিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদের মন না থাকায় এদের অমনস্কায় জীব বলা হয়ে থাকে। এই বনস্পতিকায় আবার দু'ভাগে বিভক্ত, যথা – সাধারণ বনস্পতি ও প্রত্যেক বনস্পতি। যে বনস্পতির একটিমাত্র শরীরে অনন্তজীব অবস্থান করে, তাদের সাধারণ বনস্পতি বলা হয়। যেমন – আলু, কাঁচা আদা, কাঁচা হলুদ প্রভৃতি। একটিমাত্র আলু বা আদা টুকরো করে রোপণ করলে অনেক গাছের জন্ম হয় – এর থেকে বোঝা যায়, আলু বা আদা শরীরে অনন্তজীব অবস্থান করে। অপরদিকে একটি অবয়বে শরীরে একটিমাত্র জীব অবস্থান করলে, তাদের প্রত্যেক ববস্পতি বলে। যেমন, বৃক্ষ -- প্রত্যেক বীজ হতে একটিমাত্র বৃক্ষ জন্মায়। স্থাবর জীব একটি ইন্দ্রিয় তথা স্পর্শ ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে থাকে। তবে ত্রস জীব একের অধিক ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুসারে ত্রস জীবকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যথা – দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত (যেমন – কৃমি, শুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি)। এরা স্পর্শেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়যুক্ত। তিন ইন্দ্রিয়যুক্ত (যেমন – পিপিলিকা, জোঁক ইত্যাদি)। এরা স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত। চার ইন্দ্রিয়যুক্ত (যেমন – মক্ষিকা, মশক, ভ্রমর ইথাদি)। এরা স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়

ও দর্শনেন্দ্রিয়যুক্ত। সর্বশেষ হল পাঁচ ইন্দ্রিয় যুক্ত (মনুষ্য, পশু-পক্ষী ইত্যাদি তীর্য্যক্ প্রাণী, দেবলোকে উৎপন্ন দেবগণ, নরকে উৎপন্ন জীব তথা নারক প্রভৃতি সর্বশেষ পর্যায়ভুক্ত)। এঁরা স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যুক্ত। এঁদের মন বা সংজ্ঞা থাকায় এঁরা জৈনদর্শনে সমনস্ক জীব হিসাবে পরিগণিত।

জৈনদর্শনে অজীবকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় এবং কাল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনও কোনও আচার্য জৈনসম্মত পদার্থ বা তত্ত্বসমূহকে আস্তিকায় ও অনস্তিকায়ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেন। যে সমস্ত পদার্থ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত; অর্থাৎ ঐ তিন কালেই যাদের স্থিতি রয়েছে এবং শরীরের মত স্থান ব্যেপে অবস্থান করে, তাদের অস্তিকায় দ্রব্য বলা হয়। মূল কোথা হল, যে সমস্ত পদার্থ দেশে ও কালে অবস্থান করে তাদের অস্তিকায় দ্রব্য বলে। জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্গল দেশে ও কালে অবস্থান করে বলে এদের অস্তিকায় দ্রব্য বলা হয়। অপরদিকে কাল হল অনস্তিকায় দ্রব্য, যেহেতু তা স্থান ব্যেপে থাকে না।

জৈনমতে পদার্থ বা তত্ত্ব প্রধানত দু'প্রকার – জীব ও অজীব। তবে উমাস্বাতি প্রমুখ আচার্যের মতে, সম্যগ্ দর্শনের সহায়ক তত্ত্ব সাতপ্রকার, যথা – জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ। কায়, বাক্য, মন প্রভৃতি দ্বার পথে কর্মপুদ্গল জীবের মধ্যে প্রবেশ করে। কর্মপুদ্গলের এই চলমানতা বা গতিকে আস্রব বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একখণ্ড ভিজে কাপড়কে যদি শুকনো করতে দেওয়া হয় তা হলে দেখা যাবে ভিজে কাপড় খণ্ডটি তার সমস্ত অংশ দিয়ে বায়ুবাহিত ধূলিকণা গ্রহণ করে। তেমনি কষায়রূপ জলে সিক্ত জীব আস্রব দ্বারা আনীত কর্মকে তার সমস্ত অবয়ব দিয়ে গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ্য যে যা জীবকে পাপ পথে নিয়ে যায় এবং জীবের বিনাশ সাধন করে, তাকে জৈনদর্শনে কষায় বলে। ক্রোধ, মান, লোভ, মায়া, অহংকার প্রভৃতি জীবের বিনাশের মূল। তাই এইগুলিকে কষায় বলা হয়ে থাকে। এই আস্রব দু'প্রকার, যথা – শুভ ও অশুভ। শুভ আস্রব হল পুন্যের কারণ, আর অশুভ আস্রব হল পাপের কারণ। কর্মের

আস্রবের মাধ্যমে কর্মপুদ্গল সূক্ষ্মরূপে জীব শরীরে প্রবেশ করে অণু-দ্ব্যণুকাদি ক্রমে কর্মে পরিণতি লাভ করলে কষায়যুক্ত জীব অবিবেক (মিথ্যাদর্শন), অবিরতি (অসৎকর্মে প্রবৃত্তি), প্রমাদ (ভ্রান্তি) প্রভৃতি জন্য তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, একে বন্ধ বলে। ত্রিগুপ্তি (কায়-গুপ্তি, বাক্-গুপ্তি ও মনো-গুপ্তি), পঞ্চ-সমিতি (ঈর্ষাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণাসমিতি, উৎসর্গসমিতি ও আদানসমিতি) প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মপুদ্গলের গতির নিরোধকে সংবর বলে। আর জীব যে কর্ম অর্জন করে, ধ্যান, জপ, তপস্যা ইত্যাদির মাধ্যমে তার বিনাশ সাধনকে নির্জরা বলে। জীব বিবেকজ্ঞান লাভ করলে বন্ধের কারণ যে মিথ্যাদর্শন তা দূরীভূত হয়। ফলে নতুন কোনও কর্মের উদয় হয় না, নির্জরার দ্বারা পূর্বার্জিত কর্মেরও বিনাশ হয়। ফলত কর্মবন্ধন থেকে জীব চিরকালের জন্য মুক্ত হয়। একেই মোক্ষ বলে। কোনও কোনও গ্রন্থাকার আবার জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ – এই নয়টিকে তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করেন। যদিও উমাস্বাতি পুণ্য ও পাপ – এই দু'টিকে পৃথক তত্ত্ব রূপে গণনা না করে বন্ধ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জৈনদর্শনে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণও হতে পদার্থের বিভাগ প্রদর্শিত হয়েছে। কোনও কোনও জৈনাচার্য আমাদের জগৎ যা দিয়ে নির্মিত সেগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন – জীব ও অজীব। আবার উমাস্বাতি প্রমুখ আচার্য যা কিছু তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়ক সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

পদার্থ-বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের অভিমতঃ

ভারতীয়দর্শনের ইতিহাসে যে সমস্ত দর্শন প্রমেয়শাস্ত্র রূপে পরিগণিত, তাদের মধ্যে সাংখ্যদর্শন অন্যতম। যেহেতু প্রমেয়সমূহই সাংখ্যদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। সাংখ্যদর্শনে প্রমেয়, তত্ত্ব, পদার্থ – এই শব্দগুলিকে অভিন্নার্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কাজেই অন্যান্য দর্শনে পদার্থ বলতে যা বোঝানো হয়েছে, সাংখ্যদর্শনে তাকেই তত্ত্ব বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে

দু'টি মূল তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে – যথা, পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যমতে এ জগৎ ও জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুসমূহ প্রকৃতিরই পরিণামমাত্র[১৫]।

সাংখ্য-স্বীকৃত পুরুষ ও প্রকৃতি – এই দু'টি তত্ত্ব পরস্পরের বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট। প্রকৃতি জড় বা অচেতন কিন্তু পরিণামী। অপরদিকে পুরুষ চেতন কিন্তু অপরিণামী। এখানে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে, প্রকৃতিকে জড়ধর্মী বা অচেতন বলা হলে পরিণামী বলা যাবে কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকাতে* একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে –

'বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য'[১৬]।

অর্থাৎ গোরুর দুগ্ধ অচেতন পদার্থ কিন্তু তা যেমন গো শাবকের জীবনধারণের নিমিত্ত আপনা আপনি গোরুর স্তন্য হতে ক্ষরিত হয়। তদনুরূপ প্রকৃতি অচেতন হলেও পুরুষের ভোগ সাধনের নিমিত্ত জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়।

সাংখ্যদর্শন মূলত জীবকেন্দ্রিক। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি জীবমাত্রেরই পরমলক্ষ্য। দুঃখ আছে কারণ ব্যাধিজ্বরাবৃত পৃথিবীতে এমন কোনও জীব নেই যার কোনও দিন দুঃখের অনুভব হয়নি। দুঃখ যেমন রয়েছে তার নিবৃত্তির উপায়ও রয়েছে। সাংখ্যাচার্যগণ জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির-নিমিত্ত, মোক্ষোপযোগী হিসাবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন। কাজেই অন্যান্য ভারতীয়দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও মোক্ষলাভের সহায়করূপে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ -এর যাবৎ পদার্থকে সাংখ্যাচার্যগণ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং ন প্রকৃতি ন বিকৃতি অর্থাৎ অনুভয়।

---

[১৫] 'উপাদানসমসত্তাককার্যাপত্তি' অর্থাৎ উপাদানের সমান সত্তা বিশিষ্ট কার্যাকার প্রাপ্তিই হল পরিণাম। যেমন – দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তি। এস্থলে দধি হল দুগ্ধের পরিণাম। কারণ দুগ্ধটাই দধিতে পরিণত হয়। তদনুরূপ মূল কারণ যে অব্যক্ত প্রকৃতি তা জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাই জগৎ হল প্রকৃতির পরিণাম।

[১৬] গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র (অনুদিত), ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত *সাংখ্য-কারিকা,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩৩৩।

'প্রকৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা হয় – 'প্রকরোতি যা সাঃ প্রকৃতিঃ' অর্থাৎ যা প্রকৃষ্টরূপে কারণ হয় তাই প্রকৃতি। অভিপ্রায় এই যে, আমাদের জগৎ -এর প্রতিটি বস্তুই জন্য পদার্থ অর্থাৎ কোনও কারণ দ্বারা উৎপন্ন। তাই তাদেরকে সঙ্ঘাত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতি হল অকারণক। তা সবকিছুর কারণ হলেও তার র কোনও কারণ বা মূল নেই। প্রকৃতির যদি কারণ স্বীকার করা হয় তা হলে সেই কারণের আবার কারণ স্বীকার করতে হবে, সেই কারণের আবার কারণ স্বীকার করতে হবে – এভাবে অনন্ত পথের যাত্রী হতে হবে। ফলত অনবস্থা অনিবার্য। তাই সাংখ্যাচার্যগণ বলেন, 'মূলপ্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ'[১৭]। অর্থাৎ প্রকৃতি হল মূল, তার আর কোনও কারণ নেই।

'বিকৃতি' শব্দটির অর্থ হল যা কার্য। অভিপ্রায় এই যে, যে তত্ত্বগুলি কেবল কার্য হয়, কারও কারণ হয় না, তাদেরকে বিকৃতি বলা হয়। সাংখ্যমতে "ষোড়শকস্তু বিকারঃ" অর্থাৎ বিকার ষোল প্রকার। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, তথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক; পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, তথা- বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন – এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, তথা- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ্ ও ব্যোম – এই ষোলটি তত্ত্ব সাংখ্যমতে কেবল বিকার। যেহেতু এগুলি কেবলমাত্র কার্য, এগুলি কখনও কারণ হয় না। এখানে আপত্তি হতে পারে পঞ্চভূতের অন্তর্গত পৃথিবী যেমন পৃথিবীতন্মাত্রের কার্য হয়, তদনুরূপ গো, ঘট, পটাদির প্রতি কারণ হয়। তা হলে পৃথিবীকে কেবল বিকৃতি কীভাবে বলা যায়? এর উত্তর *তত্ত্বকৌমুদী*কার সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন – 'সর্বেষাং গোঘটাদীনাং স্থূলতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা চ সমেতি ন তত্ত্বান্তরত্বম্'[১৮]। অভিপ্রায় এই যে, গো, ঘট, পটাদি পদার্থ পৃথিবীজন্য হলেও তাদের মধ্যে বৈলক্ষণ্য না থাকায় পৃথিবী হতে পৃথক তত্ত্বান্তর হিসাবে স্বীকার করা হয় না। অভিপ্রায় এই যে, পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও স্থূলতা বিদ্যমান। এখন পৃথিবীজন্য যে গো, ঘট, পটাদি তাতেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও স্থূলতা বিদ্যমান থাকায় পৃথিবী হতে বৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্যমান হয় না। তাই সাংখ্যাচার্যগণ গো, ঘট, পটাদি পদার্থকে

[১৭] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৮।
[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৮।

পৃথিবী হতে পৃথক তত্ত্বান্তরের মর্যাদা দেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, সাংখ্যদর্শন স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পরস্পর হতে বিলক্ষণ। তাই পৃথক তত্ত্ব রূপে গৃহীত হয়েছে। যেমন, পুরুষ চেতন, নির্গুণ, কূটস্থ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্ত হওয়ায় প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম সকল হতে ভিন্ন। যেহেতু প্রকৃতি আদি জড়বর্গ অচেতন, সগুণ এবং পরিণামী। জড়বর্গের প্রতিটি তত্ত্বের মধ্যেও বৈলক্ষণ্য হেতু প্রতিটি পৃথক তত্ত্বরূপে অভিহিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা[১৯] হল প্রকৃতি। কিন্তু যখন প্রকৃতি মহৎ রূপে অভিব্যক্ত হয় তখন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থাকে না। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। কারণ রজঃ গুণ চঞ্চল, পুরুষের সন্নিধানবশতঃ রজঃ গুণ অপরাপর গুণগুলিকে অভিভূত করে। ফলত বিসদৃশ-পরিণাম[২০] ঘটে এবং মহদাদিক্রমে পঞ্চমহাভূতাদি অভিব্যক্ত হয়। তাই মহদাদিকে তত্ত্বান্তর মানা হয়েছে। তদনুরূপ অহং বোধ অহংকার তত্ত্বে থাকে কিন্তু মহৎতত্ত্বে থাকে না, তাই অহংকারকে মহৎতত্ত্ব হতে পৃথক তত্ত্ব রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র অহংকার হতে ভিন্ন হওয়ায় এবং পরস্পর হতে বিলক্ষণ হওয়ায় পৃথক পৃথক তত্ত্ব রূপে স্বীকার করা হয়েছে। আবার পঞ্চমহাভূতের স্থূলতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাহেতু পঞ্চতন্মাত্র হতে ভিন্ন হওয়ায় পৃথক তত্ত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চমহাভূতের পরস্পরের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে, যেমন – আকাশ শব্দের আশ্রয় কিন্তু তাতে স্পর্শ নেই, বায়ু স্পর্শ গুণের আধার, তা চঞ্চল এবং প্রবাহমান, তদনুরূপ তেজের অসাধারণভাব উষ্ণত্ব এবং রূপ, জলের অসাধারণভাব তরলতা ও শীতলতা, পৃথিবীর অসাধারণভাব গন্ধ ও কাঠিন্য। এভাবে পঞ্চমহাভূত পরস্পর হতে বিলক্ষণ। তাই সাংখ্যদর্শনে সেগুলি পৃথক পৃথক তত্ত্বরূপে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু গো, ঘট, পটাদি পদার্থের পৃথিবী হতে বৈলক্ষণ্য না থাকায় পৃথক তত্ত্ব বলা যায় না। কাজেই সাংখ্যমতে কেবল বিকার হল ষোলটি।

---

[১৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৬।

[২০] সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম দুই প্রকার, যথা – সদৃশ-পরিণাম ও বিসদৃশ-পরিণাম। যে পরিণামের ফলে বস্তু নতুন কোন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, বস্তুটির পূর্বাবস্থারই পুনরাবির্ভাব ঘটে তাঁকে সদৃশ-পরিণাম বলে। আর যে পরিণামের ফলে বস্তু নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাঁকে বিসদৃশ-পরিণাম বলে। যতক্ষণ সদৃশ-পরিণাম থাকে ততক্ষণ কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না।

সাংখ্যমতে যা কখনও কখনও কারণ আবার কখনও কখনও কার্য হয়, তা 'প্রকৃতি-বিকৃতি' পদবাচ্য। মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র – এই সপ্তবিধ তত্ত্বকে সাংখ্যদর্শনে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'প্রকৃতি-বিকৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'প্রকৃতির বিকৃতি' এরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস না করে 'যা প্রকৃতি তা বিকৃতি' এরূপ কর্মধারয় সমাস বুঝতে হবে। তা না হলে কেবল মহৎতত্ত্বকেই প্রকৃতি-বিকৃতি বলতে হবে। যেহেতু প্রকৃতি হতে কেবল মহৎতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। আর মহৎ বা বুদ্ধি হতে অহংকার এবং অহংকার হতে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র অভিব্যক্ত হয়। কাজেই এস্থলে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হবে 'যা প্রকৃতি তা বিকৃতি'। অর্থাৎ যে তত্ত্বগুলি কারণও হয় আবার কার্যও হয়, সেগুলি 'প্রকৃতি-বিকৃতি' পদবাচ্য। যেমন, মহৎতত্ত্ব অহংকারতত্ত্বের কারণ হয় কিন্তু তা মূল প্রকৃতির কার্য। আবার অহংকারতত্ত্ব একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের কারণ হলেও মহৎতত্ত্বের কার্য। তদনুরূপ পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূতের কারণ কিন্তু তা অহংকার তত্ত্বের কার্য। এভাবে উক্ত তত্ত্বগুলি যেমন কখনও কখনও কারণ হয় তেমনি কখনও কখনও কার্য হয়। তাই এগুলিকে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হয়।

সর্বশেষ তত্ত্ব হল অনুভয়। 'ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ যা প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়, তা হল পুরুষ। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য-স্বীকৃত পুরুষ যেমন কোনওকিছুর কার্য হয় না, তদনুরূপ কোনওকিছুর কারণও হয় না। তাই তাকে অনুভয় রূপে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যমতে প্রকৃতি, মহদাদি সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত – এই ষোড়শ বিকৃতি এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। *'সাংখ্যকারিকা'*তে বলা হয়েছে –

'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতিতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়কস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'।[২১]

---

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা -৩৫।

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী। কারণ সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর নামক কোনও অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকৃত হয়নি। সাংখ্যমতে জীবের পরম লক্ষ্য হল মোক্ষ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ[22] হতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি। আর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে সাংখ্যকারগণ বলেন – 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ'। 'ব্যক্ত' কথাটির অর্থ হল অভিব্যক্ত বা কার্য। যা বিকৃতি বা বিকার নামে অভিহিত। 'অব্যক্ত' কথাটির অর্থ হল কারণ বা প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' বলতে পুরুষ বা চৈতন্যকে বোঝানো হয়েছে। এই পুরুষ ব্যক্তও নয়, অব্যক্তও নয় অর্থাৎ কার্যও নয়, কারণও নয়; তা এতদুভয় হতে ভিন্ন। সাংখ্যমতে জড় পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – ব্যক্ত ও অব্যক্ত। মহদাদি হতে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত তেইশটি তত্ত্ব হল ব্যক্ত বা কার্য। আর প্রকৃতি হল অব্যক্ত বা কারণ। সাংখ্যমতে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের চির-নিবৃত্তির তথা কৈবল্যের উপায়। এর জন্য ঈশ্বর স্বীকৃতি অনাবশ্যক। সাধারণত যাঁরা ঈশ্বর নামক অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁরা হয় মোক্ষলাভের পথে আবশ্যক হিসাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন; নতুবা জগৎ -এর উৎপত্তির ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। কিন্তু সাংখ্যাচার্যগণ যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁদের উক্ত উভয় বিকল্প নস্যাৎ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ অনুধাবন পূর্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীবের কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে। তার জন্য ঈশ্বর স্বীকৃতি অনাবশ্যক। এখন জগৎ -এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বর-স্বীকৃতি যে অনাবশ্যক তা প্রদর্শন করতে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন – যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি হল, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই জগৎ কার্যবস্তু। আর যা কার্য তার অবশ্যই কোনও না কোনও কর্তা রয়েছেন। কোনও কর্তার সংকল্প ব্যতিরেকে এই জড়ধর্মী জগৎ পরিচালিত হতে পারে না, এর জন্য সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এক কর্তাকে মানতে হয়। আর ঐ সত্তা হলেন ঈশ্বর। কিন্তু সাংখ্যমতে জগৎ

[22] সাংখ্যমতে দুঃখ ত্রিবিধ, যথা – আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ। আমাদের বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্য জনিত যাবতীয় শারীরিক-দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতির জন্য যাবতীয় মানসিক দুঃখকে একত্রে সাংখ্যাচার্যগণ আধ্যাত্মিক-দুঃখ বলেছেন। ভূত অর্থাৎ স্থাবর, জঙ্গম অর্থাৎ মানুষ, পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ এবং প্রস্তরাদি হতে আমাদের যে দুঃখ তা হল আধিভৌতিক-দুঃখ। আর দেবতা, রাক্ষস, পিসাচ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হতে আমাদের যে দুঃখ, তাঁকে সাংখ্যদর্শনে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়েছে। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ।

এবং জগৎ -এর যাবতীয় জাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টির জন্য কোনও সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান পুরুষের তথা ঈশ্বরের কল্পনা নিরর্থক। যেহেতু পরিণামী স্বভাব বিশিষ্ট প্রকৃতি; পুরুষের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত আপন স্বভাব নিয়মে জগৎ ও জাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ ক্রিয়াশীল প্রকৃতির মধ্যে গুণের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে ক্রমেই জগৎ এবং জাগতিক বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাই জগৎ এবং জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর নামক কোনও অতিরিক্ত তত্ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নেই। এজন্য সাংখ্যদর্শনকে 'নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য' নামে অভিহিত করা হয়। যদিও সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী কিনা এ নিয়ে পরবর্তিকালে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রভাষ্যে* দেখানোর চেষ্টা করেছেন সাংখ্যদর্শনেও ঈশ্বর স্বীকৃত। তাঁর যুক্তি হল – নিরীশ্বরবাদ শাস্ত্রে চরম নিন্দিত একটি মতবাদ। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র আচার্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত একটি শাস্ত্র। কাজেই এটা সিদ্ধান্ত করাই যায়, যে শাস্ত্র আচার্যগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে সে শাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদের মত চরম নিন্দিত মতবাদ স্বীকৃত হতে পারে না। তা ছাড়া মহর্ষি কপিল প্রদত্ত *সাংখ্যকারিকা* (১/৯২) 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' – এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত হল, এস্থলে প্রদত্ত কারিকার মাধ্যমে সাংখ্যকারিকাকার প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অভাবসিদ্ধ করেননি। বরং লৌকিক কোনও প্রমাণের দ্বারা যে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না, তাই প্রদত্ত কারিকার মূল অভিপ্রায়।

পদার্থ-বিষয়ে যোগ-দর্শনের অভিমতঃ

দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় সাংখ্য ও যোগদর্শনের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়কে সমানতন্ত্র অ্যাখ্যায় অ্যাখ্যায়িত করা হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, উভয় সম্প্রদায়ই একই দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আলোকপাত করলে উভয়কে পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে কেন উল্লেখ করা হল? আপাতভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর না হলেও, উভয় সম্প্রদায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন মূলত প্রমেয় প্রধান শাস্ত্র। পঞ্চবিংশতি প্রমেয়ই এই শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় সাংখ্যদর্শনের মূল লক্ষ্য হল জীবের সর্বপ্রকার দুঃখ হতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্যমতে

বিবেক জ্ঞানই অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই জীবের দুঃখ হতে পরিত্রাণের তথা কৈবল্যলাভের উপায়। আর এই বিবেকজ্ঞান শাস্ত্রমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং বৈরাগ্য অভ্যাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই মূল প্রকৃতি, সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি, ষোড়শ বিকৃতি এবং পুরুষ – এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্যদর্শনের মূল পতিপাদ্য। কিন্তু যোগদর্শনে সাংখ্য-স্বীকৃত তত্ত্বসমূহ স্বীকার করা হলেও কৈবল্যলাভের নিমিত্ত যোগসাধনার আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়েছে। তাই যোগের স্বরূপ, যোগ-প্রণালী ইত্যাদিই হল যোগদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। উভয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভেদ হেতু উভয় দর্শনকে পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পদার্থ-বিষয়ে যোগদর্শনের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শনের প্রায় অনুরূপ। মূল জড় প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র), একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ) এবং চেতন পুরুষ – সাংখ্য-স্বীকৃত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যোগদর্শনেও স্বীকৃত। এতদতিরিক্ত যোগদর্শনে ঈশ্বর নামক একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাই যোগদর্শনকে 'সেশ্বর-সাংখ্য' বলা হয়। যদিও জগৎস্রষ্টা রূপে ঈশ্বরের সত্তা যোগদর্শনে স্বীকৃত হয়নি। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির পরিণামক্রমে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টি – সাংখ্য সম্মত উক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াই যোগদর্শনেও স্বীকৃত। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, জগৎস্রষ্টা রূপে ঈশ্বর যোগদর্শনে স্বীকৃত না হলে যোগদর্শনে ঈশ্বর নামক তত্ত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা কী? যোগ মতে শাস্ত্রসম্মতভাবে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব যেমন কৈবল্যের পথে অগ্রসর হতে পারেন, তদনুরূপ ঈশ্বর-প্রণিধানের মাধ্যমেও জীবের সত্বর কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটতে পারে। *যোগসূত্রের* সাধনাপাদে বলা হয়েছে – 'সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ'[২৩] অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বরানুধ্যানের দ্বারাও জীবের সমাধি লাভ হয়। জীব যদি অবিচল ভক্তি সহযোগে কায়িক,

[২৩] আরণ্য, সাংখ্যযোগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা – ২৩৮।

বাচিক, ও মানসিক সকল বিষয়ই ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করেন এবং সর্বক্ষণ তাঁর ধ্যান করেন তা হলে তিনি ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করবেন। ফলস্বরূপ জীব সত্বর পরম অভীষ্টলাভে সমর্থ হবেন। তাই *যোগসূত্রভাষ্যে* বলা হয়েছে – 'ঈশ্বরার্পিতসর্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ'[২৪]। কাজেই জগৎকর্তৃরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যোগদর্শনেও অস্বীকৃত হয়েছে। তবে কৈবল্যলাভের সহায়করূপে ঈশ্বর-প্রণিধানের নিমিত্ত ঈশ্বর নামক অতিরিক্ত একটি তত্ত্ব যোগদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং যোগ মতে পদার্থ বা তত্ত্ব ছাব্বিশটি।

সাংখ্য-স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক তত্ত্বটি আচার্য ব্যাসদেব *যোগসূত্রভাষ্যে* এভাবে প্রতিপাদন করেছেন –

যোগ-সম্মত ঈশ্বর প্রধান তত্ত্ব নয়, পুরুষ তত্ত্বও নন, এতদতিরিক্ত পদার্থ। কারণ যোগ মতে প্রকৃতি জড়স্বভাব। কিন্তু যাঁর অনুগ্রহে জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে, তিনি কখনও জড় হতে পারেন না। তবে তাঁকে চেতন পুরুষও বলা যাবে না। কারণ অবিদ্যাদি ক্লেশ, পাপ ও পুণ্যাদিরূপ কর্ম, কর্মের ফল (বিপাক) এবং সেই বিপাকের অনুরূপ আশয় (সংস্কার) সকল চিত্তে বর্তমান থাকলেও, তা পুরুষে আরোপিত বলে বোধ হয়। ফলত পুরুষ সেই ফলের ভক্তৃস্বরূপ হন। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে জয় কিংবা পরাজয় মূলত যুদ্ধরত সৈনিকদের হয়। কিন্তু আমরা জয় পরাজয় রাজাতে আরোপ করি। আমরা মনে করি যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় রাজারই জয়-পরাজয়। এস্থলে যুদ্ধরত সৈনিকদের জয়-পরাজয় যেমন রাজাতে আরোপিত হয়, তেমনি ক্লেশাদি চিত্তে বর্তমান থাকলেও তা পুরুষে আরোপিত হয়। কিন্তু যিনি ঈশ্বর তাঁর এই ফলভোগের সঙ্গে কোনওরূপ সম্বন্ধই থাকে না। যেহেতু তিনি ক্লেশ-বিপাকাদি হতে মুক্ত। তাই পুরুষ ও প্রকৃতি অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক একটি তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যাঁর অনুগ্রহে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়।

[২৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৫।

তবে যাঁরা মুক্তিলাভ করেছেন, যাঁরা ক্লেশ-বিপাকাদি হতে মুক্ত এমন পুরুষকেও ঈশ্বর বলা যাবে না। কারণ মুক্ত পুরুষগণ নানাবিধ বন্ধন মুক্ত হয়েই মুক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছেন। অভিপ্রায় এই যে, যাঁরা এমন মুক্ত হয়েছেন তাঁরা কিন্তু পূর্বে নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যেমন – মহর্ষি কপিল প্রমুখ ঋষিগণ পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ কোনও পূর্ববন্ধন নেই। তিনি সদামুক্ত। তাঁর পরে বন্ধনের সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁর পূর্ববন্ধনের জ্ঞান আমাদের যেমন রয়েছে, তদনুরূপ উত্তরবন্ধনের অর্থাৎ লয়ের অবসানে পুনর্বার কর্মফল সম্বন্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের এমন কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনরহিত। তা ছাড়া ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ। ঈশ্বরের জ্ঞান হতে নিরতিশয় জ্ঞান কারও নেই। পৃথিবীতে অনেক ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ থাকতে পারেন কিন্তু যোগ-সম্মত ঈশ্বরের তুল্য বা তদধিক ঐশ্বর্য্যশালী কোনও পুরুষই নেই। এভাবে নানা যুক্তি দেখিয়ে আচার্য ব্যাসদেব তাঁর *যোগসূত্রভাষ্যে* সাংখ্য সম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর সাংখ্যপ্রবচনসূত্রভাষ্যে যোগদর্শনকে 'সাংখ্যদর্শনের পরিশিষ্ট' বলেছেন। কারণ তাঁর মতে সাংখ্য-শাস্ত্রের অনুক্ত ঈশ্বরতত্ত্বই পরবর্তিকালে যোগদর্শনে উক্ত হয়েছে।

পদার্থ-বিষয়ে ন্যায়-দর্শনের অভিমতঃ

সমগ্র ন্যায় চর্চার ধারাকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয় – প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায়। মহর্ষি গৌতমের সময়কাল হতে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ববর্তী সময়কালের ন্যায়-চর্চা প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সময়কাল হতে পরবর্তী কালের যে ন্যায় চর্চা তা মূলত নব্যন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয়দর্শন সম্প্রপদায়গুলির মধ্যে মহর্ষি গৌতম প্রণীত *ন্যায়সূত্রে* বিশেষ আঙ্গিকে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে ভারতীয়-দর্শনে পদার্থ বলতে বোঝায় 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' অর্থাৎ একটি পদ হতে যে অর্থ উপস্থাপিত হয়, তা হল পদার্থ। এই অর্থে আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ -এর যাবতীয় উপাদান, যেগুলি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় কিংবা জ্ঞানের বিষয় হওয়ার যোগ্য, তাদের পদার্থ বলা হয়ে থাকে। তাই ভারতীয়-দর্শনে পদার্থ, প্রমেয়, জ্ঞেয়, বাচ্য, অভিধেয় ইত্যাদি

শব্দগুলিকে পর্য্যায়বাচক শব্দ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রে যখন মুমুক্ষুব্যক্তির পরম অভিপ্রেত মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়করূপে ষোড়শ-পদার্থের উল্লেখ করেন, তখন তিনি 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' এই অর্থে পদার্থের উল্লেখ করেননি। তিনি জীবমাত্রেরই পরমলক্ষ্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তির ক্ষেত্রে উপযোগী পদার্থসমূহের উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন – 'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'[২৫] অর্থাৎ যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, সেই পদার্থ ষোল প্রকার; যথা – প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থান। মহর্ষি প্রদত্ত সূত্র হতে এটা পরিষ্কার যে, তিনি এস্থলে 'পদার্থ' ও 'প্রমেয়' শব্দদু'টিকে পর্য্যায়বাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেননি। কারণ এস্থলে পদার্থ বলতে যা কিছু মোক্ষোপযোগী সেগুলিকে বুঝিয়েছেন। আর সেগুলির মধ্যে একটি হল প্রমেয়। যদিও উক্ত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে প্রমেয়কে মুখ্য পদার্থ হিসাবে গণ্য করেন। কারণ প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি বা জ্ঞান, মন, শুভ ও অশুভ কর্মরূপ প্রবৃত্তি-রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ – এই দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানজন্য সমস্ত প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তার কার্য দোষের বিনাশ ঘটে। দোষ বিনাশপ্রাপ্ত হলে দোষজন্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তিজন্য জন্মের নিরোধ ঘটে। আর জন্ম না হলে জীবের কোনও প্রকার দুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না। ফলস্বরূপ জীব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন।

[২৫] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায় দর্শন, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা – ১৮-১৯।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞানজন্য যদি মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে জীব অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়, তা হলে প্রমাণাদি পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা কী? এই প্রশ্নের উত্তর ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন '*ন্যায়সূত্র*' (১/১/১) এর ভাষ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, প্রমাণ তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত প্রমেয় তত্ত্বের জ্ঞান সম্ভবই নয়, কারণ প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়। ফলত প্রমাণ নামক পদার্থ অবশ্য স্বীকার করতে হবে। আর প্রমাণের দ্বারা অর্থ (প্রমেয়) পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিচারের আবশ্যক-রূপে সংশয়াদি পদার্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হওয়ায় মহর্ষি গৌতম সংশয়াদি পদার্থেরও উল্লেখ করেছেন। যদিও মুক্তির ক্ষেত্রে সংশয়াদি পদার্থ সাক্ষাৎভাবে উপযোগী হয় না, তথাপি পরম্পরায় মুক্তির উপযোগী হওয়ায় মহর্ষি গৌতম সংশয়াদি পদার্থকে মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থের উদ্দেশ করলেও তিনি ষোড়শপদার্থমাত্রবাদী নন। অভিপ্রায় এই যে, মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রের দ্বারা পদার্থের সংখ্যানিয়ম প্রকাশ করেননি। প্রদত্ত স্থলে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী পদার্থ যে ষোল প্রকার, তা প্রদর্শন করেছেন। তবে মোক্ষলাভের উপযোগী নয় এমন অসংখ্য পদার্থও জগতে থাকতে পারে। পদার্থের সংখ্যানিয়ম নিয়ত বা নির্দিষ্ট না থাকায় মহর্ষি অনুসারী ন্যায়সম্প্রদায়কে 'অনিয়ত-পদার্থবাদী' বলা হয়।

'প্রমেয়' শব্দটিকে মহর্ষি সাধারণত দু'টি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। *ন্যায়সূত্র* (১/১/১)-এ যখন তিনি 'প্রমেয়' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, তখন তার অর্থ করেছেন – যা মুমুক্ষের প্রকৃষ্ট মেয় অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তির পরম অভিপ্রেত, যার তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই সমস্ত বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্বক মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়, তাকে প্রমেয় বলেছেন। এই অর্থে তিনি আত্মা, শরীরাদি দ্বাদশ পদার্থকে প্রমেয় বলেছেন। আবার *ন্যায়সূত্র* (২/১/১৬)-তে যখন প্রমেয়-পদার্থের প্রমেয়ত্ব সিদ্ধ করেছেন, তখন 'প্রমেয়' বলতে যা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ – এমন অর্থ করেছেন। কারণ ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ষোড়শ সূত্রে বলেছেন – 'প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ'[২৬]। এই অর্থে প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থকেও প্রমেয় বলেছেন।

[২৬] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* দ্বিতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৭২।

তবে নৈয়ায়িকগণ যেহেতু অনিয়তপদার্থবাদী সেহেতু তাঁদের মতে ষোড়শ-পদার্থের অতিরিক্ত অসংখ্য পদার্থও থাকতে পারে। তবে মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক না হওয়ায় সেগুলি মহর্ষি প্রদত্ত সূত্রে উক্ত হয়নি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন *ন্যায়সূত্রভাষ্যে* উক্ত কথার সমর্থন করেন। কাজেই বোঝা যায়, প্রমাণাদি মোক্ষোপযোগী পদার্থ অতিরিক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থসমূহও ন্যায়দর্শন স্বীকৃত। তাই পরবর্তিকালে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ '*সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহ যে নৈয়ায়িকগণসম্মত তার সমর্থনে বলেন – 'এতে চ পদার্থা বৈশেষিক-প্রসিদ্ধাঃ, নৈয়ায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে'[২৭]।

অভাব নামক পদার্থও ন্যায়দর্শন সম্মত। কারণ ন্যায়মতে যা প্রমাণসিদ্ধ নয় তাকে পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু অভাব-পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ। যে প্রমাণ দ্বারা আমরা ভাব-পদার্থসমূহকে জানতে পারি, সেই প্রমাণ দ্বারাই আমাদের অভাব-পদার্থের জ্ঞান হয়ে থাকে। কাজেই অভাব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তা পদার্থ পদবাচ্য। যদিও মহর্ষি গৌতম স্বতন্ত্রভাবে অভাব নামক পদার্থের উদ্দেশ করেননি, তথাপি মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয় এর অন্তর্ভুক্ত অপবর্গ(দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস) কিংবা প্রয়োজনের অন্তর্গত দুঃখাভাব – অভাব-পদার্থ। মূলকথা হল তত্ত্ব বা পদার্থ ন্যায়মতে দু'প্রকার – ভাব-পদার্থ এবং অভাব-পদার্থ। পদার্থের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়ম নেই, তাই তা অসংখ্য। তবে যেগুলি জীবমাত্রেরই পরম অভিপ্রেত মোক্ষলাভের সহায়ক সেগুলি ভাব-পদার্থ হোক কিংবা অভাব-পদার্থ হোক, মহর্ষি-কর্তৃক উদ্দিষ্ট হয়েছে। আর যেগুলি মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে সহায়ক নয় সেগুলি মহর্ষি-কর্তৃক উদ্দিষ্ট হয়নি। প্রমাণাদি ষোড়শ-পদার্থ ন্যায়সম্মত মুক্তির সহায়ক হওয়ায় প্রথমসূত্রে তিনি ষোলপ্রকার পদার্থেরই উদ্দেশ করেছেন।

তবে ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ দ্রব্যাদি সপ্ত-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় পরবর্তিকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রমুখ নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থই স্বীকার করেছেন। যদিও নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি আবার বৈশেষিকসম্মত সপ্ত-পদার্থের অন্তর্গত বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করেন না। বৈশেষিকস্বীকৃত পদার্থ অতিরিক্ত অত্যন্তাভাবাভাব, ক্ষণ, শক্তি,

[২৭] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন(অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ১৭-১৮।

কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়ত্বকে অতিরিক্ত পদার্থ বলেন। ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহ পরবর্তী অধ্যায়ের মূল আলোচ্য হওয়ায় এখানে বিস্তারিত আলোচনা হতে বিরত থাকলাম।

পদার্থ বিষয়ে মীমাংসা-দর্শনের অভিমতঃ

ষড়্বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে মীমাংসা-দর্শন অন্যতম। কারণ এই দর্শনের মূল লক্ষ্যই হল বেদার্থ-বিচার। তবে বেদার্থ-বিচারের ক্ষেত্রে যে সম্প্রদায় বেদের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রাধ্যান্য দেন, তাঁরা পূর্ব-মীমাংসা-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। আর যে সম্প্রদায় বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রাধ্যান্য দেন, তাঁরা উত্তর-মীমাংসা নামে পরিচিত। যা বেদান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। পদার্থ-বিষয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিমত বর্ণনের ক্ষেত্রে 'মীমাংসা' শব্দটি পূর্ব-মীমাংসা-সম্প্রদায়কে বোঝাতে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল মহর্ষি জৈমিনিকৃত '*মীমাংসাসূত্র*। কিন্তু বৈদিক্ কর্মকাণ্ডের যুক্তিপূর্বক প্রতিপাদন উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচ্য হওয়ায়, সেখানে পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। '*মীমাংসাসূত্রে*'র ওপর রচিত একটি অন্যতম ভাষ্য; '*শবরভাষ্যে*'ও পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও অবয়ব – এই চারটি পদার্থের উল্লেখ করেন। তবে মহর্ষি জৈমিনিকে অনুসরণ করে ধর্মের ব্যাখ্যা তাঁর ভাষ্যের মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায়, পদার্থের নিরূপণ তিনিও সেভাবে করেননি। পরবর্তিকালের মীমাংসকগণ বাহ্যবস্তুর স্বরূপালোচনা প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক মতানুসারী হওয়ায় পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা তাঁদের প্রস্থানে স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে কুমারিলভট্ট এবং তাঁর শিষ্য প্রভাকরমিশ্রের মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁরা কুমারিলভট্টের অনুগামী তাঁদের অভিমত ভাট্টমত নামে পরিচিত। আর যাঁরা প্রভাকর মিশ্রের অনুগামী তাঁদের অভিমত প্রাভাকর মত নামে পরিচিত, যা গুরুমত নামেও পরিচিত। যাই হোক উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনার স্বাতন্ত্রতাহেতু পদার্থ-বিষয়ক আলোচনায়ও উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।

নারায়ণভট্ট তাঁর '*মানমেয়োদয়ঃ*' গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন – 'মানমেয়বিভাগেন বস্তূনাং দ্বিবিধা স্থিতিঃ'[২৮]। অভিপ্রায় এই যে, ভাট্টমতে জগৎ -এর প্রতিটি বস্তুই হয় প্রমাণ অথবা প্রমেয়-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েই অবস্থান করে। কাজেই ভাট্টমতে জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- প্রমাণ ও প্রমেয়। এ বিষয়ে প্রাভাকর-সম্প্রদায়ও সহমত প্রকাশ করেন। ভারতীয়-দর্শনে প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়। আর প্রমা-জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলা হয়। ভাট্টমতে প্রমাণ ছয় প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অভাব। যদিও প্রাভাকরগণ পাঁচ প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি। তাঁরা অভাবগ্রাহক প্রমাণরূপে অনুপলব্ধি নামক প্রমাণ স্বীকার করেন না। যেহেতু অভাবকে তাঁরা পদার্থ বলে স্বীকারই করেন না। প্রমাণ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মতভিন্নতাহেতু প্রমেয়-পদার্থ বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মতানৈক্য বিদ্যমান।

নারায়ণ পণ্ডিত প্রণীত '*মানমেয়োদয়ঃ*' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

'বয়ং তাবৎ প্রমেয়ং তু দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াঃ।
অভাবশ্চেতি পঞ্চৈতান্ পদার্থানাদ্রিয়ামহে'।।[২৯]

অর্থাৎ ভাট্টমতে প্রমেয় পাঁচ প্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি বা সামান্য এবং অভাব। কিন্তু প্রাভাকরগণ ভাট্টসম্মত পঞ্চবিধ পদার্থের মধ্যে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকারই করেন না। পরন্তু ভাট্ট-সম্প্রদায় স্বীকৃত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি বা সামান্য অতিরিক্ত সমবায়, শক্তি, সংখ্যা এবং সাদৃশ্যকেও স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন। কাজেই প্রভাকরমতে প্রমেয় বা পদার্থ আটপ্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য। তন্ত্ররহস্যে বলা হয়েছে – 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যসমবায়শক্তিসংখ্যাসাদৃশ্যান্যষ্টৌ পদার্থাঃ'[৩০]। কুমারিলভট্ট ন্যায়-বৈশেষিকস্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে বিশেষ ও সমবায়কে স্বীকারই

---

[২৮] ত্রিপাঠী, শ্রী দীননাথ, *মানমেয়োদয়ঃ*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ১।

[২৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩১।

[৩০] Shamashastry, R. *Tantrarahasya* by Ramanujacharya, Baroda, Central Library, 1923, page – 20.

করেননি, যদিও প্রাভাকরগণ সমবায়ের পৃথক পদার্থত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁরা ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণের মতানুসারী হয়ে দু'টি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যকার সম্বন্ধকে সমবায় বলেছেন – 'অযুতসিদ্ধয়োস্সংম্বন্ধস্সমবায়ঃ'।[৩১] যদিও ন্যায়-বৈশেষিকমতে সমবায় এক এবং সমবায় হল নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু প্রভাকরমতে সমবায় সম্বন্ধ নিত্যও হতে পারে আবার অনিত্যও হতে পারে। দু'টি নিত্য পদার্থের মধ্যে; যেমন, পরমাণু ও আকাশ এই দু'টি নিত্য পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা নিত্য। কিন্তু নিত্য ও অনিত্য পদার্থের মধ্যে; যেমন, জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে কিংবা দু'টি অনিত্য পদার্থের মধ্যে; যেমন, গুণ ও গুণীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা অনিত্য সম্বন্ধ। ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে যে সমবায় সম্বন্ধ তা প্রভাকরমতে অনিত্য কারণ ব্যক্তির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়, আর ব্যক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সম্বন্ধটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রাভাকরগণ সমবায় সম্বন্ধকে নিত্যা-নিত্য সম্বন্ধ বলেছেন এবং এই সম্বন্ধ এক নয়, সম্বন্ধীভেদে তা বহু। তবে নারায়ণ পণ্ডিত প্রমুখ ভাট্ট আচার্যগণ সমবায় নামক পদার্থের স্বতন্ত্র পদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধও; তা সমবায় নয়, তা হল তাদাত্ম্য। তদনুরূপ অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ; তাও সমবায় নয়, তাদের মধ্যে স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত। কাজেই সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থের মর্যাদা দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে প্রাভাকর ও ভাট্ট উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে উভয় সম্প্রদায়ই ন্যায়-বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ নামক স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ স্বীকারই করেন না। আকাশাদি নিত্য পদার্থের মধ্যে ভেদ নিরূপণের জন্য বৈশেষিক-দর্শনে বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু প্রভাকরমতে, পৃথক্ত্ব নামক গুণের সাহায্যেই যে কোনও বস্তুর ভেদ নিরূপিত হয়। কাজেই বিশেষ নামক স্বতন্ত্র একটি পদার্থ স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই নেই। কমলাকরভট্ট প্রমুখ আচার্যগণও বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ নামক পদার্থের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, নিত্য পদার্থের স্বরূপব্যাবৃত্তির নিমিত্ত বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই নেই। কারণ নিত্য পদার্থের স্বরূপভেদ নিত্যই হবে। ফলত তা কোনওকিছু

[৩১] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩।

জন্য - এমন বলা নিরর্থক। সুতরাং নিত্যপদার্থের স্বরূপব্যাবৃত্তি বিশেষজন্য – এমন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কাজেই সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়াবিশিষ্ট নিত্য পদার্থের ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ নামক স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নেই।

ভাট্টগণ প্রভাকর-সম্মত শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য পদার্থেরও পৃথক পদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। প্রভাকরমতে, শক্তি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যা পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুতেই বিদ্যমান। সকল পদার্থের উৎপত্তির মুলে রয়েছে এক অদৃষ্ট শক্তি, যা *মীমাংসা-দর্শনে* 'অপূর্ব' নামেও পরিচিত। এই শক্তি দু'প্রকার – সহজশক্তি ও আধেয়শক্তি। প্রভাকরমতে আগুনের মধ্যে দাহিকাশক্তি রয়েছে বলেই আগুন দহন করতে পারে, যাগাদির মধ্যে একপ্রকার শক্তি রয়েছে, তাই মানুষ যাগাদি কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বর্গলাভ করে। প্রভাকরমতে এই শক্তি প্রত্যক্ষগোচর নয়, তা অনুমানলব্ধ। কার্য দেখে আমরা শক্তিকে অনুমান করি। রামানুজাচার্য একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন – অগ্নি সবকিছুকে দহন করে। এখন অগ্নির পার্শ্বে যদি চন্দ্রকান্তমণি আনা হয় কিংবা মন্ত্র-ওষধি প্রয়োগ করা হয়, মূলকথা প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত করা হয় তা হলে দেখা যাবে অগ্নি আর দহন করছে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অগ্নির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা চন্দ্রকান্তমণি আনয়নের পূর্বে অগ্নির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল কিন্তু চন্দ্রকান্তমণি ইত্যাদির উপস্থিতিতে যা বিনষ্ট হয়ে যায় বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটাই হল অগ্নির দাহিকা-শক্তি। যদি অগ্নির মধ্যে শক্তি না থাকত তা হলে চন্দ্রকান্তমণির উপস্থিতিতেও অগ্নি দহন উৎপন্ন করতে পারত। যেহেতু চন্দ্রকান্তমণি আনয়নের পূর্বে যে অগ্নি বিদ্যমান ছিল, আনয়নের পরেও সে'ই অগ্নিই উপস্থিত রয়েছে। কাজেই এটা স্বীকার্য যে, অগ্নির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা প্রতিবন্ধকের উপস্থিতিতে অভিভব হয় বা বিনষ্ট হয়। আর প্রতিবন্ধক না থাকলে যা কার্য উৎপত্তির সহায়ক হয়, তা হল শক্তি। যাকে সামর্থ্যও বলা হয়েছে। *তন্ত্ররহস্যে* বলা হয়েছে – 'সর্বভাবেষ্বতীন্দ্রিয়া শক্তিঃ কার্যেনানুমীয়তে। তথা হি যথাভূতাদেব বহ্নের্দাহো দৃষ্টঃ মণিমন্ত্রৌষধিপ্রয়োগে সতি তথাভূতাদেব বহ্নের্দাহো ন দৃশ্যতে। অতো মণিমন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধনীয়ং তদ্বিনাশ্যং বা কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়ং

শক্তিসামর্থ্যাদিপদবাচ্যমভিধেয়ম্’[৩২]। প্রভাকরমতে, এই শক্তি দ্রব্যাদির অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কারণ তাকে দ্রব্য বলা যায় না। দ্রব্যের লক্ষণ হল, যা গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়। অর্থাৎ দ্রব্য হল আশ্রয় এবং গুণ ও কর্মাদি হল আশ্রিত। গুণ ও কর্ম তার আশ্রয় দ্রব্যে বৃত্তি হয় কিন্তু দ্রব্য কখনও গুণ-কর্মাদিতে বৃত্তি হয় না। কিন্তু শক্তি গুণাদিতেও বৃত্তি হয়। তাই শক্তিকে দ্রব্য বলা যায় না। তা গুণ ও কর্মাদি হতেও ভিন্ন। শক্তি যদি গুণ কিংবা কর্ম হত তা হলে তার আশ্রয় কেবল দ্রব্যই হত। যেহেতু গুণ ও কর্ম কেবল দ্রব্যেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। কিন্তু প্রভাকরমতে শক্তি পৃথিবীর যাবৎ পদার্থে বিদ্যমান। কাজেই শক্তি গুণ-কর্মাদিতেও বিদ্যমান। কিন্তু গুণ কিংবা কর্ম কখনই গুণে বা কর্মে থাকে না। কাজেই শক্তিকে গুণ কিংবা কর্ম পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শক্তিকে সামান্য-পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ শক্তিকে সামান্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করলে সামান্যে সামান্য স্বীকার করতে হবে। ফলত অনবস্থার আপত্তি হবে। অভিপ্রায় এই যে, সামান্যে সামান্য স্বীকৃত নয়, কারণ সামান্যের সামান্য স্বীকার করলে, সামান্য এবং সামান্যের সামান্য – এদের একটা সামান্য স্বীকার করতে হবে, অতঃপর সামান্য, সামান্যের সামান্য এবং সামান্যের যে সামান্য তার সামান্যের মধ্যে আরও একটি সামান্য মানতে হবে। এভাবে অনন্ত পথের যাত্রী হতে হবে। ফলত অনবস্থা অনিবার্য। তাই আচার্যগণ সামান্যের কোনওরূপ সামান্য স্বীকার করেন না। এখন মীমাংসকসম্মত শক্তি পৃথিবীর যাবৎ পদার্থে বিদ্যমান থাকায় তা সামান্যেও বিদ্যমান। কাজেই যে শক্তি সামান্যতে বিদ্যমান, তা যদি সামান্য-পদার্থ হয় হয়, তা হলে সামান্যে সামান্য স্বীকৃত হল। ফলত অনবস্থার আপত্তি হবে। তাই প্রভাকরমতে শক্তিকে সামান্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শক্তিকে সমবায়েরও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ প্রভাকরমতে দু’টি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যকার সম্বন্ধ সমবায় নামে স্বীকৃত। কিন্তু শক্তি যুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান। শক্তি বৈশেষিকসম্মত বিশেষ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত – তাও বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকসম্মত বিশেষ নিত্য পদার্থ। কিন্তু শক্তি অনিত্য, তা উৎপাদ-বিনাশশীল। শক্তিকে অভাব-পদার্থের অন্তর্ভুক্তও করা যাবে না

[৩২] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩।

যেহেতু শক্তির ভাবরূপে প্রতীতি হয়ে থাকে। তাই প্রভাকরমতে, শক্তি দ্রব্যাদি হতে অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। নিত্য পদার্থে এই শক্তি নিত্য এবং অনিত্য পদার্থে এই শক্তি অনিত্য। কিন্তু ভাট্টমতে, প্রভাকর-সম্মত শক্তি স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নয়, তা গুণ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। মানমেয়োদয়ঃ গ্রন্থে গুণের বিভাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 'স চ রূপরসগন্ধস্পর্শঃসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগঃপরত্বাপরত্বগুরুত্বদ্রবত্বস্নেহবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্র-যত্নসংস্কারধ্বনিপ্রাকট্যশক্তিভেদাচ্চতুর্বিংশতিবিধঃ'[৩৩]। ভাট্টগণ প্রভাকর-সম্মত এই শক্তিরূপ পদার্থের পৃথক পদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল মীমাংসামতে 'গুণাশ্রয়ত্ব' দ্রব্যের লক্ষণ নয়। তাঁদের মতে যা পরিণাম নামক গুণের আশ্রয় তাকে দ্রব্য বলে। যেহেতু পরিণাম সমস্ত দ্রব্যে থাকে, দ্রব্যভিন্ন অন্য কোনও পদার্থে থাকে না। ফলত শক্তিকে গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যেহেতু গুণের আশ্রয় দ্রব্যই হয়। কিন্তু শক্তির আশ্রয় জগৎ -এর যাবতীয় পদার্থ হওয়ায় তাকে গুণ বলা যায় না – প্রাভাকরগণের এমন আপত্তি নিরর্থক। তা ছাড়া শক্তিকে গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করায় ভাট্টমতের লাঘবই হয়। কারণ তাঁদের মতে শক্তি কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তা একপ্রকার গুণবিশেষ। যা চন্দ্রকান্তমণি ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের উপস্থিতিতে অভিভব হয় বা বিনষ্ট হয় এবং প্রতিবন্ধক না থাকলে যা দহনরূপ কার্য উৎপত্তিতে সহায়তা করে। কাজেই তার জন্য শক্তিকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

বৈশেষিক-দর্শনে সংখ্যাকে চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। '*প্রকরণপঞ্চিকা*'তেও শালিকনাথ মিশ্র সংখ্যাকে গুণ বলেছেন। কিন্তু প্রভাকরমতে সংখ্যা গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা দ্রব্য-গুণাদির ন্যায় অতিরিক্ত একটি পদার্থ। রামানুজাচার্য তাঁর '*তন্ত্ররহস্য*' গ্রন্থে সংখ্যার পৃথক পদার্থত্ব সিদ্ধ করতে বলেছেন – 'তথা সংখ্যাঽপি পৃথক্তত্ত্বান্তরম্। তথাহি - ন দ্রব্যং গুণাদিষু বৃত্তেঃ গন্ধোদ্বিবিধস্পর্শস্ত্রিবিধ ইতি। ন গুণঃ বহুষুবৃত্তেঃ, ঘটত্বাদিবৎ। ন কর্ম, প্রত্যক্ষত্বাৎ, তৎপ্রতীতিবৈলক্ষণ্যাচ্চ। ন সামান্যং অনিত্যত্বাৎ'[৩৪]।

[৩৩] Sastri, T. Ganapati(ed.) *Manameyodaya* of Narayana Bhatta and Narayana Pandita, Trivandrum, The Maharajan of Travancore, 1992, page – 99-100.
[৩৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩।

সংখ্যাকে দ্রব্য বলা যায় না, যেহেতু তা গুণাদিতেও বৃত্তি হয়। অভিপ্রায় এই যে, যা গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় তাকে দ্রব্য বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দ্রব্য হল তাই যাতে গুণ ও ক্রিয়া সমবেত থাকে। কাজেই গুণ ও ক্রিয়া দ্রব্যে আশ্রিত, কিন্তু বিপরীতভাবে বলা যায় না, দ্রব্য গুণ কিংবা ক্রিয়াতে আশ্রিত। কারণ দ্রব্য হল আশ্রয়। কিন্তু সংখ্যা গুণ কিংবা ক্রিয়াতে আশ্রিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'গন্ধ দ্বিবিধ', 'স্পর্শ ত্রিবিধ' – এমন প্রতীতি আমাদের প্রায়শই হয়ে থাকে। এস্থলে দ্বিবিধ, ত্রিবিধ ইত্যাদি প্রতীতির হেতু যে সংখ্যা তা গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গুণে বৃত্তি হয়েছে। কাজেই গুণ-কর্মাদিতে বৃত্তি হেতু সংখ্যাকে দ্রব্য বলা যায় না। সংখ্যাকে ন্যায়-বৈশেষিকগণের ন্যায় গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্তও করা যায় না। *তন্ত্ররহস্যে* বলা হয়েছে – সংখ্যাকে গুণ বলা যাবে না, কারণ গুণ সীমিত পদার্থে বৃত্তি হয় কিন্তু সংখ্যা ঘটত্বাদির ন্যায় বহু-পদার্থে বৃত্তি হয়। অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে যা দ্রব্যে আশ্রিত, গুণশূন্য এবং সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ, তাকে গুণ বলা হয়। কাজেই গুণ-পদার্থের আশ্রয় হল কেবল দ্রব্য। কিন্তু সংখ্যা কেবল দ্রব্যে আশ্রিত নয়, তা গুণ-কর্মাদিতেও সমবেত থাকে। ঘটত্বের আশ্রয় যেমন একটি ঘট নয়, পৃথিবীর যাবৎ ঘট, তদনুরূপ সংখ্যার আশ্রয় কেবল দ্রব্য নয়, গুণ-কর্মাদিতেও সংখ্যা বৃত্তি হয়। কাজেই সংখ্যাকে গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সংখ্যাকে কর্ম পদার্থের অন্তর্ভুক্তও করা যায় না, কারণ প্রভাকরমতে কর্ম অনুমানের বিষয়, তা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কিন্তু সংখ্যা প্রত্যক্ষলব্ধ। 'একটি বালক', 'দু'টি বালক' এভাবে সংখ্যার প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। কাজেই বিলক্ষণ প্রতীতিহেতু সংখ্যাকে কর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। প্রভাকরমতে, সংখ্যা বহু-পদার্থে বৃত্তি হয়। কিন্তু 'অনেকসমবেতত্বহেতু' তা সামান্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত – এমনটাও বলা যায় না। কারণ সংখ্যা অনেক পদার্থে সমবেত হলেও তা সবসময় নিত্য হয় না। নিত্য দ্রব্যে স্থিত একত্ব সংখ্যা নিত্য, যেমন – আত্মা, আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে স্থিত একত্ব নিত্য। কিন্তু ঘট-পটাদি অনিত্য দ্রব্যে স্থিত একত্ব সংখ্যা অনিত্য হয়। আবার দ্বিত্বাদি হতে পরার্ধ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যামাত্রই অনিত্য হয়। কারণ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যা দু'টি কিংবা তিনটি দ্রব্যকে লক্ষ্য করে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ

এটি এক, এটি এক এভাবে দ্বিত্বাদির বোধ জন্মায়। কাজেই দ্বিত্বাদি সংখ্যার জ্ঞানে একত্বের জ্ঞান অপেক্ষিত। সুতরাং দ্বিত্বাদি সংখ্যার বোধ একত্ব বোধ জন্য। আর যা জন্য তা অবশ্যই অনিত্য। কিন্তু সামান্য-পদার্থ ন্যায়-বৈশেষিকমতে অনেক সমবেত হলেও তা নিত্য। কাজেই সংখ্যাকে সামান্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই প্রভাকরমতে সংখ্যা অতিরিক্ত একটি পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত। যদিও ভাট্টগণ এ বিষয়ে প্রভাকরমতের বিরোধিতা করে সংখ্যাকে গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তাঁদের মতে – 'সংখ্যা পুনরেকত্বাদিব্যবহারহেতুঃ। সর্বদ্রব্যবর্তিত্বাৎ সামান্যগুণঃ'[৩৫]। সংখ্যা হল একত্বাদি ব্যবহারের হেতু এবং সর্বদ্রব্যে বৃত্তি একপ্রকার সামান্যগুণ।

'সাদৃশ্য' বিষয়েও প্রাভাকর ও ভাট্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রভাকরমতে সাদৃশ্য দ্রব্যাদির ন্যায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত। যেহেতু তা দ্রব্য, গুণ, কর্ম কিংবা সামান্যাদির অন্তর্ভুক্ত নয়। সাদৃশ্যকে দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না। যেহেতু সাদৃশ্য গুণ ও কর্মে বৃত্তি হয়। কিন্তু দ্রব্য গুণ ও কর্মের আশ্রয় হওয়ায় তা গুণ-কর্মাদিতে বৃত্তি হয় না – 'তথা সাদৃশ্যমপি ন দ্রব্যং, গুণকর্মণোরপি বৃত্তেঃ'[৩৬]। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'গন্ধদু'টি পরস্পর সদৃশ' – এস্থলে সাদৃশ্য গন্ধরূপ গুণে বৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু দ্রব্য গুণাদিতে বৃত্তি হয় না। কাজেই সাদৃশ্যকে দ্রব্য বলা যায় না। আবার 'এর রূপ তার সদৃশ' কিংবা 'পুত্রের কাজ পিতার কাজের মত' ইত্যাদি স্থলে সাদৃশ্যকে গুণ ও কর্মে বৃত্তি হতে দেখা যায়। তাই সাদৃশ্যকে গুণ কিংবা কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। কিন্তু গুণ কিংবা কর্ম গুণে বা কর্মে থাকে না। একের অধিক পদার্থে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায়, তা সামান্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত - এমনও বলা যায় না। সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। অভিপ্রায় এই যে, সামান্যে সামান্য স্বীকার করা হয় না। কারণ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্যে যদি একটি সামান্য স্বীকার করা হয়, তা হলে ঐ সামান্য ও

[৩৫] Sastri, T. Ganapati(ed.) *Manameyodaya* of Narayana Bhatta and Narayana Pandita, Trivandrum, The Maharajan of Travancore, 1992, page – 99-100.

[৩৬] Shamashastry, R. *Tantrarahasya* by Ramanujacharya, Baroda, Central Library, 1923, page – 24.

ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি সামান্যে অনুগত আরেকটি সামান্য স্বীকার করতে হবে। আবার ঐ তিনটি সামান্যে আরও একটি সামান্য স্বীকার করতে হবে। এভাবে চলতেই থাকবে, কোনও সিদ্ধান্তে পৌছনো যাবে না। ফলত অনবস্থা অনিবার্য। 'গোত্ব যেরূপ নিত্য অশ্বত্বও সেরূপ নিত্য' – প্রদত্ত স্থলে সাদৃশ্যটি গোত্ব ও অশ্বত্ব এই দু'টি সামান্যে বৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। এখন সাদৃশ্যকে যদি সামান্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলে সামান্যে সামান্য স্বীকার করতে হবে। ফলত অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সাদৃশ্যকে সামান্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সাদৃশ্যকে বিশেষ পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ বিশেষ হল ব্যাবর্তক ধর্ম। কিন্তু সাদৃশ্য ব্যাবর্তক ধর্ম নয়, তা অনুগত ধর্ম। সাদৃশ্যকে সমবায়েরও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, কারণ উপর্যুক্ত উদাহরণে সাদৃশ্য সামান্য-পদার্থে বৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু সমবায় সামান্যে বৃত্তি হয় না। যেহেতু সমবায় কোথাও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। এখন সাদৃশ্যকে অভাব-পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ অভাবের জ্ঞান নিষেধাত্মক। কিন্তু সাদৃশ্যের জ্ঞান নিষেধাত্মক নয়। আমরা যখন বলি 'এই টেবিলটি আমার বাড়িতে থাকা টেবিলটির সদৃশ', তখন আমাদের এরূপ বোধ হয় যে – আমার বাড়িতে থাকা টেবিলটির সাদৃশ্য এই টেবিলটিতে আছে। এস্থলে 'নেই' এরূপ প্রতীতি আমাদের হয় না। তা ছাড়া প্রাভাকর-সম্প্রদায় অভাবকে স্বতন্ত্র-পদার্থরূপে স্বীকারই করেন না। কাজেই সাদৃশ্যকে অভাবের অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গ অবান্তর। সুতরাং প্রভাকরমতে সাদৃশ্যকে দ্রব্যাদি অতিরিক্ত স্বতন্ত্র-পদার্থরূপে স্বীকার করতেই হবে। যদিও কুমারিলভট্ট প্রমুখ আচার্যগণ প্রভাকর-সম্মত সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলে স্বীকারই করেন না। নৈয়ায়িকগণও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকমতে 'সাদৃশ্যমপি ন পদার্থান্তরম্, কিন্তু তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গত-ভুয়োধর্ম্মবত্ত্বম্। যথা চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্ত্বং মুখে চন্দ্রসাদৃশ্যমিতি'[৩৭]। অভিপ্রায় এই যে, 'চন্দ্রসদৃশ মুখ' – এস্থলে চন্দ্র ও মুখ দু'টি পৃথক বস্তু। চন্দ্রের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম রয়েছে, যা মুখমণ্ডলের থাকে না। আবার মুখমণ্ডলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

[৩৭] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনূদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ২৬-২৭।

রয়েছে, যা চন্দ্রের থাকে না। এতসত্ত্বেও চন্দ্রের বিশেষ ধর্মরহিত যে মুখ, সেখানে চন্দ্রের কিছু সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান, যেমন - আহ্লাদকত্ব, স্নিগ্ধতা, রমণীয়তা, গোলাকৃতি, উজ্জ্বলত্ব প্রভৃতি। এই সাধারণ ধর্মগুলিই হল মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য। যদিও চন্দ্রের আহ্লাদকত্বাদি যে ধর্ম আর মুখমণ্ডলের যে আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম তা পৃথক পৃথক। কিন্তু উভয়ই আমাদের মনে একজাতীয় সুখ উৎপন্ন করে। তাই উভয়কে একজাতীয় মনে করা হয়। এই একজাতীয় যে সাধারণ ধর্ম তাকেই ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে সাদৃশ্য বলা হয়েছে। এই সাদৃশ্য কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নয়। সাদৃশ্য যাতে থাকে, সেই অনুযোগীর বিশেষণীভূত জাতি বা উপাধি স্বরূপ। 'ঘটসদৃশ কলস' এস্থলে ঘটের সাদৃশ্য কলসে রয়েছে। কাজেই কলস হল অনুযোগী। আর এই অনুযোগী কলসের বিশেষণ হয়েছে দ্রব্যত্ব জাতিটি। অনুরূপভাবে 'গোত্বের মত অশ্বত্বও নিত্য' এস্থলে সাদৃশ্য ধর্মটি উপাধিস্বরূপ। ভাট্টগণ ন্যায়-বৈশেষিকমত অনুসরণ করে সাদৃশ্যের পৃথক পদার্থত্ব খণ্ডন করেন। তাঁদের মতে গো-তে যে গবয়গত-সাদৃশ্যের প্রতীতি হয় তা অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নয়। গবয়গত গুণ, অবয়ব প্রভৃতি যা গো-তে থাকে, তা হতেই গো-তে গবয়ের সাদৃশ্যের প্রতীতি জন্মায়। ফলত সাদৃশ্য নামক পৃথক পদার্থ স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া যদি সাদৃশ্যকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করা হয় তা হলে 'গবয়েন গৌর্বহুসদৃশ' কিংবা 'বরাহেন পুনরল্পসদৃশ' ইত্যাদি প্রতীতির ব্যাখ্যা করা যাবে না। কেননা প্রভাকরমতে সাদৃশ্য পদার্থে অল্পত্ব, বহুত্ব সম্ভবই নয়। কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাবহারিক জীবনে একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর অল্প সাদৃশ্য কিংবা বহু সাদৃশ্যের প্রতীতি আমাদের প্রায়শই হতে থাকে। এখন যদি বলা হয়, সাদৃশ্যের পরিমাণের তারতম্যহেতু অধিক-অল্প সাদৃশ্যের প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে – এমনও বলা সম্ভব নয়। কারণ প্রাভাকরগণ সাদৃশ্যগত পরিমাণভেদ স্বীকার করেন না। কেননা প্রভাকরমতে দ্রব্য ভিন্নে পরিমাণ থাকে না। সাদৃশ্যে পরিণামভেদ সিদ্ধ না হলেও পরিমাণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে স্থিত পরিমাণ ভেদকের সাহায্যেই উক্ত প্রতীতির নির্বাহ হবে – এমন বলাও সঙ্গত নয়। তদপেক্ষায় সাদৃশ্যকে দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলাই শ্রেয়ঃ। তাঁদের মতে সাদৃশ্যকে দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করলে 'গবয়ের সঙ্গে গোরুর অধিক সাদৃশ্য' কিংবা 'শুকরের সঙ্গে

গোরুর অল্প সাদৃশ্য' – প্রদত্ত স্থলগুলির ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কারণ, যেখানে গুণ, অবয়ব, জাতি অল্প সংখ্যক হবে, সেখানে অল্প সাদৃশ্য এবং যেখানে তারা বহুসংখ্যক হয়, সেখানে সাদৃশ্যের বহুত্ব পরিলক্ষিত হয়। গবয়গত গুণ, অবয়বের অধিক সংখ্যক সাদৃশ্য গো-তে থাকায় গবয়ের সঙ্গে গোরুর অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার গবয়গত গুণ, অবয়বের অল্প সংখ্যক সাদৃশ্য শূকরে থাকায়, গবয়ের সঙ্গে শূকরের অল্প সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৈশেষিকস্বীকৃত অভাব নামক পদার্থ-বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। ভাট্টগণ ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণের মত অনুসরণ করে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থের মান্যতা দেন। তাঁদের মতে কোনও স্থলে, যেমন – ভূতলাদিতে ঘটের উপলব্ধির যাবতীয় কারণ তথা চক্ষুরাদি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ ঘটের উপলব্ধির যাবতীয় যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার পরও যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, তখন ভূতলে ঘটের অনুপলব্ধি হয়। ফলত ভূতলে ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়। ভাট্টমতে এই অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপে অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করতেই হয়। তবে অভাব-পদার্থ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকমতের সঙ্গে ভাট্টমতের বিশেষ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে ভাব-পদার্থের গ্রাহক পদার্থের দ্বারাই অভাব-পদার্থের গ্রহণ স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিকমতে অভাবের জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু ভাট্টমতে অভাবের গ্রহণ ভাব-পদার্থ গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা হতে পারে না। তাই ভাট্টগণ অভাবগ্রাহক প্রমাণরূপে অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মান্যতা দেন। কিন্তু গুরু প্রভাকর অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকারই করেন না। তাঁর মতে অভাব কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, অভাব তার অধিকরণস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, অভাব যে অধিকরণে থাকে, সেই অধিকরণ থেকে ভিন্নভাবে আমাদের অভাবের জ্ঞান হয় না। যেমন, 'ভূতলে ঘটাভাব' এস্থলে ব্যক্তি ভূতলাতিরিক্ত কিছু দেখে না। ভূতলের সঙ্গেই ব্যক্তির চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। ফলস্বরূপ অনুযোগী ভূতল হতে পৃথকরূপে অভাবের জ্ঞান ব্যক্তির হয় না। এজন্য প্রভাকরমতে অভাব তার অধিকরণ ভিন্ন কিছু নয়। তা ছাড়া নিয়ম আছে, বস্তুর সত্তা লক্ষণ ও প্রমাণ

দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু এমন কোনও লক্ষণ বা প্রমাণ নেই, যার দ্বারা অভাবের সিদ্ধি হতে পারে। *ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে* অভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'ভাবভিন্নত্বম্' অর্থাৎ ভাব ভিন্ন পদার্থই হল অভাব। কিন্তু প্রভাকরমতে ভাবভিন্নকে অভাব বলা যায় না। কেননা ভিন্ন মানেই তো ভেদ। আর ভেদ বলতে অন্যোন্যাভাবকেই বোঝানো হয়। যেমন, ঘট পট হতে ভিন্ন, মানে ঘটে পটের ভেদ রয়েছে। কাজেই এভাবে অভাবের দ্বারা অভাবের লক্ষণ প্রদান সম্ভবই নয়। কারণ সেক্ষেত্রে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। অন্যদিকে যা অভাব নয় তা ভাব-পদার্থ – এমন স্বীকার করলে ভাব ও অভাব পরস্পর সাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এখন যদি বলা হয়, ভাবের অনধিকরণ হল অভাব – এভাবে যদি অভাবের লক্ষণ প্রদান করা হয়, তা হলে লক্ষণটি আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হবে। কারণ ভাবের অনধিকরণ মানেই অধিকরণের অভাব। আবার যা ভাবের বিরোধী তা হল অভাব – এভাবেও অভাবের লক্ষণ প্রদানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ ভাবের বিরোধকে অভাব বললে প্রশ্ন হবে – যৎকিঞ্চিৎ ভাবের বিরোধ নাকি যাবৎ ভাবের বিরোধকে অভাব বলা হবে? যদি যৎকিঞ্চিৎ ভাবের বিরোধকে অভাব বলা হয়, তা হলে গোত্ব ও অশ্বত্বের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবের বিরোধ থাকায়, এস্থলে অভাবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। আবার যদি যাবৎ ভাব-পদার্থের বিরোধকে অভাব বলা হয় তা হলে যে স্থলে কেবল ঘটাভাব রয়েছে, সে স্থলে সমস্ত ভাব-পদার্থের বিরোধ(অভাব) রয়েছে স্বীকার করতে হবে। যেহেতু যাবৎ ভাব-পদার্থের বিরোধকে অভাব বলা হয়েছে। কিন্তু ভূতলে ঘটাভাব থাকলে সেখানে সমস্ত ভাব-পদার্থের অভাব রয়েছে – এমন স্বীকার করা হয় না। ভূতলে ঘট না থাকলেও পটাদি ভাব-পদার্থ থাকতেই পারে। কাজেই ভাবের বিরোধকে অভাব বলা যায় না। আবার যা স্বরূপ-সম্বন্ধে ভাব-বস্তুতে প্রত্যাসন্ন তা অভাব – এভাবেও অভাবের লক্ষণ প্রদান সম্ভব নয়। কারণ ন্যায়-বৈশেষিকমতে সমবায় পদার্থটিও স্বরূপ-সম্বন্ধে ভাব-পদার্থে থাকে। ফলত সমবায়ে অভাবের উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। অনেকে বলতে পারেন, 'নেই এই প্রতীতির বিষয়কে অভাব বলা হয়'। কিন্তু এমন বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ 'ভূতলে ঘট নেই' এই প্রতীতির বিষয়তা বিশেষ্যরূপে ভূতলে থাকে এবং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটে থাকে।

ফলত ভূতল এবং ঘটে 'নেই' এই প্রতীতির বিষয়তা থাকায় প্রদত্ত স্থলেও অভাব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, যা প্রতিযোগী সাপেক্ষ, তা হল অভাব – এমন বলাও সঙ্গত হবে না। কারণ শরীররূপ অবয়বী প্রতিযোগী অবয়ব-সাপেক্ষ। যেহেতু ন্যায়মতে অবয়বী অবয়বে থাকে। কাজেই অবয়বী হল অনুযোগী আর অবয়ব হল প্রতিযোগী। কাজেই শরীরও হস্তপদাদি প্রতিযোগী সাপেক্ষ হওয়ায়, উক্ত অভাবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কাজেই প্রতিযোগী সাপেক্ষত্ব অভাবের লক্ষণ হতে পারে না। এখন যদি এমনও বলা হয় – যা 'আছে' এই প্রতীতির বিষয় হয় না, তাকে অভাব বলে। তা হলেও অভাবের লক্ষণটিকে নির্দোষ বলা যায় না। কেননা 'ঘটাভাব আছে' এরূপ প্রতীতি আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। কাজেই অভাব 'আছে' এই প্রতীতির বিষয় হওয়ায় পূর্বোক্ত অভাবের লক্ষণটি অসম্ভব দোষে দুষ্ট হয়। এভাবে প্রাভাকর-সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে অভাবের লক্ষণ উপস্থাপন পূর্বক খণ্ডন করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, অভাবের লক্ষণ প্রদানই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক সত্তাশীল বস্তুরই এক একটি অসাধারণ ধর্ম থাকে, অর্থাৎ সত্তাশীল হলেই তার লক্ষণ প্রদান সম্ভব। কিন্তু অভাবের কোনওরূপ লক্ষণ সম্ভব না হওয়ায়, অভাবের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। আর যার অস্তিত্বই সিদ্ধ নয়, সেই বিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত গ্রাহক প্রমাণও স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। তাই প্রাভাকরগণ অভাব গ্রাহক প্রমাণরূপে অনুপলব্ধিকেও অতিরিক্ত প্রমাণের মান্যতা দেন না।

প্রভাকর ও ভাট্ট-সম্প্রদায় ছাড়াও *মীমাংসা-দর্শনে* তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বিশেষ পরিচিত, যাঁর প্রবর্ত্তক হিসাবে আমরা মুরারি মিশ্রকে পাই। তিনি *মীমাংসা-দর্শনের* প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেছেন। পদার্থ-বিষয়ে তিনি প্রচলিত কুমারিলমত কিংবা ভাট্টমতের অনুবর্তী না হয়ে অদ্বৈতবাদী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি শঙ্করাচার্যের ন্যায় ব্রহ্মকেই একমাত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। যদিও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তিনি ধর্মী, ধর্ম, আধার ও প্রদেশবিশেষ – এই চারটিকেও পদার্থ বলেছেন। তবে তাঁর মতে, ব্রহ্মই একমাত্র পরম তত্ত্ব। কাজেই পদার্থ-বিষয়ে মীমাংসা-সম্প্রদায়গুলির মতের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়।

পদার্থ-বিষয়ে বিভিন্ন বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ের অভিমতঃ

'বেদান্ত' শব্দটির অর্থ হল যা বেদের অন্ত বা উত্তরভাগ। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ – এই চারভাগে বিভক্ত বেদের শেষভাগ উপনিষদ হওয়ায় উপনিষদসমূহকেই বেদান্ত বলা হয়। যদিও উপনিষদসমূহ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র – এই ত্রিবিধ শাস্ত্রেই বেদান্তের মূল শিকড় প্রথিত থাকায় – এই ত্রিবিধ শাস্ত্রকেই একত্রে বেদান্ত-দর্শনের 'প্রস্থানত্রয়' নামে অভিহিত করা হয়। এগুলির মধ্যে উপনিষদসমূহ হল শ্রুতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল স্মৃতিপ্রস্থান এবং ব্রহ্মসূত্র হল ন্যায়প্রস্থান। এই তিনটি শাস্ত্রই বেদান্ত-দর্শনের মূল ভিত্তি। তবে পরবর্তিকালে বহু পুণ্যাত্মা ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যাঁরা নিজ নিজ আঙ্গিকে উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর নানা ভাষ্য রচনা করেছিলেন। মূল কথা হল, তাঁরা নিজ নিজ আঙ্গিকে বেদান্তদর্শনের মূল সত্য প্রচার করেছিলেন। ফলস্বরূপ বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে আচার্য শঙ্করের *'অদ্বৈতবাদ'*; রামানুজাচার্যের *'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'*; মধ্বাচার্যের *'দ্বৈতবাদ'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখন বেদান্ত-দর্শনে পদার্থ-বিষয়ক অভিমত বুঝতে গেলে বিভিন্ন বৈদান্তিক কর্তৃক প্রচারিত মতবাদের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অদ্বৈতমতঃ

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব হতে আচার্য গৌড়পাদ, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ মহান আত্মা যে দর্শন সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তা অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। তবে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত তত্ত্বই অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। তাই অদ্বৈতদর্শনের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনা প্রসঙ্গে মূলত আচার্য শঙ্কর প্রচারিত দর্শনের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনা করব। আচার্য শঙ্কর মূলত যা দুই-এর ভাব বর্জিত, এরূপ এক-অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে তত্ত্ব মূলত এক, তিনি হলেন ব্রহ্ম। কেবল ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁর দর্শনকে কেবলাদ্বৈত-দর্শন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকেই যদি একমাত্র তত্ত্ব রূপে স্বীকার করে থাকেন তা হলে ঘট, পটাদি অসংখ্য পদার্থ সমন্বিত আমাদের

এই যে জগৎ, এই জগতে অবস্থান করেও তিনি কি ঘট, পটাদি পদার্থসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবেন? এর উত্তরে বলা যায়, যদি সামগ্রিকভাবে আমরা শাঙ্করদর্শন পর্যালোচনা করি তা হলে বুঝতে পারবো, তিনি দু'ভাবে পদার্থের আলোচনা করেছেন – পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পদার্থ বা তত্ত্ব একটিই, তিনি হলেন ব্রহ্ম। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় দ্রব্যাদি তথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, অভাব প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার করেছেন। তবে বৈশেষিকসম্মত সমবায়কে তাঁরা পদার্থরূপে স্বীকারই করেন না। বৈশেষিকমতে দু'টি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ হল সমবায়। এখানেই অদ্বৈতবাদী আপত্তি করে বলেন – 'অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ' বলতে বৈশেষিকগণ কিরূপ সম্বন্ধের কথা বলতে চেয়েছেন? অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ সম্বন্ধিদ্বয়ের একটির দেশ কি অন্যটির দেশ? এমনটা বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকমতে তন্তুতে সমবায়-সম্বন্ধে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। কাজেই তন্তু হল কারণ আর উৎপন্ন বস্ত্র হল কার্য। এই কারণ(তন্তু) ও কার্য(বস্ত্র) পরস্পর ভিন্ন। যেহেতু তন্তু দ্বারা যে কার্য সম্পাদন করা যায়, বস্ত্র দ্বারা সে কার্য সম্পাদিত হয় না। অনুরূপভাবে বস্ত্র দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হয়, তন্তু দ্বারা সে কার্য সম্পাদন করা যায় না। কাজেই তন্তু ও বস্ত্র যে পরস্পর ভিন্ন তা স্বীকার করতেই হয়। আর এতদুভয় পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় তাদের দেশ যে এক – এমন বলা যায় না। অথচ বৈশেষিকগণ তন্তু ও বস্ত্রের সম্বন্ধ সমবায় বলেন, যা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। তা হলে কি অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ সম্বন্ধিদ্বয় একই কাল বিন্দুতে অবস্থান করে? এমনটাও বলা যায় না। যেহেতু কার্য দ্রব্যকে উৎপন্ন করার জন্য কারণ দ্রব্যকে কার্যদ্রব্যের অন্ততঃ এক ক্ষণ পূর্বে বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন, উপর্যুক্ত উদাহরণে তন্তুতে বস্ত্র সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হলে, তন্তুকে বস্ত্রের পূর্বে অবস্থান করতে হবে। তন্তু না থাকলে তা হতে বস্ত্র উৎপন্ন হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, একটি গোরুর দু'টি শিং একই কালবিন্দুতে অবস্থান করলেও তাদের সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধ বলা যায় না। কাজেই অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে তারা সমকাল বিন্দুতে অবস্থান করবে এমনও বলা যায় না। তা হলে যারা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ তাদের স্বভাব কি এক হবে? কিন্তু দু'টি

বস্তুর স্বভাব যদি এক হয় তা হলে তাদেরকে এক বলতে হয়। এমন হলে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ সম্বন্ধিদ্বয়কে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন বলে মানা যায় না। কারণ যা সমস্বভাব তা অভিন্ন হয়। কিন্তু বৈশেষিকগণ গুণ প্রভৃতিকে দ্রব্য হতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলেই মানেন। দ্রব্য ও গুণ সমস্বভাব এমনও বলা যায় না। এভাবে নানা বিকল্প উত্থাপন পূর্ব্বক অদ্বৈতীগণ সিদ্ধান্ত করেন – অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই সমবায় নামক সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। তাই অদ্বৈতাচার্যগণ বৈশেষিকস্বীকৃত সমবায়কে পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। তাঁরা বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ ও সামান্যকেও স্বতন্ত্র পদার্থান্তরের মর্যাদা দেন না। কারণ বৈশেষিকমতে নিত্য দ্রব্যের মধ্যে ভেদ নিরূপণের জন্য ব্যাবর্তক ধর্মরূপে বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকৃত। কিন্তু অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ; যা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ। তদতিরিক্ত কিছুই নেই, সবই অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারাই সৃষ্ট। কাজেই ব্রহ্ম-অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও পদার্থ বিদ্যমান না থাকায়, এস্থলে ভেদ-নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। তাই নিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে ভেদ নিরূপণের নিমিত্ত বিশেষ-স্বীকার নিষ্ফলচেষ্টামাত্র। অদ্বৈতবেদান্তী জাতি স্বীকার করেন না। যদিও ঘট প্রত্যক্ষকালে ‘ঘটত্ব’ – এর যে জ্ঞান হয় তা স্বীকার করেন। তবে এই ঘটত্ব জাতি নয়। যেহেতু তাঁদের মতে ঘটত্ব যে জাতি, তার সপক্ষে কোনওরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অদ্বৈতমতে যে গুণসমষ্টি একটি বস্তুকে অন্যান্য বস্তু হতে পৃথক করে অর্থাৎ ঘটরূপ পদার্থকে যে গুণসমষ্টি অন্যান্য বস্তু হতে পৃথক করে তা হল ঘটত্ব। তবে ঐ ঘটত্ব ন্যায়-বৈশেষিকস্বীকৃত জাতি হতে পারে না। যদি বলা হয় ‘ঘটত্বাদিকং জাতিঃ উপাধিভিন্নসামান্যধর্মত্বাৎ, সত্তাত্বাৎ’ – এরূপ অনুমানের দ্বারা জাতি সিদ্ধ হয়। তা সঙ্গত হবে না। যেহেতু উক্ত অনুমানের সাধ্য হল জাতি। যে জাতিকে প্রমাণ করতে হবে। আর যা এখন প্রমাণিত নয় তা অপ্রসিদ্ধ। জাতি বলে কিছু না থাকায় উক্ত অনুমানের সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। আর যা অপ্রসিদ্ধ তার সাধক প্রমাণ খোঁজা নিরর্থক। যদি কোনও বস্তু পৃথিবীতে থাকে তবেই তাকে আমরা অনুমান করার কথা ভাবব। কিন্তু যা নেই, যেমন – আকাশকুসুম কিংবা বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতির অনুমান করতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। তা ছাড়া বৈশেষিকাচার্যগণ সামান্যের লক্ষণ

প্রসঙ্গে বলেছেন – 'সামান্যং নিরূপয়তি – সামান্যমিতি। তল্লক্ষণন্তু নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বম্'[৩৮]। কাজেই বৈশেষিকমতে 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্ব' হল জাতি বা সামান্যের লক্ষণ। এখন ঘটত্বাদি নিত্য নয়, যেহেতু অদ্বৈতমতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই অনিত্য। আবার সমবায় সম্বন্ধ অসিদ্ধ হওয়ায় অনেক-সমবেত – এমনও বলা যায় না। কাজেই জাতি অপ্রসিদ্ধ। অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শনে শক্তিকে একটি পদার্থান্তরের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তবে তা ভাট্টসম্মত শক্তি নামক পদার্থ হতে ভিন্ন। ভাট্টমতে, শক্তি বলতে বস্তুর সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, আগুনের সামর্থ্য হল যে কোনও বস্তুকে দহন করা, তাই মীমাংসকগণ আগুনে দাহিকা-শক্তি স্বীকার করেন। তবে শাঙ্কর-দর্শনে যে অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ারূপিণী শক্তি স্বীকৃত হয়েছে, তা ভাট্ট-সম্মত শক্তি নয়, তা নিছক কল্পনামাত্র। তা সৎ নয়, অসৎও নয়, সৎ এবং অসৎ এমনও নয়, আবার সৎও নয়; অসৎও নয় – এমনও নয়। তা অনির্বচনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পর মায়াশক্তি এবং তদ্ নিমিত্ত যে জগৎ তার মিথ্যাত্ব প্রকটিত হয়। আচার্য শঙ্কর জগৎ-সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্তই মায়ারূপ শক্তিকে ব্যাবহারিক স্তরে স্বীকার করেছেন। তবে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও পদার্থের অস্তিত্ব শাঙ্কর-দর্শনে গৃহীত হয়নি। কাজেই ব্যাবহারিক দ্রব্যাদি পদার্থসমূহের ব্যাবহারিক সত্তা শাঙ্কর-দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-প্রাপ্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জীব অসংখ্য বস্তু সমন্বিত এই পদার্থের জগৎকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু যখন জীব 'ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নেই' – এরূপ উপলব্ধি করে তখন ব্যাবহারিক জগৎ -এর ব্যাবহারিক পদার্থসমূহের অসারত্ব প্রকটিত হয়। তখন জীব উপলব্ধি করে পদার্থ বা তত্ত্ব হল একটিই, তিনি হলেন ব্রহ্ম। তিনিই একমাত্র সৎ পদার্থ, এ জগৎ কল্পনাপ্রসূত, তাই তা মিথ্যা। অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়া তার আবরণ-শক্তির দ্বারা জীববুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে এবং বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা দ্রব্যাদি পদার্থসমূহকে সত্যরূপে প্রকাশিত করে। কিন্তু অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হলে জীব উপলব্ধি করে ব্রহ্মই

[৩৮] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ৫১।

একমাত্র পদার্থ। কাজেই পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মই হলেন একমাত্র পদার্থ বা তত্ত্ব। এই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ। তিনি চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য নন, তিনি বাক্য মনেরও অগোচর। তিনি কোনও কিছুর কারণ নয়, তিনি কোনও কিছুর কার্যও নয়। তিনি সকল প্রকার ভেদরহিত। এরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অদ্বিতীয়। তাই তাঁর সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নেই। আবার তাঁর কোনও অংশ না থাকায় অর্থাৎ নিরবয়বহেতু তাঁর স্বগতভেদও নেই। সর্ব প্রকার ভেদরহিত ব্রহ্মই অদ্বৈতমতে একমাত্র পদার্থ, তদ্ অতিরিক্ত কিছুই নেই।

এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্রহ্মই যদি একমাত্র পদার্থ হন, তা হলে অসংখ্য জীব সমন্বিত যে বিভিন্নতার জগৎ তার ব্যাখ্যা শাঙ্কর-দর্শনে কীরূপে পাওয়া যায়? শঙ্করাচার্যের মতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'[৩৯] অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। জগৎরূপে যা কিছু প্রতিভাত হয় তা মিথ্যা তথা মায়িক। আর জীব ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কিছু নয়। জীবই ব্রহ্ম। অভিপ্রায় এই যে, শাঙ্কর-দর্শনে ব্রহ্মকেই একমাত্র পারমার্থিক সৎ-রূপে স্বীকার করা হয়েছে। আর এ জগৎ ব্রহ্মের প্রতিভাসমাত্র। ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ব্রহ্মরূপ নির্গুণ অধিষ্ঠানে আমরা বহুগুণ সমন্বিত এই নানাত্ববিশিষ্ট জগৎ -এর আরোপ করি মাত্র। প্রকৃত অর্থে জগৎ সত্য নয়, তা মিথ্যা। তবে মিথ্যা বলতে শঙ্করাচার্য অলীক বস্তু বোঝাননি। যা সদ্-অসদ্ হতে বিলক্ষণ। তা অনির্বচনীয়, এই অর্থে মিথ্যা। এ জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়, কারণ-ব্রহ্ম ত্রিকালাবাধিত, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ বাধিত হয়। জীবের সমস্ত প্রকার অজ্ঞানাবরণ যখন দূরীভূত হয়, তখন তাঁরা মায়া অধ্যুষিত জগৎ যে অজ্ঞান জন্য এবং ব্যাবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্ট নিছক কল্পনামাত্র, তা প্রকৃত অর্থে সৎ নয় -- এরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তবে জগৎ আকাশকুসুমাদির ন্যায় অলীকও নয়, কারণ যা অলীক তা নিঃস্বভাব। যেমন – আকাশকুসুম কিংবা বন্ধ্যাপুত্র অলীক বস্তু। তাই এদের কখনও ভাবরূপে প্রতীতি হয় না। কিন্তু ব্যাবহারিক জীববুদ্ধির নিকট ব্যাবহারিক জগৎ -এর ভাব রূপে প্রতীতি হয়। অজ্ঞানাচ্ছন্নজীব ব্যবহারকালে এ জগৎকে সত্য বলেই মনে করে।

---

[৩৯] গোস্বামী, ডঃ শ্রীসীতানাথ (অনুদিত), শ্রী শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত *বেদান্তসার,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৯, পৃষ্ঠা – ৬০।

কাজেই জগৎকে যেমন ব্রহ্মের ন্যায় সৎ বলা যায় না, তদনুরূপ অসৎও বলা যায় না। তা সৎও নয়, অসৎও নয় এমনও বলা যায় না। আবার তা সৎ এবং অসৎ উভয়ই – এমনও বলা যায় না। কারণ তা স্বরূপতঃ বিরোধী। তাই শঙ্করাচার্য জগৎকে অনির্বচনীয় বলেছেন। অদ্বৈতমতে জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্ত। নিজরূপ পরিত্যাগ না করে যদি অন্য রূপে প্রতিভাসিত হয়, তা হলে তাকে বিবর্ত বলে। যেমন – রজ্জুতে সর্পের জ্ঞানের ক্ষেত্রে রজ্জুর কোনওরূপ স্বরূপের হানি ঘটে না। রজ্জু রজ্জুই থাকে, তাতে সর্পত্বের প্রতিভাস ঘটে। তদনুরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ, নির্বিশেষ ও অপরিণামী এবং তাতে জগৎ -এর প্রতিভাস ঘটে। মূল কথা হল, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে ব্যাবহারিক জগৎ অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়।

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক, নির্গুণ, নির্বিশেষ, অপরিণামী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত – এরূপ অধিষ্ঠানে পরিণামী-পরিবর্তনশীল-নানাত্বের জগৎ -এর আরোপ কীরূপে সম্ভব? রজ্জুতে সর্পের আরোপ স্থলে উভয়ই পরিবর্তনশীল, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। অভিপ্রায় এই যে, রজ্জু এবং সর্প উভয়ই লম্বা, গোলাকৃতি অর্থাৎ উভয়ের আকৃতি, গঠন প্রভৃতিতে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপ সঙ্গত। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার, নিত্য, অপরিণামী। অপরদিকে এই নানাত্বের জগৎ পরিণামী, সাকার ও পরিবর্তনশীল। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে এরূপ জগৎ -এর আরোপ কীরূপে সম্ভব? এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, নির্ধর্মক হলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ অধ্যস্ত হয়। তাঁদের মতে 'শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতিরূপকম্'[৪০]। বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ'। মূল কথা হল, এই মায়ার দু'প্রকার শক্তি রয়েছে – আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি। মায়া তার আবরণ-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে ঢেকে রাখে, যেমন একখণ্ড মেঘ সূর্যের আয়তনের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। কিন্তু তা যেমন সূর্যকে ঢেকে ফেলে; প্রকৃত পক্ষে মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলতে পারে না, তা আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে; তদনুরূপ মায়া তার আবরণশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে আবৃত করে। প্রকৃতপক্ষে মায়া কখনওই

[৪০] ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৮।

ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করতে পারে না, তা আমাদের জীববুদ্ধিকে আবৃত করে। আর বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা সেখানে নানাত্ববিশিষ্ট অসংখ্য পদার্থ সমন্বিত জগৎ-এর প্রকাশ ঘটায়। তবে এই মায়ারূপ শক্তি শুদ্ধ ব্রহ্মের শক্তি নয়। মিথ্যা জগৎ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মায়ারূপ শক্তি কল্পিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শুদ্ধ ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ অধ্যস্ত হলেও ব্রহ্ম ঐ জগৎ-এর কারণ হতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্ম অপরিণামী, তা কোনও কিছুর কারণ নয়; আবার কার্যও নয়। শাঙ্কর-দর্শনে ব্যাবহারিক জগৎ-এর ব্যাবহারিক ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বর নামক একটি ধারণা স্বীকৃত হয়েছে। স্বগুণ ব্রহ্মই হলেন এই ঈশ্বর। অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত জীববুদ্ধি ব্যাবহারিক জগৎকে সত্য বলে মনে করে এবং সেই ব্যাবহারিক জগৎ-এর কারণরূপে ঈশ্বর স্বীকার করে। স্বাভাবিকই নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিধর্মক, অপরিণামী, শুদ্ধ, সৎ ব্রহ্ম কখনওই সগুণ, পরিণামী ব্যাবহারিক জগৎ-এর কারণ হতে পারে না। এই জগৎ-এর যে কারণ তা হল সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। যেহেতু পরিণামী জগৎ-এর কারণ কখনও অপরিণামী কোনও সত্তা হতে পারে না। অবিদ্যা প্রসূত জীববুদ্ধি মিথ্যা জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে শুদ্ধ, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বিষয়ীরূপে সম্বদ্ধ করেই ঈশ্বর রূপ ধারণা গঠন করে। কাজেই সাধারণ দৃষ্টিতে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রমেয় তিন প্রকার – জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। তবে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ হতে ব্রহ্মই হল একমাত্র প্রমেয়। এই যে জীব তা ব্রহ্মই। একটি রক্তবর্ণের জবাপুষ্প স্বচ্ছ স্ফটিকের সম্মুখে রেখে দিলে স্ফটিকটিতে রক্তবর্ণ আরোপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্ফটিকটি রক্তবর্ণের নয়। তদনুরূপ জীব মায়াকলুষিত বুদ্ধির সংস্পর্শে অবিদ্যাবশতঃ নিজ ব্রহ্মস্বরূপতা বিস্মৃত হয় এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি ব্রহ্মে আরোপ করে ব্রহ্মকেই কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী প্রভৃতি মনে করে। কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ কোনওকিছুর কর্তা নন, ভোক্তা নন। তা নির্গুণ ও নির্বিশেষ। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্ম তো এক ও অদ্বয়, তার দ্বিতীয় কিছু হয় না; তা হলে জীবের বহুত্বের ব্যাখ্যা কীরূপে প্রদান করা সম্ভব? এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, একই চন্দ্র বিভিন্ন জলাশয়ে পতিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে প্রতিভাসিত হয়। কিন্তু তাই বলে চন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন নয়। তা একটিই। তার প্রতিভাস ভিন্ন ভিন্ন। তদনুরূপ একই ব্রহ্ম মায়াসৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে

প্রতিবিম্বিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক ও অদ্বয় তথা দ্বিতীয়রহিত। তাই অদ্বৈতমতে পারমার্থিক স্তরে ব্রহ্মই হল একমাত্র তত্ত্ব বা পদার্থ।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতঃ

শ্রীভাষ্যকার রামানুজ যে বেদান্ত-দর্শনের প্রধান প্রচারক ছিলেন, তা বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় আচার্য রামানুজ এক ও অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতেও পরমেশ্বর এক ও দ্বিতীয়রহিত। তবে শঙ্করাচার্য নির্গুণব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁর মতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরবয়ব। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অবিদ্যাবশতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে জগৎকর্তৃত্বাদি নানা গুণের আরোপ করে। তবে অজ্ঞানরূপী মেঘের চাদর অপসারিত হলে এক, অদ্বয় ও অপরিণামী ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয়। তবে রামানুজের মতে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) সগুণ, চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিশেষণ। *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে –

‘ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ’[৪১]।

রামানুজাচার্যের মতে তত্ত্ব বা পদার্থ তিন প্রকার – যথা, চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর হলেন বিশেষ্য এবং চিৎ ও অচিৎ হল তাঁর বিশেষণ। ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ - এর দ্বারা বিশিষ্ট। চিৎ তত্ত্ব হল আত্মা; যা দেহাদি হতে পৃথক, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, অচিন্ত্য ও নিরবয়ব। ‘অচিৎ’ শব্দের দ্বারা জড় প্রকৃতি এবং তা হতে মহদাদি ক্রমে সৃষ্ট ব্যক্ত জগৎকে বোঝানো হয়েছে। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের অংশ আর ব্রহ্ম হলেন অংশী। এই চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কিছু নয়, তা ব্রহ্মেরই অংশ, তবে তা ব্রহ্ম নয়। কারণ অংশ ও অংশী কখনও এক হতে পারে না। যেমন, অগ্নি থেকে যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তা যেমন অগ্নি থেকে ভিন্ন কিছু নয়, তা অগ্নিরই অংশবিশেষ; তবে তাকে পূর্ণ অগ্নি বলাও চলে না। তদনুরূপ ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ অংশ ব্রহ্ম হতে ভিন্ন হয়েও

[৪১] চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্বদর্শন-সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০১৯, পৃষ্ঠা – ১০৭।

অভিন্ন। ব্রহ্ম হলেন প্রকারী। আর চিৎ ও অচিৎ অংশ হল ব্রহ্মের প্রকার। তাই তারা মিথ্যা নয়। কেবলাদ্বৈত বেদান্ত-দর্শনে মায়া-উপহিত ব্রহ্মে কল্পিত গুণসমূহকে মিথ্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, তাঁদের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ। মায়া-শক্তির দ্বারা ব্রহ্মে নানা গুণ অধ্যস্ত হয়। তবে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হলে ব্রহ্মে কল্পিত গুণাবলি যে প্রকৃত ব্রহ্মের নয়; আরোপিত, তা পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু রামানুজাচার্যের মতে ঈশ্বর হলেন আশ্রয় এবং চিৎ ও অচিৎ - এই বিশেষণ দু'টি ব্রহ্মে আশ্রিত হওয়ায় তারা মিথ্যা হতে পারে না। তবে ব্রহ্ম যেরূপ সৎ, তা তদনুরূপ সৎ নয়। ব্রহ্ম হলেন অনন্যনিরপেক্ষ রূপে সৎ। কিন্তু চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ দু'টি ব্রহ্মে আশ্রিত রূপে সৎ। তবে রামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম হলেন এক এবং দ্বিতীয়রহিত, তাঁর কোনও দ্বিতীয় নেই। তবে তিনি নিরবয়ব নন। তিনি অবয়বী, আর চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ দু'টি তাঁর অবয়ব। তাই রামানুজীয় দর্শনে ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার না করা হলেও তাঁর স্বগত ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। এখানেও শঙ্করাচার্যের অভিমত হতে রামানুজীয় অভিমতের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে এক, নির্গুণ ও নিরবয়ব রূপে বর্ণনা করায়, তিনি ব্রহ্মকে সর্ব প্রকার ভেদরহিত তথা সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত – এই ত্রিবিধ-ভেদরহিত রূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু রামানুজ চিৎ অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মে তথা ঈশ্বরে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ স্বীকার না করলেও স্বগত ভেদ স্বীকার করেছেন। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর দ্বিতীয়রহিত হওয়ায় তাঁর কোনও সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় ভেদ নেই। কিন্তু তা প্রকারী হওয়ায়; চিৎ ও অচিৎ তাঁর প্রকার বা বিশেষণ হওয়ার স্বগত ভেদ স্বীকার করতে হয়। আমরা জানি একই বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ তা হল স্বগতভেদ। কাজেই অংশ ও অংশীর মধ্যে যে ভেদ, তা হল স্বগতভেদ। যাই হোক বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে ত্রিবিধ তত্ত্ব বা পদার্থ স্বীকৃত, যথা – চিৎ (চেতন ভোক্তা জীব), অচিৎ (জড় প্রকৃতি) এবং ঈশ্বর (জীব ও জগৎ -এর নিয়ামক) ।

রামানুজাচার্যের মতে, চিৎ অচিৎ বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম তিনিই এই সমগ্র জগৎ -এর মূল উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মই সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট রূপে জগৎ -এর উপাদান

কারণ হন। আবার ‘আমি বহু হব’ – এরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্টত্ব রূপে তিনিই জগৎ -এর নিমিত্ত কারণ হন। অভিপ্রায় এই যে, রামানুজের মতে পরব্রহ্ম তথা ঈশ্বর স্বরূপতঃ অপরিণামী, নিত্য ও নির্বিকার। তবে তিনি নিষ্ক্রিয় নন। জীবের কর্ম অনুসারে ফলভোগের নিমিত্ত যখন তাঁর মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা জাগে তখন ‘আমি বহু হব’ – এরূপ সঙ্কল্প করেন। এরপর তাঁর স্বকীয় জগৎসৃষ্টিকারী মায়া-শক্তির দ্বারা চিৎ ও অচিৎ অংশ দু’টি হতে যথাক্রমে জীব ও মহদাদি ক্রমে জগৎ ও জাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন। কাজেই বিশিষ্টাদ্বৈত সম্মত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ পরিণামী নন, তথাপি তাঁর চিৎ ও অচিৎ অংশ দু’টি পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

কেবলাদ্বৈত-দর্শনে স্বীকৃত মায়াবাদ রামানুজ খণ্ডন করেছেন। তা হলে প্রশ্ন ওঠা অসঙ্গত নয় যে, আচার্য শঙ্কর এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম হতে বিভিন্নতার জগৎ -এর ব্যাখ্যার জন্য মায়া নামক ব্রহ্মে কল্পিত একটি শক্তি স্বীকার করেছেণ। এখন রামানুজ কর্তৃক যদি মায়াবাদ খণ্ডিত হয় তা হলে তিনি কীভাবে এক ও অদ্বয় ঈশ্বর হতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্নতার জগৎ -এর ব্যাখ্যা দেবেন? এর উত্তরে বলা যায়। আচার্য শঙ্কর-স্বীকৃত মায়াবাদ রামানুজ খণ্ডন করলেও, তিনি মায়া-শক্তিকে অস্বীকার করেননি। মূল কথা হল আচার্য শঙ্কর যেভাবে মায়াকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সেভাবে মায়াকে বর্ণনা করেননি। তাঁর মতে মায়া হল ঈশ্বরের বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টিকারী শক্তি, যার সাহায্যে ঈশ্বর তাঁর চিৎ ও অচিৎ অংশ দু’টি হতে যথাক্রমে জীব ও জগৎ-সৃষ্টি করে থাকেন। এই মায়ারূপিণী শক্তি সৎ ঈশ্বরে আশ্রিত হওয়ায় মিথ্যা হতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ অংশ দু’টি যখন সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরে আশ্রিত থাকে তখন তাকে জগৎ -এর উপাদান কারণ বলা হয়। আর যখন চিৎ ও অচিৎ অংশ দু’টি স্থূল রূপ পরিগ্রহ করে তথা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কার্য বলা হয়। তাই বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর, তাঁর চিৎ ও অচিৎ অংশ এবং তা হতে সৃষ্ট জগৎকে সত্য বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে পরিণামবাদ স্বীকৃত হলেও, তা সাংখ্যসম্মত পরিণামবাদ হতে স্বতন্ত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বরূপতঃই মহদাদিক্রমে জগৎ-রূপে পরিণত হয়। কিন্তু রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর

স্বরূপতঃ জগতে পরিণত হন না, তিনি তাঁর স্বাশ্রিত মায়া-শক্তির দ্বারা চিৎ ও অচিৎ অংশ দু'টিকে যথাক্রমে জীব ও জগতে পরিণত করেন। তাই বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে যে পরিণামবাদ স্বীকৃত হয়েছে, তা স্বরূপ পরিণাম নয়, তা হল শক্তিবিক্ষেপাত্মক পরিণাম। এরূপ পরিণামে ব্রহ্মের স্বরূপের পরিণাম ঘটে না, বরং ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ - এই দু'টি অংশেরই জগৎ-রূপে পরিণাম ঘটে। চিৎ অংশ জীবরূপে এবং অচিৎ অংশ জড়ে পরিণত হয়। একটা মাকড়সা যেমন তার শরীরের অংশ হতে তন্তুজাল-রূপ কার্য উৎপন্ন করে কিন্তু তা স্বরূপতঃ তন্তুজালে পরিণত হয় না, তদনুরূপ চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের স্বরূপের কোনও পরিণাম হয় না, বরং চিৎ ও অচিৎ অংশদু'টির পরিণাম স্বরূপ জগৎ-সংসারের আবির্ভাব ঘটে। চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায়, আচার্য রামানুজ প্রবর্তিত বেদান্ত-দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন নামে খ্যাত।

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ যা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই সমস্ত পদার্থ-সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেন, যথা – প্রমাণ ও প্রমেয়। তাঁদের মতে প্রমাণ তিন প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। আর যা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাকে প্রমেয় বলেন। এই প্রমেয় দু'প্রকার, যথা – দ্রব্য ও অদ্রব্য। যা উপাদান তাকেই দ্রব্য বলে। যেমন, ঘটের উপাদান হল মৃত্তিকা। তাই মৃত্তিকাকে বলা হয় দ্রব্য। দ্রব্য আবার দু'প্রকার – জড় ও অজড়। চতুর্বিংশতিতত্ত্বযুক্ত প্রকৃতি এবং কাল ভেদে জড় আবার দু'প্রকার। আর পরাক্ ও প্রত্যক্ ভেদে অজড় দু'প্রকার। যা নিজের নিকট ভাসমান হয় তাকে প্রত্যক্ দ্রব্য বলে। আর যা অপরের নিকট ভাসমান হয় তাকে পরাক্ দ্রব্য বলে। প্রত্যক্ অজড় দ্রব্য জীব ও ঈশ্বরভেদে দু'প্রকার। আর পরাক্ অজড় নিত্যবিভূতি ও মতি ভেদে দু'প্রকার। ত্রিগুণেরও ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বিশেষ গুণযুক্ত দ্রব্য নিত্যবিভূতি। আর জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয়ের যে অবভাস বা প্রকাশ, তাই মতি। জীব আবার তিন প্রকার – বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। সংসার হতে যারা নিবৃত্ত হয়নি তারা বদ্ধ জীব। এই বদ্ধজীব দ্বিবিধ – শাস্ত্রের অধীন ও শাস্ত্র-নিরপেক্ষ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাঁরা জ্ঞান লাভ আহরণ করেন, এমন জীব হল শাস্ত্রের অধীন। যেমন, মনুষ্য। আর মনুষ্যেতর তির্যক প্রাণী শাস্ত্রাধীন নয়, তারা

শাস্ত্র-নিরপেক্ষ জীব। শাস্ত্রের অধীন জীব আবার দু'প্রকার – বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। ভোগকারী পুরুষকেই শাস্ত্রে বুভুক্ষু বলা হয়েছে। এই বুভুক্ষু জীব আবার দু'প্রকার – অর্থকামপর ও ধর্মপর। দেহকে যারা আত্মা বলে মনে করে তারা অর্থকামপর। আর যারা দেহ হতে আত্মাদিকে ভিন্ন বলে মনে করেন এবং পরলোকে বিশ্বাস করেন তাঁরাই ধর্মপর। ধর্মপর আবার দ্বিবিধ ভাগে বিভক্ত, যথা – দেবতান্তরপর এবং ভগবৎপর। যাঁরা দেবতান্তরপর তাঁরা ব্রহ্ম, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করেন। আর ভগবৎপর জীব তিন প্রকার – আর্ত, জিজ্ঞাসু, ও অর্থার্থী। যে ঐশ্বর্য বিগত হয়েছে, সেই ভ্রষ্ট ঐশ্বর্যের যিনি কামনা করেন তাঁকে আর্ত বলা হয়। আর যে ঐশ্বর্য উপার্জিত হয়নি, সেই ঐশ্বর্যের যিনি কামনা করেন, তাঁকে বলা হয় অর্থার্থী। আর যাঁর ঐশ্বর্যলাভ বিষয়ে জানার ইচ্ছা রয়েছে, তিনি হলেন জিজ্ঞাসু জীব। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বুভুক্ষু জীবের আলোচনা করার পর মুমুক্ষু জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন – মুমুক্ষু জীবও কৈবল্যপর ও মোক্ষপর ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানযোগবশতঃ প্রকৃতি হতে বিযুক্ত হয়ে আত্মানুভবরূপ যে অনুভূতি তাকে কৈবল্য বলা হয়। যাঁদের অর্চি প্রভৃতি মার্গের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ অনুভূতি ব্যতীতই স্বাত্মানুভূতি হয়ে থাকে, তাঁদের বলা হয় কৈবল্যপর। আবার অনেকে বলেন অর্চি প্রভৃতি মার্গের দ্বারা গমন করে প্রকৃতির কোনওও স্থানে অবস্থান করে যাঁরা আত্মানুভব করেন, তাঁদেরও কৈবল্যপর জীব বলা হয়। তবে প্রথম প্রকার কৈবল্যপর জীব পরমপদ প্রাপ্ত হন, আর দ্বিতীয় প্রকার কৈবল্যপর জীব পরমপদ প্রাপ্ত হন না। মোক্ষপর জীব আবার দু'প্রকার – ভক্ত ও প্রপন্ন। যাঁরা বেদাঙ্গ ও বেদান্ত সমেত বেদ পাঠ করেছেন, উত্তর-মীমাংসা ও পূর্ব-মীমাংসা সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান হয়েছে, যাঁরা চিৎ ও অচিৎ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে জেনেছেন এবং সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভক্তির দ্বারা যাঁরা মোক্ষলাভে অভিলাষী, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। অন্যদিকে যাঁরা অনন্যগতি হয়ে ভগবানকে আশ্রয় করে থাকেন, তাঁরা হলেন প্রপন্ন। প্রপন্ন জীব আবার দু'প্রকার – একান্তী ও পরমৈকান্তী। মোক্ষলাভের সঙ্গে যারা ভগবানের নিকট অন্যান্য ফলও কামনা করে থাকেন, তারা একান্তী। আর যারা ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের নিকট অন্য ফলের কামনা করেন না, তারা হল পরমৈকান্তী। অন্যদিকে সাধনরূপ উপায়

পরিগ্রহণ করে সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে যাঁদের স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হয়েছে, অতঃপর যাঁরা বৈকুণ্ঠ নামক দিব্য নগরে শ্রীভগবানের নিকট গমন করে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন মুক্ত জীব। আর শ্রীভগবানের অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধাচারণ যাঁরা করেন না এবং যাঁদের জ্ঞানের সংকোচ হয় না, সেইরূপ জীবকে নিত্য বলা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর পাঁচ প্রকার – পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চাবতার। দেবালয়াদিতে প্রতিমা-রূপে কল্পিত মূর্ত্তিতে সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠিত হলেন অর্চা। রামাদি-রূপে তার অবতার হল বিভব। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণভেদে চারিরূপে অবস্থিত তাঁর ব্যূহরূপ। সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত (জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও শ্রী) পরব্রহ্ম বাসুদেব তাঁর সূক্ষ্মরূপ। আর অন্তর্যামী-রূপে তিনি সকল জীবের অন্তরে অবস্থান করে জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিশেষে রামানুজাচার্যের মতে অদ্রব্যও দশ প্রকার, যথা – সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগ ও শক্তি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যদিও বৈশেষিকাচার্যগণ প্রমাজ্ঞানের বিষয়রূপে যা কিছু প্রতিভাত হয়, সেগুলিকে সাতভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ পদার্থকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন – প্রমাণ ও প্রমেয়। প্রমেয়সমূহকেও নানা প্রকারে তাঁরা শ্রেণীকরণ করেছেন। তবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বৈশেষিকোক্ত পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল দ্রব্য ও গুণকে স্বীকার করেছেন। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই হল বিশেষ্য তথা দ্রব্য আর চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিশেষণ তথা গুণ। আর এই চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মই হল ঈশ্বর, যা জগৎ -এর মূল কারণ। তাঁরা বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলেন। তবে দ্রব্য সম্বন্ধে বৈশেষিকমতের সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মতে একই বস্তু দ্রব্য ও গুণ হতে পারে। যেমন, আলোর আশ্রয়রূপে প্রদীপ দ্রব্য। আবার প্রদীপ ব্রহ্মের অচিৎ - এর অংশ হওয়ায় তা ব্রহ্মের গুণ। তেমনি প্রভার আশ্রয় বলে আলো দ্রব্য আবার প্রভা আলোর গুণ। কিন্তু বৈশেষিকমতে দ্রব্য ও গুণ দু'টি স্বতন্ত্র পদার্থ। যাই হোক বৈশেষিকসম্মত

সপ্ত-পদার্থের অন্তর্গত কর্ম, সামান্য, বিশেষ কিংবা অভাব নামক পদার্থকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কর্ম পৃথক পদার্থ নয়, কারণ বৈশেষিকোক্ত উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন – এই পঞ্চবিধ কর্ম সংযোগজন্য। যেমন, উৎক্ষেপণ হল ঊর্ধ্বদেশের সঙ্গে সংযোগ, অপক্ষেপণ হল অধঃদেশের সঙ্গে সংযোগ, আকুঞ্চন হল অল্পদেশ সংযোগ, প্রসারণ হল বিস্তৃতদেশ সংযোগ, আর গমন হল স্থানান্তরের সঙ্গে সংযোগ। কর্মমাত্রই সংযোগ জন্য হওয়ায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ কর্মকে সংযোগের অন্তর্ভুক্ত করেন। সামান্য বা জাতিকেও তাঁরা পৃথক পদার্থ বলেন না। কারণ সংস্থানই জাতি। রামানুজপন্থিগণের মতে অবয়ব সন্নিবেশই হল সংস্থান। যখন আমাদের কোনও দ্রব্যের প্রতীতি হয় তখন অবয়ব সন্নিবেশের প্রতীতি ব্যতীত হতে পারে না,। তাই সংস্থানরূপ সামান্যকে পৃথক পদার্থান্তর হিসাবে স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণও কেবলাদ্বৈতবাদীগণের ন্যায় সমবায়কে পৃথক পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। কারণ বৈশেষিকমতে ব্যক্তি (ঘট) ও জাতির (ঘটত্ব) মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল সমবায়। কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে এরূপ কোনও সম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। ঘট ও ঘটত্বের সম্বন্ধ হল অপৃথকসিদ্ধ। একটি অপরটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবে ঘট ও ঘটত্বের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তার ঘট ও ঘটত্ব অতিরিক্তরূপে প্রতীতি হয় না। তাই সমবায়কে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বিশেষকেও স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। কারণ পৃথক্ত্ব ধর্মের দ্বারাই সকল সকল বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য বিশেষকে অতিরিক্ত পদার্থের মর্যাদা প্রদান নিরর্থক। না হলে সিদ্ধসাধন দোষ ঘটবে। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে আমরা ভেদ নির্ধারণ করতে পারি, কারণ জীব হল অণু আর ঈশ্বর হলেন বিভু। এগুলিই তাদের বিভাজক ধর্ম। তাই তাদের মধ্যে ভেদ সাধনের নিমিত্ত বিশেষ-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এখন যদি আপত্তি করে বলা হয়, দু'টি সমানজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ভেদ নির্ধারণ করতে গেলে, যেমন – একই প্রকার জীবের মধ্যে ভেদ নির্ণয় কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায় – প্রত্যেক জীবের মধ্যে বিভাজক কোনও ধর্ম না থাকলেও তাদের দেশ, কাল, জাতি, গুণ, আকার প্রভৃতির সাহায্যে তাদের পরস্পরের

ভেদ নিরূপণ করা সম্ভব। যদি বলা হয়, সমস্ত বদ্ধ জীবের ভেদ নিরূপণ তাদের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে সম্ভব হলেও মুক্ত জীবের মধ্যে ভেদ সাধন কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন – প্রতিটি মুক্ত জীবের তার পূর্বতন অমুক্ত দশার সঙ্গে তাদের তুলনা করে, তাদের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করা সম্ভব। তা ছাড়া বিশেষরূপ পদার্থটি ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান উৎপাদন করতে পারে না, যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। তাই বিশেষ তার কারণ বা উৎপাদক হতে পারে না। আবার বদ্ধজীবের নিকট বিশেষরূপ পদার্থটি দৃশ্য না হওয়ায় তার দ্বারা পদার্থ-সকলের ভেদ নিরূপণ সম্ভব হয় না। যোগিগণেরও বিশেষরূপ পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। যেহেতু তাঁরা সর্বজ্ঞ তাই সকল বস্তুই পৃথকভাবে তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই বিশেষরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ তাঁদের স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ অভাবকেও পদার্থান্তর হিসাবে স্বীকৃতি দেন না। তাঁদের মতে ঘটের অভাব যদি ঘটাভাবরূপ স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ হয় তা হলে ঘটাভাবের যে অভাব তাকেও ঘটাভাবাভাবরূপ স্বতন্ত্র অভাব-পদার্থ বলে স্বীকার করতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ এসে পড়বে। কিন্তু আমরা জানি ঘটাভাবাভাব হল ঘটস্বরূপ। কাজেই অভাব-পদার্থ বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই। তা একপ্রকার ভাব-পদার্থই। ভূতলে ঘটের যে অত্যন্তাভাব তা ভূতলস্বরূপ। ঘটের প্রাগভাব হল মৃত্তিকাস্বরূপ। ঘট ধ্বংসের পর ঘটের যে অভাব তাও ভাব-পদার্থ। কারণ, ঘট ধ্বংসের পর ঘটের কপালমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাই ঘটের ধবংসাভাব হল কপালস্বরূপ। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁরাও অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলে থাকেন শুধু তাই নয় প্রাভাকর সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁরাও শক্তিকে অতিরিক্ত পদার্থের মর্যাদা দেন। প্রাভাকরগণ যেভাবে প্রতিটি বস্তুর কার্যোৎপাদন সামর্থ্যকে অতিরিক্ত একটি পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন, তদনুরূপ আচার্য রামানুজও ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকারী বিচিত্র সামর্থ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ বলেছেন; যাকে তিনি মায়াশক্তি নামে অভিহিত করেছেন। তবে এই মায়াশক্তি আচার্য শঙ্কর-স্বীকৃত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-শক্তি হতে যে পৃথক তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এভাবে রামানুজীয় দর্শনে বৈশেষিকোক্ত সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব-পদার্থের পৃথক পদার্থত্ব

খণ্ডিত হয়েছে। কাজেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মই হলেন মূল তত্ত্ব বা পদার্থ। ব্রহ্ম হলেন দ্রব্য আর চিৎ ও অচিৎ হল তার গুণ বা প্রকার। কাজেই রামানুজের মতে পদার্থ = চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম = ঈশ্বর (সগুণ)।

মাধ্ব মতঃ

পুজ্যপাদ মাধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হিসাবে সমধিক পরিচিত। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতবাদের বিরোধিতা করেই মাধ্বমতের উদ্ভব হয়েছিল। যদিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজও শঙ্করাচার্যের মতবাদের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি শঙ্করাচার্যের প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারেননি। কিন্তু মাধ্বাচার্য আচার্য শঙ্করের সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রদর্শন করেছিলেন। অদ্বৈতমতে অভেদ সত্য। ভেদমাত্রই মায়াকল্পিত, তাই তা মিথ্যা। অভিপ্রায় এই যে, আচার্য শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ও অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব। তার কোনও দ্বিতীয় নেই, তা নির্গুণ ও নিরবয়ব। তাই শঙ্করাচার্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ভেদরহিত। জীববুদ্ধি যখন মায়ারূপী অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে ভেদকে সত্য বলে মনে করে। তার কাছে বিভিন্নতার জগৎ সত্য রূপে অবভাসিত হয়। নিজেকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ তিরোহিত হলে তার সকল প্রকার ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়। তখন সে উপলব্ধি করে একমাত্র অভেদই সত্য, ভেদ মিথ্যা। কিন্তু মাধ্বমতে ভেদই সত্য এবং স্বাভাবিক। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ, এক জীব হতে অন্য জীবের ভেদ, জড় প্রপঞ্চের পরস্পরের ভেদ, ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের ভেদ, জীব ও প্রপঞ্চের ভেদ – এ সবই সত্য এবং স্বাভাবিক। প্রতিটি বস্তুর স্বভাবই হল তারা একে অপরের থেকে ভিন্ন। তাই মাধ্বমতে ভেদই পারমার্থিক সত্য। এই ভেদ অনাদি হওয়ায় অনন্তকাল হতে প্রতিটি বস্তুতে বিদ্যমান। যদি তা উৎপত্তিশীল হত, তা হলে তা নিবৃত্ত হত; কিন্তু তা উৎপত্তি-বিনাশরহিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় মাধ্বাচার্যও ভেদমাত্রকে মায়াসৃষ্ট বলেন। তবে মায়া সম্পর্কে মাধ্বমত আচার্য শঙ্করের মায়াতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ পৃথক। আচার্য শঙ্কর মায়াকে মিথ্যা বলেন। কিন্তু মাধ্বমতে 'মায়া' শব্দের অর্থ ভ্রান্তি নয়, মায়া হল ভগবদিচ্ছা। এই মায়া মাধ্বদর্শনে

মহামায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি, বাসনা প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছে। প্রকৃষ্টরূপে যা সৃষ্টির কারণ হয়, তাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। তা সমস্ত বস্তুর উৎপাদন করে বলে তাকে বাসনা বলা হয়েছে। মাধ্বমতে অবিদ্যাও মায়ারই নামান্তর। 'অ' এর অর্থ ভগবান হরি। কাজেই অ-বিদ্যা মানে ভগবান হরির বিদ্যা। আবার তাঁর মতে 'ময়' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। আর ঈশ্বরের ইচ্ছাই হল শ্রেষ্ঠ এটা বোঝানোর জন্য তিনি মায়া শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কাজেই 'মায়া' শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরেচ্ছা বা ভগবদিচ্ছা। ভগবান হরি প্রজ্ঞানস্বরূপ, তাঁর যে জ্ঞান তা নিত্য আনন্দযুক্ত; তিনি এই জগৎকে জানেন ও রক্ষা করেন। তাই জগতের এই যে দ্বৈতভাব তথা ভেদ, তা ভ্রান্ত বা কল্পিত হতে পারে না। মাধ্বমতে তা সত্য এবং স্বাভাবিক। তাঁর মতে অভেদ-জ্ঞানই জীবের বন্ধনের মূল কারণ। জীব যখন দুর্মতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাদের অভেদ বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তদ্‌ নিবন্ধন সে সংসার-দশা ভোগ করে। কোনও রাজার স্থপতি যদি নিজেকে রাজার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে, তা হলে তার দুর্মতিই প্রকাশিত হয়। তদনুরূপ জীবের যদি স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং অভেদ প্রতীতি হতে থাকে, তা হলে তার বন্ধন সুনিশ্চিত। কাজেই জীব ভগবানের অংশ হওয়ায় জীবের সঙ্গে ভগবানের অভেদ সম্ভব নয়, যেহেতু অংশ ও অংশী কখনও এক হতে পারে না। পরমাত্মা সর্বপ্রকার দোষমুক্ত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। তিনি অনন্ত গুণের অধিকারী। ব্রহ্ম বা ভগবান পূর্ণ এবং সবকিছুর নিয়ন্তা। অপরদিকে জীব অপূর্ণ এবং নিয়ম্য। জীব স্বরূপতঃ অজ্ঞান, ভয়, দুঃখ, মোহ ইত্যাদি দোষদুষ্ট এবং সংসারী। ভগবান বা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকের সম্বন্ধ। জীব সেবক আর ভগবান হলেন সেব্য। তাই এই দুই-এর ভেদ সুনিশ্চিত। জীব ভগবানের দাস। এখন দাস যদি প্রভুর সঙ্গে ঐক্যবোধ করেন, তা হলে প্রভু তাকে দণ্ডিত করে। তেমনই ভগবানের সঙ্গে জীবের ঐক্যবোধ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। জীব ভগবানের সঙ্গে ঐক্যবোধ করলে জীবের অধোগতি হয় এবং জীব সংসার-বন্ধনে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। যতদিন জীবের তাত্ত্বিক ভেদবোধ উদিত না হয়, ততদিন জীবের মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু জীব যখন পঞ্চবিধ ভেদ সম্বন্ধে অবগত হয়, এবং উপলব্ধি করে সে হল ভগবানের

দাস, ভগবানের অনুগ্রহই তার মুক্তির একমাত্র পথ; তখন সে ভগবান সেবায় ঐকান্তিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং দীর্ঘ দিন অঙ্কন, নাম, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবানের সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রসাদ লাভ করেন। এরপর দীর্ঘ উপাসনা- আরাধনার দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হন। কাজেই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করাই জীবের একমাত্র পরম পুরুষার্থ। এস্থলে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, আচার্য শঙ্কর যেখানে জীবের সংসার-দশা নিবন্ধন যে বন্ধন তা হতে মুক্তির পথ হিসাবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখানে আচার্য মাধ্ব ভগবানের প্রতি ভক্তিকে মুক্তির একমাত্র পথ বলেছেন। তাঁর মতে জীব কখনওই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। উভয়ের মধ্যে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। কাজেই মাধ্বমতে পদার্থ বা তত্ত্ব দু'প্রকার, যথা – স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণু হলেন স্বতন্ত্র, আর জীব ও জগৎ হল অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্বকেই সত্যরূপে স্বীকার করায় তাঁর বৈদান্তিক মতবাদ দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, দ্বৈতই যদি সত্য হয়, তা হলে শ্রুতি ইত্যাদিতে যে অদ্বৈততত্ত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার ব্যাখ্যা কীভাবে মাধ্বাচার্য দেবেন? এর উত্তরে মাধ্বাচার্যকে অনুসরণ করেই বলা যায়, পরমতত্ত্বরূপে ঈশ্বর সবকিছুর ঊর্ধ্বে; তাঁর সমান বা তদপেক্ষা উত্তম কিছুই নেই। এই অর্থেই হরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব; তাঁর মতো দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

মাধ্বমতে ভগবান একমাত্র স্বতন্ত্র পদার্থ। আর বাকি সকল পদার্থই ভগবানের অধীন। ভগবান সগুণ ও সবিশেষ। তিনি অনন্ত গুণের আকর। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান; নানা ঐশ্বর্যযুক্ত, বহুরূপধারী, জগৎ -এর পালক, কর্মফলদাতা, সকল জীবের অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। তিনি সর্ব-ব্যাপক। মাধ্ব কর্তৃক ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আচার্য শঙ্করের ন্যায় তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদী না হলেও তাঁর মতের সঙ্গে আচার্য রামানুজের মতের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ই মনে করেন ঈশ্বর বা ভগবান অনন্য-নিরপেক্ষ সৎ, বাকি সব কিছুই তাঁর অধীন। তাই তারা মিথ্যা হতে পারে না। কাজেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ - এ সবই সত্য। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তাঁরা জগৎকে মিথ্যা

বলেন না। যদিও শঙ্করাচার্যের মতে জগৎ দৃশ্য, তাই তা মিথ্যা। তাঁর মতে অদৃশ্য, অব্যবহার্য ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। তা হলে আপত্তি হবে জগৎপ্রপঞ্চ যদি মিথ্যা হয়, তা হলে জগৎ প্রপঞ্চের এই যে মিথ্যাত্ব তা সত্য নাকি অসত্য? যদি মিথ্যাত্ব সত্য হয়, তা হলে অদ্বৈত সত্য -এই উক্তিটিই অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। আর যদি জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বকে অসত্য বলা হয় তা হলে মাধ্ব সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চ যে সত্য তাই প্রতিপাদিত হয়। এখন পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলতে পারেন, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অদ্বৈতদর্শনে স্বীকৃত হলেও প্রপঞ্চের অসত্তা বা অবিদ্যমানতা অস্বীকৃত নয়। জগৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সৎ। এর উত্তরে মাধ্বপন্থিগণ বলেন, পূর্বপক্ষীর এমন যুক্তি সেই শকটচালকের সঙ্গে তুলনীয় -- যে শিরচ্ছেদ হলেও একশত মুদ্রা দেবে না; কিন্তু পাঁচবার বিশমুদ্রা দিতে প্রস্তুত। মূল কথা হল মিথ্যাত্ব ও অসত্তা পর্য্যায়বাচক শব্দ; তাই যা মিথ্যা তাকে আর সৎ বলা যায় না। এই হেতু মাধ্বমতে ব্রহ্ম যেমন সত্য, জগৎও তেমনই সত্য, তা মিথ্যা হতে পারে না। কারণ যাঁরা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁরা জগৎ -এর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলেন – জগৎ দৃশ্য তাই তা মিথ্যা। কিন্তু জগৎ মিথ্যা হলে এমন অনুমানই অনুপপন্ন হবে। কারণ, জগৎ মিথ্যা হলে জাগতিক অনুমানাদি প্রক্রিয়াও মিথ্যা হবে। তাই তাঁদের মতে জগৎ সত্য। রামানুজপন্থিগণও জগৎকে সত্য বলে থাকেন। কারণ ব্রহ্মের অচিৎ অংশই জগৎ-রূপে পরিণত হয়। কাজেই অংশী সৎ হলে তার অংশ কখনওই অসৎ বা মিথ্যা হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, উভয়ই ঈশ্বরকে সগুণ ও সবিশেষ বলেন। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়েও রামানুজীয় ও মাধ্বগণ সহমত পোষণ করেন। উভয়-মতেই ঈশ্বর হলেন সেব্য আর জীব তাঁর সেবক। তাই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবকভাব সম্বন্ধ বিদ্যমান। উভয়েই মনে করেন ভগবৎ প্রসাদেই মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। তাই ভক্তিই মুক্তির প্রাথমিক সোপান। তবে গভীরভাবে অনুধাবন করলে উভয়-মতের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। রামানুজের মতে ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ অংশই যথাক্রমে জীব ও জড় জগৎ - এ পরিণত হয়। সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর আমরা তাকে কারণ-ব্রহ্ম বলে থাকি, অপরদিকে, স্থূল চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর তা হল কার্য-

ব্রহ্ম। কাজেই কার্য হল কারণের ব্যক্তরূপ। তাই জীব ও জগৎ ঈশ্বর হতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নয় আবার অভিন্নও নয়। কিন্তু মাধ্বমতে ভগবান ও জীব-জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই সকল পদার্থ দু'প্রকার -- ভাব আর অভাব। ভাব-পদার্থ আবার দু'প্রকার, যথা – চেতন ও অচেতন। জীব হল চেতন আর জড় জগৎ হল অচেতন। ভগবান শ্রীহরি উক্ত চেতন ও অচেতন পদার্থ হতে ভিন্ন। কারণ জীব ও জগৎ ভগবানের অধীন তথা পরতন্ত্র; কিন্তু ভগবান স্বতন্ত্র। ভগবান নিয়ন্তা; কিন্তু জীব ও জগৎ নিয়ম্য। ভগবান পূর্ণ; অপরদিকে জীব অণু। ভগবান হলেন সেব্য, অপরদিকে জীব সেবক। সেব্য ও সেবকের যে ভেদ তা স্বাভাবিক। ভৃত্য আর রাজা যেমন কখনও এক হন না; তদনুরূপ ঈশ্বর ও জীব কখনও এক নয়। কাজেই জীব ও জগৎ ভগবানের অধীন হলেও তাঁদের মধ্যে অভেদ স্বীকৃত নয়। শঙ্করাচার্যের মতে ভেদ ঔপাধিক। তত্ত্বজ্ঞানে ভেদ-জ্ঞান বাধিত হয়ে যায়। তাই ভেদ মিথ্যা। কিন্তু মাধ্বমতে ভেদ ঔপাধিক নয়, তা পারমার্থিক সত্য। জীব যতদিন না পর্যন্ত স্বাভাবিক ভেদসমূহ সম্পর্কে অবহিত না হবে ততদিন তার মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই নেই। ঈশ্বর যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি পরম করুণাময়, বিশ্বের কর্তা, তিনি সবকিছু হতে ভিন্ন – এই বোধ জাগ্রত না হলে জীবের মুক্তি সম্ভব নয়।

আচার্য মাধ্ব বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় জাগতিক পদার্থসমূহের শ্রেণীকরণ করেছেন। তবে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উভয়-মতের বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে পদার্থ সপ্তবিধ, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। তবে মাধ্বাচার্য ঈশ্বরাধীন যে জাগতিক পদার্থসমূহ সেগুলি শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাভাকর-মীমাংসা দর্শনের মত অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতে পদার্থ দশ প্রকার, যথা, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব। কাজেই তিনি বৈশেষিকসম্মত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে ষট্-পদার্থকে মেনেছেন। তবে অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায় তিনিও সমবায়কে স্বতন্ত্র-পদার্থরূপে স্বীকার করেননি। যেহেতু বৈশেষিকসম্মত সমবায়-সম্বন্ধের অযুতসিদ্ধতাই সিদ্ধ নয়। এতদ্ অতিরিক্ত মীমাংসা-সম্মত শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত

পদার্থের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে মীমাংসা-সম্মত শক্তি ও মাধ্ব-স্বীকৃত শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মীমাংসকগণ কার্যোৎপাদন সামর্থ্যকে শক্তি বলেন। কিন্তু আচার্য মাধ্বমতে শক্তি চার প্রকার, যথা – অচিন্ত্যশক্তি, আধেয়শক্তি, সহজশক্তি এবং পদশক্তি। অচিন্ত্যশক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। এটি অঘটিতসংঘটনপটীয়সী। এই শক্তির জন্যই পরমাত্মাতে একই সঙ্গে অণুত্ব ও মহত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি সম্ভব হয়। এই শক্তির ওপর নাম ঐশ্বর্য্য। কার্যমাত্রের অনুকূল শক্তি হল সহজশক্তি। এর ওপর নাম স্বভাব। আগুনে রয়েছে যে দাহিকা-শক্তি তা হল সহজশক্তি। যখন প্রতিমাদিতে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন যে শক্তির সাহায্যে দেবতার সন্নিধান উৎপন্ন হয়, তা হল আধেয়-শক্তি। আর একটি পদ যে শক্তির দ্বারা তার স্বনিষ্ঠ অর্থকে বোঝায়, তাকে বলে পদশক্তি। কাজেই মীমাংসকগণ শক্তি বলতে অচিন্ত্যশক্তি ছাড়া অপর তিনটি শক্তিকে বুঝলেও মাধ্ব-দর্শনে শক্তি বলতে উক্ত চতুর্বিধ অর্থে বোঝানো হয়েছে। আচার্য মাধ্ব সাদৃশ্যকেও স্বতন্ত্র পদার্থ বলেছেন। তাঁর মতে এই সাদৃশ্য দু'প্রকার, যথা – নিত্য-সাদৃশ্য ও অনিত্য-সাদৃশ্য। দুই বা ততোধিক নিত্য বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য তা হল নিত্য-সাদৃশ্য, আর দুই বা ততোধিক অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য তা হল অনিত্য-সাদৃশ্য। এ ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট ও অংশীকে অতিরিক্ত পদার্থ বলেছেন। মাধ্বমতে বিশেষ্য ও বিশেষণের যে সম্বন্ধ তাকে বৈশিষ্ট্য বলে। আর এই বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট যে (বিশেষ্য) পদার্থ তা হল বিশিষ্ট-নামক পদার্থ। অন্যভাবে বলা যায় বিশেষণের সঙ্গে সম্বন্ধবশত বিশেষ্যের যে আকার হত তাই বিশিষ্ট-পদার্থ। সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হলেন পরব্রহ্ম, তাই তিনি বিশিষ্ট-পদার্থ। এই বিশিষ্ট-পদার্থ আবার নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমানত্ব, কল্যাণ গুণের আকর প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট ভগবান হরি হলেন নিত্য-বিশিষ্ট-পদার্থ। আবার দণ্ড প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট যে দণ্ডী হল অনিত্য-বিশিষ্ট-পদার্থ। মাধ্বগণ অংশীকেও স্বতন্ত্র পদার্থের মর্যাদা দেন। ভেদ সত্য হওয়ায় অংশ মানতে হবে। আর অংশ থাকলে অংশী অবশ্যই স্বীকার্য। অংশী আবার দ্বিবিধ – নিত্যাংশী ও অনিত্যাংশী। আকাশ প্রভৃতি হল নিত্যাংশী, আর ঘট, পটাদি হল অনিত্যাংশী।

বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ মাধ্ব-দর্শনে স্বীকৃত হলেও ক্ষেত্র বিশেষে উভয়-মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন - বৈশেষিকমতে যা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় তা হল দ্রব্য। কিন্তু মাধ্বমতে দু'টি বিবাদশীল বস্তুর মধ্যে যা দ্রবণপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যার পরিণাম হয় (যে রূপে পরিণাম হয়) তাকে দ্রব্য বলে। শুধু লক্ষণের দিক্ থেকে নয় দ্রব্যের সংখ্যাভেদ বিষয়েও উপয়ের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার, যথা – ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা ও মন। কিন্তু মাধ্বমতে দ্রব্য বিংশতি প্রকার, যথা - পরমাত্মা, লক্ষ্মী, জীব, অব্যাকৃত আকাশ, প্রকৃতি, গুণত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), মহত্তত্ত্ব, অহংকার, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা, ভূত, ব্রহ্মাণ্ড, অবিদ্যা, বর্ণ, অন্ধকার, বাসনা, কাল ও প্রতিবিম্ব। মাধ্বমতে রূপ, রসাদি এবং সৌন্দর্য, ধৈর্য, শৌর্যাদি ভেদে গুণও অনেক প্রকার। কর্ম বিহিত, নিষিদ্ধ এবং উদাসীন ভেদে তিন প্রকার। যা সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরায় পুণ্য অথবা পাপের অসাধারণ কারণ হয়, তাকেই মাধ্বদর্শনে কর্ম বলা হয়েছে। বৈশেষিকোক্ত উৎক্ষেপণাদি কর্মও পরম্পরাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের কারণ হয়ে থাকে। যাই হোক মাধ্বমতে বিহিতকর্ম দু'প্রকার – কাম্য কর্ম ও অকাম্য কর্ম। যে কর্ম ফলের আশাপূর্বক করা হয়, তাহল কাম্য কর্ম। আর ঈশ্বরের প্রসাদ হিসাবে যে কর্ম করা হয় তা হল অকাম্য কর্ম। প্রারব্ধ কর্মও কাম্য কর্মের অন্তর্গত। মাধ্বদর্শনে সামান্য নামক পদার্থটি স্বীকৃত, তবে তা বৈশেষিকসম্মত সামান্যরূপ পদার্থ হতে স্বরূপতঃ ভিন্ন। বৈশেষিকসম্মত সামান্য নিত্য এবং অনেকানুগত। কিন্তু মাধ্বমতে সামান্য নিত্য হতে পারে; আবার অনিত্যও হতে পারে। আবার মাধ্বসম্মত সামান্য প্রতিব্যক্তিতে অনুগত নাও হতে পারে। যেমন – জীবত্ব, দেবত্ব প্রভৃতি সামান্য যাবৎ বস্তুতে বিদ্যমান এবং তা নিত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি সামান্য নিত্যও হয় আবার অনিত্যও হয়। যে ব্রাহ্মণত্ব শরীর সাপেক্ষ তা অনিত্য; কারণ তার উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে। অপরদিকে যে ব্রাহ্মণত্ব মুক্তাবস্থাতে গমন করে তা নিত্য। মাধ্বমতে দু'টি পদার্থের মধ্যে ভেদ ব্যবহারের নির্বাহক পদার্থটি হল বিশেষ। এই বিশেষ দু'প্রকার – নিত্য বিশেষ ও অনিত্য বিশেষ। যদিও বৈশেষিক-দর্শনে বিশেষরূপ পদার্থ নিত্য দ্রব্যে বৃত্তি হওয়ায় নিত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। বৈশেষিকমতে প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে

পৃথক পৃথক বিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বিশেষ অসংখ্য। মাধ্বমতে অত্যন্ত ভিন্ন দু'টি পদার্থের মধ্যে যে ভেদ প্রতীতি তার নির্বাহের জন্য বিশেষরূপ পদার্থ স্বীকৃত। তাঁর মতে ভেদ প্রতীতি জত প্রকার বিশেষও তত প্রকার। কাজেই বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় মাধ্বপন্থীরাও স্বীকার করেন বিশেষ বহু। তবে তাঁদের মতে, এক বস্তুতে একটি বিশেষ থাকবে এমন নয়। যে বস্তুতে যত রকমের ভেদ প্রতীতি হয়ে থাকে সেই বস্তুতে ততগুলি বিশেষ স্বীকৃত। যদিও বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় তাঁরাও বিশেষের আর বিশেষ-স্বীকার করেন না, কারণ বিশেষ হল স্বতঃব্যাবর্তক। মাধ্বমতে অভাব চার প্রকার, যথা – প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। অন্যোন্যাভাব হল পদার্থস্বরূপ; যেমন – ঘট পট নয়। আর যে অভাবের প্রতিযোগী অপ্রামাণিক তাকে অত্যন্তাভাব বলে।

পদার্থ-বিষয়ে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অভিমতঃ

'আয়ুর্বেদ' শব্দটি 'আয়ু' ও 'বেদ' এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের জীবিতকালের নাম আয়ু। আর 'বেদ' শব্দটি এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ জ্ঞান। কাজেই আয়ু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাকে আয়ুর্বেদশাস্ত্র বলে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ *চরকসংহিতায়* বলা হয়েছে –

'হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে'[৪২]।

অর্থাৎ চতুর্বিধ আয়ু তথা হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ ও দুঃখায়ুঃ এবং আয়ুর হিতকর এবং অহিতকর সমস্ত বিষয়, আয়ুর পরিমাণ ও স্বরূপ নির্ণয় যে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে, তাকে আয়ুর্বেদ বলে। আয়ুর্বেদ মতে, মানব শরীর রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত। মানব শরীরে যখন এই সপ্ত ধাতুর সংযোগ সমুচিত পরিমাণে থাকে না অর্থাৎ ধাতু সকল বৈষম্য-প্রাপ্ত হয়, তখন শরীরে আয়ুর পরিমাণের তারতম্য ঘটে। ফলস্বরূপ শরীর রোগাক্রান্ত হয়। তবে আয়ুর পরিমাণের

[৪২] নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র (সম্পাদিত), *চরক-সংহিতা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা – ৫।

তারতম্যহেতু শরীরের ন্যায় মনও রোগাক্রান্ত হতে পারে। কাজেই রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন লাভ করতে হলে দেহ ও মন উভয়কেই সুস্থ রাখা প্রয়োজন। আর দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে হলে আয়ুর্বেদসম্মত পদার্থ-বিষয়ে যথাযথ অবগত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু পদার্থসমূহের জ্ঞানই আয়ুর স্বরূপ, আয়ুর পরিমাণ, তার হিত ও অহিতকর সমস্ত বিষয়ের নির্ধারক। অভিপ্রায় এই যে, পদার্থসমূহের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শরীরে ধাতুসমূহের বিকৃতি ঘটেছে কিনা, ধাতু বিকৃতি না ঘটলেও পরবর্তিকালে যাতে ধাতু বৈষম্য না ঘটে তাঁর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা বিকৃত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য উপযুক্ত পথ্যাদি এবং খাবার গ্রহণ করা – এসব ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য তথা জীবের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং রোগ নিরাময় করা ব্যাহত হবে। কাজেই পদার্থ-বিষয়ক আলোচনা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একটি মুখ্য আলোচ্য বিষয়। যেহেতু পদার্থসমূহের ধারণা আয়ুর্বেদতন্ত্রের মূল ভিত্তিস্বরূপ।

আয়ুর্বেদ তন্ত্রের ওপর যে সমস্ত গ্রন্থগুলি সহজলভ্য, সেগুলির মধ্যে *চরকসংহিতাই* প্রাচীনতম এবং দার্শনিক আলোচনায় সম্পৃক্ত। তাই চরকসংহিতাসম্মত পদার্থতত্ত্বই এস্থলে আলোচ্। ধাতুবৈষম্য দূর করার নিমিত্ত অর্থাৎ জীবের সমস্ত প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখসমূহ নিবৃত্তির-নিমিত্ত এবং সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন প্রদানের জন্য আবশ্যকরূপে *চরকসংহিতাতে* সামান্যাদি ষড়্‌বিধ পদার্থের উপদেশ করা হয়েছে। চরকসংহিতাতে বলা হয়েছে –

‘সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্ম চ।
সমবায়ঞ্চ তজ্ জ্ঞাতা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ।
লেভিরে পরমং শর্ম্ম জীবিতঞ্চাপ্যনশ্বরম্’[৪৩]।

অর্থাৎ আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সমবায় – এই ষড়্‌বিধ পদার্থ-বিষয়ে যথাযথ অবগত হয়ে ব্যক্তি যদি আয়ুর্বেদতন্ত্রের সমস্ত বিধি যথাযথভাবে

[৪৩] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪।

প্রতিপালন করেন তা হলে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সুখ এবং হিতকর আয়ু লাভ হবে। কাজেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে পদার্থ ষড়্‌বিধ, যথা – সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম এবং সমবায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে, আয়ুর্বেদতন্ত্রের পদার্থতত্ত্ব ও বৈশেষিকসম্মত পদার্থতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়শাস্ত্রেই জীবের সকল প্রকার দুঃখ-নিবৃত্তির সহায়করূপে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। উভয়শাস্ত্রই ভাবপদার্থের বিভাগ প্রসঙ্গে ষড়্‌বিধ পদার্থের উল্লেখ করেছে। মহর্ষি কণাদ তাঁর *বৈশেষিকসূত্র*-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রে বলেছেন – 'কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ'[৪৪] অর্থাৎ কারণের অভাব ঘটলে কার্য ঘটে না। কাজেই ষট্‌-ভাবপদার্থ অতিরিক্ত অভাব নামক পদার্থটিও মহর্ষি কণাদসম্মত। তদনুরূপ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিধি, নিয়ম ও আচারপ্রণালী হতে বোঝা যায় 'অভাব' নামক পদার্থ যে আয়ুর্বেদ স্বীকৃত, যেমন - *চরকসংহিতা*তে বলা হয়েছে, বর্ষা ঋতুতে অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা পান না করলে শ্লেষ্মার আধিক্য ঘটবে না, ফলত শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ রোগের কারণের অভাববশতঃ রোগজন্য দুঃখভোগরূপ কার্যের অভাব আয়ুর্বেদতন্ত্রেও স্বীকৃত। কাজেই অভাব-পদার্থের স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও উভয়শাস্ত্রের মধ্যে পদ্ধতিগত দিক্‌ থেকে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয়ের ভেদহেতু উভয়ের পদার্থ-বিষয়ক আলোচনায় বৈলক্ষণ্যও পরিদৃষ্ট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-প্রাপ্তির নিমিত্ত পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। আর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে জীবের কেবল সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-নিবৃত্তির-নিমিত্ত পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে, তা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। পরবর্তিকালে জীব যদি আয়ুর্বেদতন্ত্রের বিধিসকল যথাযথভাবে পালন না করেন তা হলে পুনরায় ধাতুবৈষম্যজনিত দুঃখ ভোগ করতে পারেন। কিন্তু বৈশেষিকসম্মত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির পর জীবের পুনরায় দুঃখভোগের সম্ভাবনাই থাকে না। এখন আমরা যদি একটু গভীরভাবে

---

[৪৪] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্‌ *বৈশেষিক-দর্শনম্‌*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা –৬৮।

অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তা হলে বুঝতে পারবো ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে যে ক্রমে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সে ক্রমে পদার্থের আলোচনা করা হয়নি। বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এভাবে ভাবপদার্থের ক্রম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু চরকসংহিতাতে সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সমবায় – এভাবে ষড় ভাবপদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা বুঝতে পারবো, উভয়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের ভেদহেতু এরূপ ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়েছে। মহর্ষি-প্রণীত বৈশেষিক-দর্শন মূলত মোক্ষানুসারী, তাই জীবমাত্রেরই আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রা[প্তিই এই শাস্ত্রের পরম অভিপ্রেত। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ বৈশেষিক-দর্শন সম্মত নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সহায়করূপে দ্রব্যাদি ষড় পদার্থের উল্লেখ করেছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এই ষড়্‌বিধ পদার্থের মধ্যে দ্রব্য হল আশ্রয়, আর গুণাদি পদার্থ দ্রব্যে আশ্রিত। সেহেতু গুণাদি পদার্থের আলোচনার পূর্বে তাদের আশ্রয় দ্রব্য-পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। এজন্যই আচার্যগণ দ্রব্যাদি ক্রমেই পদার্থসমূহের উদ্দেশ ও লক্ষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং রোগ নির্ধারণ পূর্বক রোগ নিরাময় করা, অর্থাৎ ধাতুসাম্য বজায় রাখা। কিন্তু যখন ধাতুসমূহ বৃদ্ধি বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন ধাতুসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং জীব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সকল সময় বৃদ্ধির কারণ হল সামান্য এবং ক্ষয়ের কারণ হল বিশেষ। কাজেই ধাতুসাম্য রক্ষা করার জন্য কিংবা বিঘ্নিত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমেই বৃদ্ধি বা ক্ষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, তথা সামান্য ও বিশেষ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এহেতু চরকসংহিতাতে প্রথমে সামান্য, পরে বিশেষ এই ক্রমে পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে পদার্থতত্ত্ব

বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের আলোকে জগতের ব্যাখ্যা আমার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই অধ্যায়ে বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের সুবিশ্লেষিত আলোচনা সঙ্গত মনে করেছি। কারণ, বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহের তত্ত্বের স্বরূপ না বুঝলে সেই পদার্থতত্ত্ব জগৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক কিংবা কীভাবে প্রাসঙ্গিক, তা বোঝা যাবে না। তাই এই অধ্যায়ে মূলত বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করব। বৈশেষিক-দর্শনের দ্রষ্টা হলেন মহর্ষি কণাদ। মহর্ষি কণাদকৃত বৈশেষিক-দর্শন প্রমেয়শাস্ত্র রূপে পরিগণিত। যেহেতু প্রমেয়-সমূহই এই শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। 'প্রমেয়' মানে যা প্রমা-জ্ঞানের বিষয়। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়রূপে পরিদৃশ্যমান জগতের বহু বস্তুই প্রতীত হয়, যেগুলিকে বৈশেষিকাচার্যগণ পদার্থ নামে অভিহিত করেছেন।

'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' অর্থাৎ পদের অর্থ হল পদার্থ। মানুষ, বৃক্ষ, নদ ইত্যাকারক শব্দসমূহই পদ। এই পদ যে বস্তুকে নির্দেশ করে তা হল সেই পদের অর্থ। যেমন, 'মানুষ' পদটি রাম, শ্যামাদি মানুষকে নির্দেশ করে; তদনুরূপ 'বৃক্ষ' পদটি বট, নিমাদি বস্তুকে নির্দেশ করে। কাজেই রাম, শ্যাম, বট ইত্যাদি যাবৎ বস্তুসমূহই পদার্থ । 'পদার্থ' শব্দটির অন্তর্গত 'অর্থ' পদটির দ্বারাই পদার্থের লক্ষণ বলা হয়েছে 'অভিধেয়ত্ব'। *অমরকোশে* বলা হয়েছে, 'অর্থঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু'[৪৫] অর্থাৎ অর্থ শব্দ অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও নিবৃত্তির বাচক। সুতরাং অর্থ পদের দ্বারাই পদার্থের সামান্যলক্ষণ সূচিত হয়েছে – অভিধেয়ত্ব। অভিধেয়ত্ব মানে অভিধাশক্তিবিষয়ত্ব। অনেকে অর্থ পদের ব্যুৎপত্তির দ্বারা পদার্থের আরও একটি লক্ষণ সূচিত করেন। তাঁদের অভিমত হল - ঋগতৌ ঋ ধাতুর উত্তর থ (ঔণাদি থ) প্রত্যয় যোগে 'অর্থ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতি। এখন

---

[৪৫] *Sastri, Pt. Hargovinda, Amarkosa, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1998, page- 453.*

নিয়ম আছে গত্যর্থক ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। কাজেই ‘ঋ’ ধাতুর অর্থ হয় জ্ঞান। আর ‘থ’ প্রত্যয়ের অর্থ হয় বিষয়তা। সুতরাং ‘অর্থ’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল জ্ঞানবিষয়ত্ব। অভিপ্রায় হল, যা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যা জ্ঞেয় তাই পদার্থ। এমতাবস্থায় আপত্তি ওঠা অসঙ্গত নয় যে, এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয় তথা যা জ্ঞেয় নয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ অজ্ঞাত বস্তুমাত্রকে পদার্থ বলা কি সঙ্গত হবে? এর উত্তরে আচার্য্যগণ বলেন, সব বস্তু জ্ঞেয় না হলেও, অন্ততঃ জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতা আছে। তা ছাড়া ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ, এ জগতের এমন কোনও কিছুই নেই যা তাঁর জ্ঞানের বিষয় নয়। সব বস্তুই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়েই অবস্থান করে। তাই জ্ঞানবিষয়ত্বই হল পদার্থের লক্ষণ। তদনুরূপ প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্বও পদার্থের লক্ষণ হতে পারে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি শব্দ কেবলান্বয়ী; তার দ্বারা কীভাবে আমরা পদার্থের লক্ষণ করতে পারি? সমস্ত অন্বয় স্থল আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে তো জানা সম্ভব নয়। কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই তা সম্ভব। কাজেই ঈশ্বরের নিকট প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, অভিধেয়ত্ব লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু আমরা কীভাবে প্রমেয়ত্বাদি দ্বারা পদার্থের লক্ষণ বলতে পারি? এর উত্তরে বলা যায়, সসীম মানুষও নিরন্তর যোগাভ্যাসের দ্বারা কেবলান্বয়ী সকল স্থলসমূহের দর্শন করতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, যোগী দু’প্রকার – যুক্ত-যোগী ও যুঞ্জান-যোগী। সমস্ত অন্বয়ী স্থলই যুক্ত-যোগীর জ্ঞানের বিষয় হয়। আর যুঞ্জান-যোগী চেষ্টা করলে যোগাভ্যাসের দ্বারা সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন। কাজেই প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, অভিধেয়ত্ব ইত্যাদি জীব-জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। শিবাদিত্য তাঁর ‘*সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে বলেছেন, ‘প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ’[৪৬]। অর্থাৎ প্রমিতির যা বিষয় হয়, সেটি হল পদার্থ। ‘প্র’ পূর্বক ‘মা’ ধাতুর সঙ্গে ‘ক্তিন্’ প্রত্যয়যোগে ‘প্রমিতি’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান। আর সেই যথার্থ জ্ঞানের যা বিষয় তা হল পদার্থ।

[৪৬] Tarkartirtha, Amarendra Mohan and Narendra Chandra Vedantatirtha (ed.), Sivaditya’s *Saptapadarthi* (with three commentaries), Calcutta, Metropolitan Printing House Limited, 1994, page – 13.

ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন। যদিও বৈশেষিক-দর্শন ন্যায়-দর্শনের তুলনায় বেশ প্রাচীন। এতদ্ সত্ত্বেও বহু দার্শনিকতত্ত্ব উপস্থাপনে উভয়মতের সাম্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় মতেই পরম পুরুষার্থ হল মোক্ষ। উভয় সম্প্রদায়ই মনে করেন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এর মধ্যে অর্থ ও কাম হল প্রেয়ঃ। ধর্মও শ্রেয়ঃ, কিন্তু তা নিত্য না হওয়ায় নিশ্চিত শ্রেয়ঃ নয়; একমাত্র মোক্ষই হল নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তথা নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সম্।) ন্যায়-বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন, মিথ্যা জ্ঞান হল সকল প্রকার দুঃখের কারণ। আর মোক্ষ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। উভয় সম্প্রদায়ই জীবের সংসার-দশা নিবন্ধন যে দুঃখ তার আত্যন্তিক নিবৃত্তির-নিমিত্ত পদার্থের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। যদিও পদার্থ-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়ের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ন্যায়- দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি গৌতম তাঁর '*ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের উল্লেখ করেছেন। তথাপি বৈশেষিক-দর্শনে সপ্ত পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। তবে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে এটা সুস্পষ্ট যে, উভয়ের পদার্থ-বিষয়ক আলোচনার মধ্যে গভীর কোনও বিরোধ নেই। তাই পরবর্তিকালে নব্য-ন্যায়ের প্রবক্তা মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর '*তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থই স্বীকার করেছেন। মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথও তাঁর *'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* তে সপ্ত-পদার্থের সমর্থনে বলেছেন – 'এতে চ পদার্থা বৈশেষিক-প্রসিদ্ধাঃ, নৈয়ায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে'[৪৭]।

ন্যায় পদার্থতত্ত্বঃ

যদিও এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে পদার্থতত্ত্ব'; তথাপি বৈশেষিক-দর্শনের সঙ্গে ন্যায়-দর্শনের সমানতন্ত্রতাবশতঃ এবং প্রামাণ্য শাস্ত্ররূপে ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা সর্বসম্মত হওয়ায়, প্রথমে ন্যায়-দর্শনসম্মত পদার্থতত্ত্বের যৎকিঞ্চিত আলোচনা এখানে সঙ্গত মনে করছি। ন্যায়-দর্শন মোক্ষানুগামী, তাই তাঁদের মতে মোক্ষ বা মুক্তি জীবমাত্রেরই পরম অভিপ্রেত। জীবের সর্ব প্রকার দুঃখ হতে আত্যন্তিক পরিত্রাণের

[৪৭] শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), ভাষা-পরিচ্ছেদঃ, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ,১৪২৩, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮।

উপায়স্বরূপ মহর্ষি গৌতম তাঁর '*ন্যায়সূত্র* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রটির অবতারণা করেছেন। প্রথম সূত্রটি হল – 'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'[৪৮]। অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়মতে পদার্থ ষোল প্রকার, যথা – প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতেই জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তবে এখানে এমন মনে করা যথাযথ হবে না যে ন্যায়মতে পদার্থ ষোল প্রকার। ন্যায়সম্মত মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক পদার্থ যে ষোল প্রকার তা মহর্ষি গৌতমের উক্ত সূত্রের মূল বক্তব্য। এ বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে আস্তিক সম্প্রদায়ের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছি; তবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ সঙ্গত মনে করছি। মহর্ষি গৌতম তাঁর '*ন্যায়সূত্রে* ষোড়শ-পদার্থের উদ্দেশ করলেও তাঁর মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকারই – এমন নয়। তাঁর মতে যা কিছু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ, তাই পদার্থ; এমন অসংখ্য পদার্থ এ জগতে বিদ্যমান। তবে যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান ন্যায়সম্মত মোক্ষলাভের সহায়ক সেই পদার্থ ষোল প্রকার। এখন ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

প্রমাণঃ

ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল **প্রমাণ**। যদিও আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের প্রধান কারণ হয়, তথাপি প্রমাণ-তত্ত্ব ব্যতীত প্রমেয়-তত্ত্বজ্ঞান সম্ভবই না হওয়ায়; *ন্যায়সূত্রে* প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ প্রথমেই করা হয়েছে। 'প্র'পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট' প্রত্যয় যোগে প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট, আর 'মা' ধাতুর অর্থ জ্ঞান। কাজেই 'প্রমা' শব্দটির অর্থ হবে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান আবার স্মৃতি ও অনুভব ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায়, আর স্মৃতি পূর্বানুভব নির্ভর হওয়ায়; ন্যায়মতে যথার্থ অনুভবই প্রমা। আর এই প্রমার করণকেই

[৪৮] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯।

প্রমাণ বলা হয়। *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি'[৪৯] অর্থাৎ ন্যায়মতে প্রমাণ চার প্রকার, যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

ন্যায়মতে, 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'[৫০] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য বিষয়ের তথা অর্থের সন্নিকর্ষের জন্য যে 'অব্যপদেশ্য' তথা অশাব্দ, 'অব্যভিচারী' তথা অভ্রান্ত ও 'ব্যবসায়াত্মক' তথা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলে। কাজেই এস্থলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ হল প্রত্যক্ষ-প্রমার করণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে নব্য-নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই করণ বলেন। অভিপ্রায় এই যে, যে কারণটি ব্যাপারের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে কার্যের জনক হবে, তাই করণ-পদবাচ্য। কিন্তু যে কারণ কোনও ব্যাপারকে অপেক্ষা না করেই কার্য উৎপন্ন করে, তাকে করণ বলা সঙ্গত মনে করেন না। তাই তাঁরা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে অসাধারণ কারণ বা করণ না বলে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ-প্রমার করণ তথা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলেছেন। যেহেতু প্রদত্ত স্থলে ইন্দ্রিয়ই তার গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপারের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষ-প্রমার কারণ হচ্ছে।

ন্যায়মতে অনুমান হল দ্বিতীয় প্রমাণ। 'অনু' মানে পশ্চাৎ বা পরে, আর 'মিতি' মানে জ্ঞান। কাজেই 'অনুমিতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পরবর্তী জ্ঞান। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে কোনও পদার্থকে জানার পর তৎসম্বন্ধী অপর পদার্থের জ্ঞানই হল অনুমিতি। প্রথমে লিঙ্গ দর্শন, তারপর লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ বিষয়ক স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান। এরপর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান; অনন্তর অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান তথা পরামর্শের অব্যবহিত পরক্ষণে অনুমিতিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমুখ প্রাচীন আচার্য পরামর্শকেই অনুমিতির করণ তথা অনুমান-প্রমাণ বলেছেন। যদিও গঙ্গেশোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ প্রমুখ নব্য আচার্য ব্যাপারবিশিষ্টকারণকে করণ মানায়; তাঁরা অনুমিতির প্রতি পরামর্শকে ব্যাপার বলেছেন। আর

[৪৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৩।

[৫০] ঐ, পৃষ্ঠা- ১০৪।

লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ বিষয়ক ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে অনুমিতির কারণ হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির করণ তথা অনুমান-প্রমাণ বলেছেন। ন্যায়মতে এই অনুমান-প্রমাণ পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট ভেদে ত্রিবিধ – 'অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ'[৫১]। যে স্থলে কারণের দ্বারা কার্যকে অনুমান করা হয়, সেই অনুমানকে পূর্ববৎ অনুমান বলা হয়। যেমন – আকাশে মেঘ দেখে আমরা অনেক সময় তার কার্য বৃষ্টিকে অনুমান করি। এটি পূর্ববৎ অনুমানের একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময় আমরা নদীর জলস্ফীতি, প্রবহমান কাঠ-পাতা প্রভৃতি দেখে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে এমন অনুমান করে থাকি। প্রদত্ত স্থলে কার্যকে দেখে তার কারণকে অনুমান করা হচ্ছে। যে স্থলে কার্যের দ্বারা কারণকে অনুমান করা হয়, তাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়। আর পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন যে অনুমান তা হল সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যেখানে অনুমেয় পদার্থ কোনওকালেই প্রত্যক্ষ হয় না; অথচ সেই স্থলে অন্য কোনও পদার্থে অপর কোনও পদার্থের সামান্যতঃ ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করে সেই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান করা হয়। সেই অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়। যেমন, ইচ্ছাদি গুণের দ্বারা তার আশ্রয় আত্মার যে অনুমান তা এই প্রকারের অনুমানের উদাহরণ। ন্যায়মতে আত্মা প্রত্যক্ষগম্য নয়। কাজেই যাতে ইচ্ছাদি গুণ আছে তা আত্মা – এরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু যা গুণ-পদার্থ তা নিশ্চিত কোনও দ্রব্যাশ্রিত; যেমন, রূপাদি গুণ। এরূপ সামান্যতঃ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের দ্বারা ইচ্ছাদি গুণের আশ্রয়রূপে আত্মাকে অনুমান করা হয়। তাই এই প্রকার অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়ে থাকে।

ন্যায়মতে উপমান হল তৃতীয় প্রমাণ। উপমান প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন – 'প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানাং'[৫২] অর্থাৎ কোনও প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের যে নিশ্চয়াত্মক অনুভব, তাকে উপমিতি বলে। আর এই উপমিতির করণকে উপমান-প্রমাণ বলা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার

---

[৫১] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৫০।
[৫২] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৪।

করা যাক – কোনও নগরবাসী ব্যক্তি 'গবয়' নামক প্রাণী দেখেননি। এখন তিনি কোনও অরণ্যবাসী ব্যক্তির কাছে গবয় বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি বলেন – "গবয় গোরু সদৃশ প্রাণী" অর্থাৎ গবয় প্রাণীটি গোরুর মত দেখতে। এখন ঐ নগরবাসী ব্যক্তটি যদি কখনও অরণ্যে গমন করেন এবং গোরুর সদৃশ কোনও প্রাণী দর্শন করেন; তখন তাঁর পূর্বশ্রুত অরণ্যবাসী ব্যক্তিটির 'গবয় গোরু সদৃশ প্রাণী' – এই অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণ হয়। অনন্তর গবয়ত্ববিশিষ্ট প্রাণীটি গবয় পদের বাচ্য এরূপ সংজ্ঞা-সংজ্ঞী সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। একেই উপমিতি বলে। অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণের পরক্ষণেই উপমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে মহর্ষি গৌতম প্রমুখ আচার্য অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণকেই উপমিতির করণ তথা উপমান-প্রমাণ বলেছেন। যদিও গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য আচার্যগণ অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণকে ব্যাপার বলেছেন। আর অদৃষ্ট পশুতে গো সাদৃশ্য ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে উপমিতির কারণ হয় বলে; এই সাদৃশ্য জ্ঞানকেই উপমিতির করণ তথা উপমান-প্রমাণ বলেছেন।

ন্যায়সম্মত চতুর্থ প্রমাণ হল শব্দ। মহর্ষি গৌতম শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে – 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'[৫৩] অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির যে উপদেশ বা বাক্য তা শব্দ-প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি কোনও বিষয়ে যথার্থই জানেন, এখন তিনি চান তাঁর এই জ্ঞান অপর ব্যক্তি জানুক; এই উদ্দেশ্যে তিনি যদি বাক্যপ্রয়োগ করেন, তা হলে তাঁর বাক্যশ্রবণজন্য শ্রোতার যে বোধ উৎপন্ন হয়, তাকে শাব্দবোধ বলে। আর ঐ শাব্দবোধের করণকে শব্দ-প্রমাণ বলা হয়। কাজেই মহর্ষি গৌতম ও তাঁর অনুগামী নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞায়মান তথা উচ্চার্য্যমান আপ্ত বাক্যই শাব্দবোধের করণ বা শব্দপ্রমাণ। কিন্তু জ্ঞায়মান বাক্যকে করণ বললে মৌনী ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি হতে কিংবা লিখিত কোনও লিপি হতে আমাদের যে শাব্দবোধ হয়, তাঁর কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। যেহেতু সেখানে জ্ঞায়মান তথা উচ্চার্য্যমান কোনও পদ থাকে না। তাই পরবর্তিকালে অনেক নৈয়ায়িক জ্ঞায়মান পদকে করণ না বলে পদজ্ঞানকে করণ বলেছেন এবং পদজন্য পদার্থ স্মরণকে ব্যাপার

[৫৩] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯০।

বলেছেন। ন্যায়দর্শনে শব্দ-প্রমাণের বিভাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 'স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ'[৫৪] অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণ দু'প্রকার, যথা – দৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণ ও অদৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণ। যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হয়, তা দৃষ্টার্থক। সমস্ত লৌকিক বাক্যই দৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণ। আর যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকের কোনও প্রমাণ দ্বারাই বোঝা যায় না, তা অদৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণ। সমস্ত বৈদিক্ বাক্যই অদৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। যেমন – 'স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করবেন'। কিন্তু ইহলোকের কোনও প্রমাণ দ্বারাই যাগ যে স্বর্গলাভের উপায় তা বোঝা যায় না। তাই এরূপ বৈদিক্ বাক্যসমূহ অদৃষ্টার্থক শব্দ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রমেয়ঃ

মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ হল **প্রমেয়**। 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট আর 'মেয়' মানে জ্ঞেয়(জ্ঞানের বিষয়)। কাজেই যা প্রকৃষ্টমেয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, যাদের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান ঐ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি ক্রমে মোক্ষের প্রকৃষ্ট কারণ হয়, তাদের প্রমেয় বলেছেন। এই প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞান অনন্যনিরপেক্ষরূপে মোক্ষের জনক হয়। আর প্রমাণাদি পদার্থসমূহ প্রমেয়-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয়ে পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের হেতু হয়। যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে নিঃশ্রেয়সের হেতু হয়, সেই পদার্থসমূহকে মহর্ষি দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন – 'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্'[৫৫] অর্থাৎ ন্যায়মতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ – প্রমেয় এই দ্বাদশ প্রকারের। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ প্রমা-জ্ঞানের যা বিষয় হয় তাকে প্রমেয় বলা হয়; কিন্তু মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত দ্বিতীয় পদার্থ যে 'প্রমেয়' তা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে এ জগতে অসংখ্য প্রমেয় থাকতে পারে তবে যেগুলি 'প্রকৃষ্টমেয়'; অর্থাৎ যাদের তত্ত্বজ্ঞান সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে

---

[৫৪] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯২।
[৫৫] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৭।

মোক্ষের সহায়ক হয়, তাদেরকে বিশেষ অর্থে মহর্ষি 'প্রমেয়' নামে অভিহিত করেছেন। অভিপ্রায় এই যে, দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানজন্য সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে দোষ তার নিবৃত্তি হবে। দোষের নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে প্রবৃত্তি তার নিবৃত্তি হবে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে জন্ম তার নিবৃত্তি হবে। আর জন্ম না থাকে তজ্জন্য যে দুঃখ তার র সম্ভাবনা থাকবে না। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি গৌতম বলেছিলেন – 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ'[৫৬]।

আত্মাঃ মহর্ষি উদ্দিষ্ট দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে প্রথম প্রমেয় হল আত্মা। ন্যায়-দর্শন মোক্ষানুসারী শাস্ত্র হওয়ায় মোক্ষ এবং তার প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ হল এই শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। আর মোক্ষপ্রাপ্তি জীবাত্মারই হয়ে থাকে। তাই মহর্ষি গৌতম প্রমেয়সমূহের মধ্যে আত্মাকে সর্ব প্রথম উদ্দেশ করেছিলেন। যদিও ন্যায়মতে আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। দ্বেষবত্ত্ব, সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব হল জীবাত্মার লক্ষণ। কারণ জীবাত্মাই সকল প্রকার সুখ, দুঃখের দ্রষ্টা (বোদ্ধা) ও ভোক্তা। পরমেশ্বরের কোনওরূপ সুখ, দুঃখাদি নেই। তবে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব – জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। কারণ জীবাত্মা ইচ্ছা, প্রযত্ন, জ্ঞান প্রভৃতি গুণের আশ্রয় হয়। তদনুরূপ পরমাত্মাতেও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন, নিত্য জ্ঞান বিদ্যমান।

শরীরঃ ন্যায়মতে, 'চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্'[৫৭] অর্থাৎ চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় হল শরীর। অভিপ্রায় এই যে, জীবমাত্রই হিত প্রাপ্তির ও অহিত পরিহারের কামনা করে এবং তজ্জন্য প্রযত্ন করে। প্রযত্নবান চেতনের হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের উপায়রূপ যে শারীরিক ক্রিয়া তাকে চেষ্টা বলে। শরীরই ঐ চেষ্টার আশ্রয়। শরীর ইন্দ্রিয়েরও আশ্রয় বা আধার হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হলেও যে কোনও সম্বন্ধে আশ্রয় হয় না। ইন্দ্রিয়ের অবচ্ছেদক হল শরীর, আর অবচ্ছেদ্য হল ইন্দ্রিয়। তাই 'অবচ্ছেদকতা' নামক স্বরূপ-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় শরীররূপ আশ্রয়ে থাকে। যতক্ষণ শরীর থাকে

---

[৫৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৩-৮২।

[৫৭] ঐ, পৃষ্ঠা- ২১২।

ততক্ষণ ইন্দ্রিয় থাকে; শরীর বিনষ্ট হলে ইন্দ্রিয়ও বিনষ্ট হয়। তাই ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বকে শরীরের লক্ষণ বলা হয়েছে। শরীর অর্থেরও আশ্রয় হয়। তবে এখানে 'অর্থ' বলতে দ্বাদশ প্রমেয়ের অন্তর্গত চতুর্থ প্রমেয়কে বোঝানো হয়নি। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা এখানে সুখ ও দুঃখ অভিপ্রেত। আত্মা বিভু, তাই তা সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু কেবল জীবের শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সুখ, দুঃখের অনুভব হয়, জীবশরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয় -- এমন ঘটাত্মা, পটাত্মা প্রভৃতিতে সুখ, দুঃখ জন্মায় না। কাজেই শরীর হল সুখ, দুঃখ এবং তার অনুভবের অবচ্ছেদক। ফলত অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে সুখ ও দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয় হয় শরীর। তাই অর্থাশ্রয়ত্বকেও শরীরের লক্ষণ বলা হয়েছে। এই শরীর ন্যায়মতে দ্বিবিধ – দিব্য ও অদিব্য। দিব্য শরীর আবার তিন প্রকার – জলীয়, তৈজস্ ও বায়বীয়। অদিব্য শরীর আবার যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে দ্বিবিধ। যোনিজ শরীর আবার দুইপ্রকার, যথা - জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। আর অযোনিজ শরীর চার প্রকার, যথা – স্বেদজ, উদ্ভিজ, স্বর্গীয় ও নারকীয়।

ইন্দ্রিয়ঃ ন্যায়স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে তৃতীয় প্রমেয় হল ইন্দ্রিয়। ন্যায়মতে ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান হল শরীর, আর এই ভোগের সাধন হল ইন্দ্রিয়। জীব ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই বাহ্য-জগতের রূপ, রসাদির জ্ঞান লাভ করে। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় দু'প্রকার – বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। প্রদত্ত স্থলে ইন্দ্রিয় বলতে বহিরিন্দ্রিয় সকলকে বোঝানো হয়েছে। ন্যায়মতে বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি, যথা – ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক ও শোত্র ইন্দ্রিয়। মনও ন্যায়সম্মত ইন্দ্রিয় হলেও সমস্ত বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের আবশ্যকতা থাকায়, মনকে পৃথক একপ্রকার প্রমেয় বলা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, বহিরিন্দ্রিয় সকলের দ্বারা জীব বাহ্য-জগতের জাগতিক বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করে থাকে। তবে বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি মনঃসংযোগ ব্যতীত বাহ্য-জগতের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আত্মার সঙ্গে মন, মনের সঙ্গে বাহ্য-ইন্দ্রিয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ ঘটলে তবেই জীবাত্মায় বাহ্য জগত-সম্বন্ধীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই মহর্ষি মনকে পৃথক প্রমেয়ের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।

অর্থঃ ন্যায়মতে 'অর্থ' বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। ন্যায়সম্মত পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের নিজস্ব গ্রাহ্য বিষয় তথা অর্থ বিদ্যমান। যেমন, চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়

হল রূপ; শোত্রেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল শব্দ; নাসিকা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল গন্ধ; রসনা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল রস এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল স্পর্শ। কাজেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ – এগুলিই হল ইন্দ্রিয়ার্থ। তবে এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণে সক্ষম নয়। যেমন, চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় কেবল রূপকে গ্রহণ করে; তা শোত্র-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় শব্দগ্রহণে অক্ষম। তদনুরূপ শোত্রেন্দ্রিয় কেবল শব্দকে গ্রহণ করে; তা রূপাদি গ্রহণে অপারগ।

বুদ্ধিঃ বুদ্ধি হল ন্যায়সম্মত পঞ্চম প্রমেয়। মহর্ষি গৌতম বলেছেন – ‘বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্’[৫৮] অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ হল পর্য্যায়বাচক শব্দ। জ্ঞানার্থক ‘বুধ’ ধাতুর উত্তর ভাবার্থে ‘ক্তিন্’ প্রত্যয় যোগে ‘বুদ্ধি’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে; যার অর্থ জ্ঞান। জীবের যখন কোনও বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন ‘আমি এটি জানছি’ বা ‘আমি এটি উপলব্ধি করছি’ – আত্মায় এরূপ মানস প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কাজেই জ্ঞান ও উপলব্ধি অভিন্ন। এই বুদ্ধি বা জ্ঞান জীবাত্মার আগন্তুক গুণ। ন্যায়মতে বুদ্ধি বা জ্ঞান দু’প্রকার – অনুভব ও স্মৃতি।

মনঃ ন্যায়মতে মন হল ষষ্ঠ প্রমেয়। মহর্ষি গৌতম মনকে ‘অন্তঃকরণ’ বলেছেন। ‘করণ’ শব্দটির অর্থ ইন্দ্রিয়। কাজেই অন্তর ইন্দ্রিয় হল মন। যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরতম যে আত্মা, সেই আত্মার সুখাদি বিশেষ গুণের উপলব্ধি হয়, তাকে অন্তরিন্দ্রিয় তথা মন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মন অণুত্ব-পরিমাণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ অণু। তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয় রূপাদির সন্নিকর্ষ হলেও যুগপৎ রূপ প্রত্যক্ষ বা রস প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়ে যায় না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের গ্রহণ হয়ে থাকে। এই মন প্রত্যেক প্রাণী শরীরে একটি করে থাকে। শরীরের ভিন্নতা হেতু মনও প্রতিটা শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

---

[৫৮] ঐ, পৃষ্ঠা- ২২০।

প্রবৃত্তিঃ মহর্ষি প্রদত্ত সপ্তম প্রমেয় হল প্রবৃত্তি। ধর্ম ও অধর্ম জনক কর্মই প্রবৃত্তি নামক প্রমেয়। ন্যায়মতে শাস্ত্র বিহিত কর্ম, যেমন – যাগ-যজ্ঞাদি; এই সমস্ত কর্মানুষ্ঠান করলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। আর অন্যদিকে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ যে সমস্ত কর্ম, যেমন – হিংসাদি কর্ম করলে অধর্ম উৎপন্ন হয়। মানবের উক্তরূপ শুভ-অশুভ কর্মসমূহকে প্রবৃত্তি বলা হয়েছে। ন্যায়মতে প্রবৃত্তি তিন প্রকার, যথা – কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই কায়িক প্রবৃত্তি আবার হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, দান, রক্ষা ও সেবা ভেদে ছয় প্রকার। ছয় প্রকার কায়িক প্রবৃত্তির প্রথম তিনটি প্রবৃত্তি শুভ, তাই ঐগুলি ধর্মের জনক হয়। আর পরবর্তী তিনটি প্রবৃত্তি অশুভ, তাই ঐগুলি অধর্মের জনক হয়। বাচিক প্রবৃত্তি আবার আট প্রকার, যথা – অসত্য, অহিত, কঠোর, অসম্বন্ধ প্রলাপ, সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রেও প্রথম চারটি প্রবৃত্তি অশুভ প্রবৃত্তি, তাই এসকল হতে পাপ উৎপন্ন হয়। আর পরবর্তী চারটি হল শুভ প্রবৃত্তি, তাই এসকল হতে পুণ্য উৎপন্ন হয়য়। মানস প্রবৃত্তি পরদ্রোহ, পরধনলিপ্সা, নাস্তিকতা, দয়া, অস্পৃহা ও শ্রদ্ধা এই ছয় প্রকার। প্রথম তিনটি শুভ আর পরবর্তী তিনটি অশুভ প্রবৃত্তি। এই শুভাশুভ প্রবৃত্তি সকলের জন্যই সংসারের সমস্ত ব্যবহার সাধিত হয়ে থাকে।

দোষঃ ন্যায়সম্মত অষ্টম প্রমেয় হল দোষ। মহর্ষি গৌতম দোষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রবর্ত্তনা-লক্ষণা দোষাঃ' [৫৯] অর্থাৎ প্রবর্ত্তনা যার লক্ষণ তা হল দোষ। 'প্রবর্ত্তনা' শব্দের অর্থ জনকত্ব। ন্যায়মতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ – এই দোষত্রয় জীবাত্মাকে শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত করে। এই রাগ, দ্বেষ ও মোহতে প্রবৃত্তি জনকত্ব থাকায়; এই তিনটিকে দোষ বলা হয়েছে। 'রাগ' এর অর্থ বিষয়ে আসক্তি বা বিষয় কামনা, 'দ্বেষ' এর অর্থ হল ক্রোধ আর 'মোহ' -এর অর্থ হল মিথ্যাজ্ঞান। এই ত্রিবিধ দোষের জন্যই জীব দুঃখাদিক্লিষ্ট সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদিও এই ত্রিবিধ দোষের মধ্যে মোহই প্রধান। কারণ মোহহীন জীবের রাগ, দ্বেষ থাকে না। আর রাগ, দ্বেষ না থাকলে কারুর সুখজনক বা দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি না থাকলে জন্ম হয় না, আর জন্ম না হলে দুঃখ ভোগের আশঙ্কা থাকে না।

---

[৫৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৭।

প্রেত্যভাবঃ মহর্ষি গৌতম-প্রদত্ত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে প্রেত্যভাব হল নবম প্রমেয়। 'প্র' পূর্বক 'ইণ্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয় যোগে 'প্রেত্ব' শব্দটি এবং 'ভূ' ধাতু হতে 'ভাব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'প্র' পূর্বক 'ইণ্' ধাতুর অর্থ হল মরণ; আর 'ভূ' ধাতুর অর্থ হল উৎপত্তি। কাজেই মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করাকে প্রেত্যভাব বলে। কাজেই এস্থলে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মই হল 'প্রেত্যভাব' শব্দের অর্থ। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, 'প্রেত্যভাবো মৃত্বা পুনর্জ্জন্ম'[৬০]। অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়মতে জীবাত্মা অনাদি কাল হতে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে এবং আবার মৃত্যুবরণ করছে। এই ধারা অনাদি; তবে তা অনন্ত নয়। অপবর্গ লাভের পর এই জন্ম-মৃত্যুর ধারার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। কাজেই মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মার এক জীবকূলের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে মরণের পর পুনরায় অন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বেদনার সঙ্গে সম্বন্ধকেই প্রেত্যভাব বলা হয়। তবে এখানে জন্ম বলতে আত্মার সঙ্গে দেহাদির সম্বন্ধ বিশেষকে বোঝানো হয়েছে। আর মৃত্যু বলতে বিশেষ দেহাদির সঙ্গে আত্মার বিযুক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

ফলঃ 'ফল' হল ন্যায়সম্মত দ্বাদশ প্রমেয়ের অন্তর্গত দশম প্রমেয়। ন্যায়মতে 'ফল' শব্দের অর্থ হল ভোগ। আর ভোগ বলতে বোঝায় সুখ ও দুঃখের সাক্ষাৎ অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ার পরে জীবাত্মাতে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। এরপর মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবাত্মাতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকাররূপ মানস প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ সুখ-দুঃখের উপভোগ হয়। এই সুখ-দুঃখের উপভোগই হল মুখ্য ফল। আর সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগ সাধিত হয় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মাধ্যমেই। তাই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হল সুখ-দুঃখরূপ ফলের সাধন। এহেতু গৌণ অর্থে দেহাদিকেও ফল বলা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম ফলের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রবৃত্তি-দোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্'[৬১] অর্থাৎ যে পদার্থ প্রবৃত্তি ও দোষজনিত, তাকে ফল বলা হয়েছে। 'প্রবৃত্তি' বলতে এখানে ধর্ম ও অধর্মকে বোঝানো

---

[৬০] ঐ, পৃষ্ঠা- ২২৮-২৩০।
[৬১] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩০।

হয়েছে। এই প্রবৃত্তির প্রতি দোষ কারণ হয়। কেবল প্রবৃত্তির প্রতি নয় ধর্ম-অধর্মরূপ প্রবৃত্তি জন্য যে সুখ-দুঃখ, তার প্রতিও দোষ কারণ হয়ে থাকে। তাই ফল কে প্রবৃত্তি ও দোষজন্য বলা হয়েছে। জলে ভেজা বীজ যেমন মাটিতে অঙ্কুর উৎপন্ন করে, তদনুরূপ দোষের দ্বারা সিক্ত প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম আত্মাতে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করে। কাজেই ন্যায়মতে প্রবৃত্তি ও দোষজন্য যে সুখ ও দুঃখ এবং এই সুখ-দুঃখের সাধন যে দেহাদি তাকে ফল বলা হয়েছে।

দুঃখঃ মহর্ষি গৌতম একাদশ প্রমেয় দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাধনা-লক্ষণং দুঃখম্'[৬২] অর্থাৎ বাধনা যার লক্ষণ তাকে দুঃখ বলা হয়। 'বাধনা' শব্দটির অর্থ হল পীড়া বা তাপ, যা সমস্ত জীবেরই প্রতিকূলবেদনীয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বাধনা যার সঙ্গে সম্বদ্ধ তাদেরও গৌণ অর্থে দুঃখ বলেছেন। এই অর্থে শরীরাদি থেকে ফল পর্যন্ত সমস্ত পদার্থই দুঃখানুষক্ত হয়ায় এগুলিকেও ন্যায়দর্শনে দুঃখ নামে অভিহিত করা হয়েছ। ন্যায়মতে সুখও এক প্রকারের দুঃখ। কারণ সুখেও দুঃখানুষঙ্গ রয়েছে। এ জগৎ সংসারে এমন কোনও সুখ নেই যার দুঃখানুষঙ্গ নেই। যেখানে সুখ আছে, সেখানে দুঃখও আছে। এদের মধ্যে অবিনাভাবসম্মন্ধ, একটি অন্যটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তা ছাড়া মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট সুখও দুঃখ হিসাবে উপলব্ধ হয়। কারণ সুখত্বরূপে সুখের জ্ঞান বৈরাগ্যের পরিপন্থী। তাই ন্যায়দর্শনে সুখকেও দুঃখ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক – এই ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হয়েছে। তবে বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন, যথা - জীবের দুঃখের আয়তন শরীর, দুঃখের সাধন ষড় ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন), প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, আত্মার গুণ), ছয় প্রকার বিষয়ের ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ এবং সুখ – এই বিংশতি প্রকার গৌণ দুঃখ এবং মুখ্য দুঃখ। কাজেই ন্যায়মতে মুখ্য দুঃখ এবং মুখ্য দুঃখের সঙ্গে যা কিছু সম্বদ্ধ – সে সমস্তই দুঃখ হিসাবে পরিগণিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সুখ ও দুঃখ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিষয়রূপে উল্লিখিত হলেও স্বতন্ত্রভাবে দুঃখকে প্রমেয়

[৬২] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩২।

হিসাবে উল্লেখ করার কারণ হল, দুঃখকে আমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে। যেহেতু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মুক্তি। কাজেই দুঃখের স্বরূপ না বুঝলে অপবর্গ বা মুক্তির স্বরূপ জানা যাবে না।

অপবর্গঃ দ্বাদশ প্রমেয়ের অন্তিম প্রমেয় হল অপবর্গ বা মোক্ষ। যা জীবমাত্রেরই পরম কাম্য। মোক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন, 'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ'[৬৩]। 'তদ' বলতে দুঃখাদি সকলকে বোঝানো হয়েছে, আর 'বিমোক্ষ' মানে বিমুক্তি। কাজেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ বা মোক্ষ। প্রলয়কালে কিংবা সুষুপ্তিকালে জীবের দুঃখ-মুক্তি ঘটে, কিন্তু তা মোক্ষ নয়। কারণ প্রলয়কালে কিংবা সুষুপ্তিকালে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়, তা আত্যন্তিক দুঃখ-বিমুক্তি নয়। কিন্তু অপবর্গ বা মোক্ষ হল এমন অবস্থা যেখানে কোনও প্রকার দুঃখের অনুভূতি থাকে না। শুধু তাই নয়, মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়ে গেলে নতুন করে দুঃখ উৎপন্ন হওয়ার কোনওরূপ সম্ভাবনাই থাকে না। যখন প্রলয় ঘটে তখন জীবের দুঃখের আপাত অবসান ঘটলেও, পরে যখন পুনরায় সৃষ্টি হয় তখন শুভাশুভ অদৃষ্ট অনুসারে সেই সমস্ত জীব পুনরায় দেহাদি পরিগ্রহণ করে। ফলস্বরূপ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু অপবর্গ হলে আর পুনর্জন্মের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, তাই আর কখনও দুঃখ ভোগ হতেই পারে না। কাজেই সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদই হল অপবর্গ।

সংশয়ঃ

যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের সহযোগী, সেগুলির মধ্যে তৃতীয় পদার্থ হল **সংশয়**। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সংশয় হতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ হয় প্রমাণ অথবা প্রমেয়-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত, তা হলে মহর্ষি গৌতম কেন প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থ অতিরিক্ত সংশয়াদি পদার্থের আলোচনা করেছেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন, ভারতীয়-দর্শনের ইতিহাসে ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী – এই

[৬৩] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩৩-২৩৭।

চারটি বিদ্যা সুপ্রসিদ্ধ। কারণ, এগুলি মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তই উপদিষ্ট হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যার নিজস্ব কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় রয়েছে, যা তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করে, যেমন - অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞাদি বিষয়ক আলোচনা ত্রয়ী বিদ্যার মূল প্রস্থান, হলশকটাদি চাষ-আবাদ সংক্রান্ত বিষয় হল বার্ত্তা বিদ্যার মূল প্রস্থান, তেমনই রাজা-আমাত্য প্রভৃতি রাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কীয় বিষয় দণ্ডনীতির মূল প্রস্থান। অনুরূপভাবে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মূল প্রতিপাদ্য হল সংশয়াদি পদার্থসমূহ। তাই সংশয় হতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত চতুর্দশ পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য, তা না হলে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হবে।

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থের পরই কেন সংশয় পদার্থের আলোচনা করা হল? এর উত্তরে বলা হয়, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়-পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে সংশয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। তাই প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থের পরই সংশয় পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, বিপ্রতিপন্ন (যিনি অন্য পক্ষ সমর্থন করেন) পুরুষের নিকট কোনও তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে হলে বিচার আবশ্যক। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মধ্যস্থ ব্যক্তির কোনও এক পক্ষ-নিশ্চয়ে সংশয় দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় নিরসনে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব-পক্ষ স্থাপনায় এবং পরপক্ষ-খণ্ডনের নিমিত্ত ন্যায়প্রয়োগ করে থাকেন। তাই সংশয়কে ন্যায়ের পূর্বাঙ্গ বলা হয়েছে। যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত সেই বিষয়ে ন্যায়-প্রয়োগ হয় না। আবার যে বিষয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ যে পদার্থের নির্ণয় হয়ে গেছে সে বিষয়কে প্রতিপাদন করতেও ন্যায়ের প্রয়োগ হয় না। কাজেই যে পদার্থ সামান্যত জ্ঞাত কিন্তু বিশেষত অজ্ঞাত সেই বিষয়েই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই সামান্যত জ্ঞাত এবং বিশেষত অজ্ঞাতরূপ যে জ্ঞান তাকে সংশয় বলে।

মহর্ষি গৌতম সংশয়ের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে - 'সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্ব্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ'[৬৪]। 'বি' শব্দের অর্থ হল বিরোধ, আর 'মৃশ' ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। কাজেই 'বিমর্শ' শব্দের

[৬৪] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫০।

অর্থ হল নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই ধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ ধর্মপ্রকারক জ্ঞানকেই সংশয় বলে। যেমন, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' অর্থাৎ এটি স্থাণু অথবা পুরুষ – এরূপ সংশয় স্থলে ইদং তথা সম্মুখস্থ বস্তুটি হল বিশেষ্য। আর স্থাণুত্ব এবং পুরুষত্ব ঐ মুখ্য বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়েছে। উক্ত ধর্ম দু'টি পরস্পরের বিরুদ্ধধর্ম। কারণ কোনও ধর্মীতে স্থাণুত্ব থাকলে পুরুষত্ব থাকতে পারবে না, অনুরূপভাবে পুরুষত্ব থাকলে স্থাণুত্ব থাকবে না। তাই সংশয়কে একধর্মীবিশেষ্যক নানা বিরুদ্ধধর্মপ্রকারক জ্ঞান বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীনমতে সংশয় হল বিরুদ্ধভাবকোটিক। তবে নব্যমতে সংশয় বিরুদ্ধ ভাবাভাবকোটিক। তাঁদের মতে সংশয়ের আকার হল- 'অয়ং স্থাণুর্ন বা, অয়ং পুরুষো ন বা'।

উদাহরণের সাহায্যে উক্ত পাঁচ প্রকার সংশয়কে বোঝা যাক -- ন্যায়মতে সংশয় পাঁচ প্রকার, যথা – সমানধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়। কোনও ব্যক্তি যখন আবছা অন্ধকারে দণ্ডায়মান লম্বাকৃতি কোনও বস্তু দর্শন করে, তখন সম্মুখস্থ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে এবং স্থাণুত্বের নিশ্চায়ক বল্কল-কোটরাদি কিংবা পুরুষত্বের নিশ্চায়ক হস্ত-পদাদি বিশেষ ধর্মের দর্শন না হলে, কেবল তাদের সাধারণ বা সমান ধর্ম উচ্চতা, আকৃতি, স্থিরত্ব প্রভৃতি দর্শন জন্য 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ' এরূপ বোধ হয়। এটিই হল প্রথম প্রকারের সংশয় তথা সমানধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়। একই রকমভাবে অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্যও সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মায়। অসাধারণ ধর্ম হল এমন যা কোনও পদার্থকে তার স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পদার্থ-সকল হতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করে। যেমন, শব্দত্ব হল শব্দের অসাধারণ ধর্ম। কারণ তা শব্দকে অন্যান্য নিত্য ও অনিত্য পদার্থ হতে ভিন্ন করে। এখন শব্দত্ব যেহেতু নিত্য আত্মাদিতে থাকে না, তদনুরূপ অনিত্য ঘটাদিতেও থাকে না। কেবলমাত্র শব্দেই নিশ্চিতভাবে থাকে। এমতাবস্থায় শব্দে শব্দত্বরূপ অসাধারণ ধর্মের জ্ঞান হতে 'শব্দ নিত্য না অনিত্য' এরূপ সংশয় জন্মায়। এরূপ সংশয়কেই অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয় বলা হয়েছে।

তৃতীয় প্রকারের সংশয় হল বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়। একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ পদার্থ বোধক বাক্যদ্বয়কে 'বিপ্রতিপত্তি' বলে। এরূপ বাক্য হতে যে সংশয় উৎপন্ন হয় তাকে বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয় বলা হয়। যেমন, বাদী (মীমাংসক) বললেন – 'শব্দ নিত্য'; প্রতবাদী (নৈয়ায়িক) বললেন – 'শব্দ অনিত্য'। কিন্তু একই ধর্মীতে (শব্দে) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব থাকতে পারে না। এখন এই দুই পক্ষের বিরুদ্ধ পদার্থ বোধক বাক্য শ্রবণ করে মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় হতে পারে – 'শব্দ নিত্য না অনিত্য'। এরূপ যে সংশয় তা ন্যায়সম্মত তৃতীয় প্রকারের সংশয়। মহর্ষি গৌতমসম্মত চতুর্থ প্রকার সংশয় হল উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়। উপলব্ধির অব্যবস্থা বলতে বোঝায় উপলব্ধির নিয়মের অভাব। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যমান পদার্থের যে সবসময় উপলব্ধি হয় – এমন কোনও নিয়ম নেই। আমরা জানি পুষ্করিণী আদিতে জলের উপলব্ধি হয়, কারণ সেখানে জল বিদ্যমান। আবার যেখানে জল অবিদ্যমান, যেমন – মরীচিকা স্থলে, জল না থাকলেও আমাদের জলের উপলব্ধি হয়। ফলত উপলব্ধির নিয়মের অব্যবস্থা জন্য 'সর্বত্রই বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় অথবা অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয়' এরূপ যে সংশয় তা মহর্ষি-সম্মত চতুর্থ প্রকারের সংশয়। অনুরূপভাবে যা নেই তারই কেবল অনুপলব্ধি হয় – এমনও কোনও নিয়ম নেই। যেমন, ঘরের মেঝেতে জল নেই, কাজেই মেঝেতে জলের অনুপলব্ধি হয়। কিন্তু ভূগর্ভের মধ্যে কিংবা অনাবিষ্কৃত কোনও গ্রহে জল বিদ্যমান। অথচ আমাদের নিকট তার অনুপলব্ধি হয়ে থাকে। এরূপ স্থলে অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য ব্যক্তির সংশয় উৎপন্ন হয় 'যা অবিদ্যমান তারই অনুপলব্ধি হয় অথবা বিদ্যমান বস্তুর অনুপলব্ধি হয়'। এরূপ সংশয়কে মহর্ষি অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় বলেছেন।

প্রয়োজনঃ

ন্যায়সম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে **প্রয়োজন** হল চতুর্থ পদার্থ। যে পদার্থের জন্য জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাকে প্রয়োজন বলা হয়েছে। প্রয়োজন ব্যতীত কোনও জীবই কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। বিচারস্থলে বাদীর নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিবাদী বিরোধী মতের স্থাপনা করলে মধ্যস্থ ব্যক্তির বাদীর সিদ্ধান্ত বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হতে

পারে, সেই সংশয়কে নিবৃত্ত করার জন্যই বাদী ন্যায়-প্রয়োগ করবেন। কাজেই বিচারস্থলেও প্রয়োজন ব্যতীত ন্যায়ের প্রয়োগ হয় না। তাই প্রয়োজন পদার্থটিও সংশয় পদার্থের ন্যায় ন্যায়ের পূর্বাঙ্গ। এহেতু মহর্ষি গৌতম বিচারের সহায়করূপে প্রয়োজন পদার্থটির পৃথক উদ্দেশ করেছেন। তিনি 'প্রয়োজন' পদার্থটির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্'[৬৫] অর্থাৎ যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য রূপে নিশ্চয় করে জীব কর্মে (প্রাপ্তি ও পরিত্যাগের) উপায়ে প্রবৃত্ত হয় তাকে প্রয়োজন বলে। ন্যায়মতে প্রয়োজন দ্বিবিধ – মুখ্য প্রয়োজন ও গৌণ প্রয়োজন। যে সমস্ত বিষয়ে জীব স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রবৃত্ত হয় তাকে মুখ্য প্রয়োজন বলে। যেমন, সুখ-প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার। প্রতিটি জীবই সুখকে কামনা করে এবং দুঃখকে বর্জন করতে বাসনা করেন। (যদিও মুমুক্ষু ব্যক্তি সুখ-দুঃখ বিষয়ে সমমনোভাবাপন্ন হওয়ায় তথা সুখকেও দুঃখ মনে করায়; এই উভয়কেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ত্যাগ করার ইচ্ছা করে থাকেন এবং তদনুসারে প্রবৃত্ত হন। তাই এই সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহারকে মুখ্য প্রয়োজন বলা হয়েছে। আর ঐ সুখ-প্রাপ্তি এবং দুঃখ-পরিহারের যে সমস্ত উপায়, যেমন – কেউ নতুন ঘর বানিয়ে, আবার কেউ নতুন গাড়ি ক্রয় করে কিংবা কেউ অর্থ সঞ্চয় করে; সুখ পান। কাজেই এসমস্তই সুখপ্রাপ্তির উপায়। তদনুরূপ যখন কোনও ব্যক্তি তীব্র যন্ত্রনায় কাতর হন, তখন ঔষধ গ্রহণ করেন। কাজেই এই ঔষধ গ্রহণ হল উক্তরূপ দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায়। এই উপায়সমূহকে গৌণ অর্থে প্রয়োজন বলা হয়েছে।

দৃষ্টান্তঃ

ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত পঞ্চম পদার্থ হল **দৃষ্টান্ত**। দৃষ্টান্ত পদার্থ ব্যতিরেকে বিচারস্থলে পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। যেহেতু দৃষ্টান্ত পদার্থই উদাহরণ বাক্যের বক্তব্যকে পরিষ্কৃত করে। তাই বিচারের সহায়করূপে দৃষ্টান্ত পদার্থটির স্বরূপ জানা আবশ্যক। বিচার স্থলে যখন প্রতিবাদী অপরপক্ষ-খণ্ডনের নিমিত্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করবেন, তখন সেই দৃষ্টান্ত যে বিরুদ্ধ তা প্রদর্শন করে প্রতিবাদীর মত খণ্ডন-পূর্বক বাদী নিজ

[৬৫] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৪।

দৃষ্টান্তের অবিরোধ প্রদর্শন করে নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করবেন। এর নিমিত্ত দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ জানা আবশ্যক। মহর্ষি গৌতম দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ'[৬৬]। অর্থাৎ যে পদার্থে লৌকিক(বোধয়িতা) এবং শাস্ত্রজ্ঞ(বোদ্ধা) পুরুষের বুদ্ধির সাম্য থাকে তাকে দৃষ্টান্ত পদার্থ বলে। অভিপ্রায় এই যে, বিচারস্থলে যে পদার্থটি বোদ্ধা এবং বোধয়িতা উভয়ের নিকট প্রমাণসিদ্ধ অর্থাৎ উভয়েই স্বীকার করেন, তাকেই দৃষ্টান্ত বলা হয়। যেমন, শব্দ অনিত্য যেহেতু তা উৎপন্ন হয়, যেমন – ঘট; প্রদত্ত স্থলে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন করা হচ্ছে উৎপত্তিমত্ব হেতুর সাহায্যে এবং সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ঘট উৎপন্ন হয় বলে যে অনিত্য তা লৌকিক কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ সকল পুরুষই স্বীকার করেন। কাজেই বিচারস্থলে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিবর্গের যাতে বুদ্ধিসাম্য আছে তথা যা সবার নিকট স্বীকৃত, এমন পদার্থকেই দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। ন্যায়মতে দৃষ্টান্ত দু'প্রকার, যথা – সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত। পর্বতে ধুম দর্শন করে আগুনের অনুমানের ক্ষেত্রে 'মহানস' হবে সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত। কারণ মহানসে ধূম ও আগুনের অন্বয়-সহচার নিশ্চয় হয়। আবার ঐ একই অনুমিতি স্থলে 'জলহ্রদ' হবে বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত। কারণ জলহ্রদে আগুন ও ধূমর ব্যতিরেক সহচার নিশ্চয় হয়।

সিদ্ধান্তঃ

ন্যায়মতে **সিদ্ধান্ত** হল ষষ্ঠ পদার্থ। আমরা জানি, বাদী কিংবা প্রতিবাদী কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যই বিচারে প্রবৃত্ত হন। কাজেই বিচারের ফল হল সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠা। তাই বিচারস্থলে সিদ্ধান্তরূপ পদার্থটি অবশ্য স্বীকার্য। মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ'[৬৭]। 'তন্ত্র' তথা শাস্ত্র যার অধিকরণ এবং যাকে নিশ্চিতরূপে স্বীকার করা হয় তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। অর্থাৎ যা শাস্ত্র দ্বারা বোধিত এবং নিশ্চিত রূপে স্বীকৃত তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্তকে

---

[৬৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৬।
[৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৯।

চারভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা – সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাকে সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। যেমন – চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, পৃথ্বীব্যাদির ভূতত্ব প্রভৃতি হল সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ তা সমস্ত শাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং স্বীকৃত। অপরদিকে প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব নিজস্ব যে সিদ্ধান্ত, যা একের দ্বারা স্বীকৃত হলেও অন্যের দ্বারা অস্বীকৃত সেগুলিকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। যেমন – নৈয়ায়িকগণ বেদকে পৌরুষেয় বলেন কিন্তু মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদকে অপৌরুষেয় বলেন। কাজেই বেদের পৌরুষেয়ত্ব ন্যায় সম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, যা মীমাংসক কর্তৃক সমালোচিত। আবার বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মীমাংসক সম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, যা নৈয়ায়িক কর্তৃক সমালোচিত। মহর্ষিসম্মত তৃতীয় প্রকারের সিদ্ধান্ত হল অধিকরণ সিদ্ধান্ত। একটি পদার্থের সিদ্ধি হলে যদি আনুষঙ্গিকরূপে অন্য পদার্থেরও সিদ্ধি হয়ে যায়, তা হলে সেই অন্য পদার্থটিকে অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়ে যায় তাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলে। যেমন – সৃষ্টির প্রথম ক্ষণের দ্ব্যণুকটিও সকর্তৃক যেহেতু তাতে কার্যত্ব আছে, যেমন – ঘট। এরূপ অনুমানের দ্বারা দ্ব্যণুকরূপ দ্রব্যে কর্তৃজন্যত্ব অর্থাৎ 'কর্তা দ্বারা উৎপন্ন' সিদ্ধ হলে, সেই কর্তা যে সর্বজ্ঞ হবেন, তাও সিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ দ্ব্যণুক-এর উপাদান কারণ হল পরমাণু। আর এই পরমাণু অতীন্দ্রিয়। আর এরূপ অতীন্দ্রিয় পরমাণু প্রত্যক্ষ করতে যিনি সক্ষম, তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আমাদের মত সীমিত মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় পরমাণু প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হবে না। এভাবে দ্ব্যণুকের সকর্তৃকত্ব সিদ্ধ করতে গেলে আনুষঙ্গিকভাবে সেই কর্তার সর্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হয়ে যায়। তাই 'জগৎকর্তা হলেন সর্বজ্ঞ' এই সিদ্ধান্তটিকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলা হয়। যেহেতু এই সিদ্ধান্তটিকে স্বীকার করলে তবেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটির সিদ্ধি সম্ভব হয়। ন্যায়মতে চতুর্থ প্রকার সিদ্ধান্ত হল 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত'। 'অভ্যুপগম' শব্দটির অর্থ হল 'মেনে নেওয়া'। বাদী মীমাংসক মতে শব্দ হল দ্রব্য এবং তা নিত্য। যেহেতু তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। আর যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় তা দ্রব্যই হয়। তা নিত্য, কারণ বক্তার উচ্চারিত শব্দ কর্ণের

মাধ্যমেই সরাসরি গৃহীত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অপর কোনও ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। এখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক মত আপাতভাবে মেনে নিয়ে যদি বলেন 'শব্দ দ্রব্য এটা মেনে নিলাম' কিন্তু তা কি নিত্য না অনিত্য এটাই পরীক্ষার বিষয়। একেই বলে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। কোনও ধর্মীতে প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা বিচারপূর্বক অনির্ণীত কোনও সিদ্ধান্তকে আপাতভাবে মেনে নিয়ে সেই ধর্মীর অপর বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা বা বিচার হল অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

অবয়বঃ

মহর্ষি উল্লিখিত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত সপ্তম পদার্থ হল **অবয়ব**। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনে যখন মধ্যস্থ ব্যক্তির বিবদমান পদার্থ-বিষয়ে সংশয় উপস্থাপিত হয় তখন একপক্ষ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্চ-অবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়-প্রয়োগ করা হয়; তথা নিজ মতের সাধক প্রমাণ প্রযুক্ত বাক্যসমূহ প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের অন্তর্গত এই বাক্যসমূহকে অবয়ব বলা হয়। বিচারব্যবস্থা এই পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়ের অধীন। তাই বিচারের ক্ষেত্রে আবশ্যকরূপে অবয়ব পদার্থের আলোচনা আবশ্যক। মূল কথা হল, বিচারস্থলে কোনও তত্ত্বকে সর্ব সমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ন্যায়-প্রয়োগ আবশ্যক। আর ন্যায় হল প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বের সমষ্টি। কাজেই তত্ত্বনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যকরূপে অবয়ব পদার্থের স্বরূপ জানা আবশ্যক। যদিও এটা ঠিক যে, কোনও ব্যক্তি যখন নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের নিমিত্ত অনুমান করেন তখন পঞ্চ-অবয়ব প্রযুক্ত ন্যায় প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে না। যেহেতু নিজ তত্ত্ব নিশ্চয় স্থলে অপর কোনও ব্যক্তি থাকে না। তাই তাঁর সংশয় নিবৃত্তির-নিমিত্ত পঞ্চ-অবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়-প্রয়োগ অনাবশ্যক। কেবলমাত্র বিবদমান বিচারস্থলেই উক্ত পঞ্চাবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে থাকে।

মহর্ষি গৌতম অবয়ব পদার্থের নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ'[৬৮]। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন – এই পাঁচটি হল পঞ্চাবয়বী নায়ের পাঁচটি অবয়ব। এদের মধ্যে প্রথম অবয়ব

[৬৮] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮৭।

হল প্রতিজ্ঞা। ন্যায়মতে সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকে বোঝাতে যে বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন, পর্বতে ধূম দেখে আগুনের অনুমানের ক্ষেত্রে সাধনীয় ধর্ম বা অনুমেয় হল অগ্নি। আর অগ্নিবিশিষ্ট ধর্মী হল পর্বত। কাজেই বিচারস্থলে বাদী পর্বতে অগ্নিকে প্রতিপাদন করার জন্য যখন বলেন 'পর্বতঃ অগ্নিমান্' তখন প্রদত্ত বাক্যটিকে 'প্রতিজ্ঞাবাক্য' বলা হয়। মূল কথা হল পক্ষটি যে সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট এরূপ বোঝাতে যে বাক্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে তাকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব হল হেতুবাক্য। পক্ষে সাধ্যকে সাধন করতে হলে যথোপযুক্ত হেতু প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই পক্ষে সাধনীয় পদার্থকে সাধন করতে যে লিঙ্গ বা হেতু প্রয়োগ করা হবে, তার বোধক বাক্যই হল হেতুবাক্য। উপর্যুক্ত উদাহরণে হেতু হল ধূম। যেহেতু ধূমকে দেখেই পর্বতে অগ্নির অনুমান করা হচ্ছে। এখন পর্বতে যে আগুন আছে; তার হেতু দেখাতে গিয়ে বাদী যখন বলেন 'ধূমাৎ' অর্থাৎ যেহেতু পর্বতে ধূম আছে; তখন এরূপ হেতুবোধক বাক্যকে হেতুবাক্য বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ন্যায়মতে হেতু দু'প্রকার – সাধর্ম্য হেতু এবং বৈধর্ম্য হেতু। উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের সঙ্গে সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধনকে সাধর্ম্যহেতু আর উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৈধর্ম্য প্রযুক্ত সাধ্যের সাধনকে বৈধর্ম্য হেতু বলা হয়। সাধর্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্য হেতু ভেদে হেতু দ্বিবিধ হওয়ায় হেতুবাক্যও দ্বিবিধ – সাধর্ম্য হেতুবাক্য ও বৈধর্ম্য হেতুবাক্য। ন্যায়সম্মত তৃতীয় অবয়ব বাক্য হল 'উদাহরণ'। যে বাক্যের দ্বারা হেতু পদার্থ ও অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোধিত হয় তাকে উদাহরণ বাক্য বলে। যেমন - যেখানে যেখানে হেতু (ধূম) পদার্থ থাকে সেখানে সেখানে অনুমেয় (অগ্নি) পদার্থ থাকে, যেমন – পাকশালা; আবার যেখানে যেখান অনুমেয় (অগ্নি) পদার্থ থাকে না সেখানে সেখানে হেতু (ধূম) পদার্থ থাকে না, যেমন – জলহ্রদ; এরূপ অন্বয় কিংবা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত বোধক বাক্য, যে বাক্যে হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (অগ্নির) ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ বোধিত হয় তাকে উদাহরণবাক্য বলে। উদাহরণের পর চতুর্থ অবয়ববাক্য হল উপনয়। উদাহরণবাক্যে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতু প্রতিপাদিত হয়েছে সেই হেতুর পক্ষবৃত্তিত্ববোধক বাক্য; তথা সাধ্য(অগ্নি) ব্যাপ্য হেতুমান (ধূমবান) পক্ষঃ

(পর্বতঃ) – এরূপ বাক্যকে উপনয় বাক্য বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উদাহরণের দ্বিবিধত্ব বশতঃ উপনয়বাক্য ও দ্বিবিধ – সাধর্ম্য উপনয় ও বৈধর্ম্য উপনয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের সর্বশেষ অবয়ব হল নিগমন। যে বাক্যে হেতুবাক্যের উল্লেখ পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনরায় প্রয়োগ করা হয়, সেই বাক্যকে নিগমনবাক্য বলে। পর্বতে ধূম দেখে আগুনের অনুমান স্থলে 'তস্মাৎ পর্বতঃ অগ্নিমান্" এরূপ বাক্যটি হল নিগমনবাক্য। অভিপ্রায় এই যে, হেতুবাক্যে যে হেতুর (ধূম) উল্লেখ করা হয়েছে, যে হেতুটি সাধ্যের(অগ্নির) ব্যাপ্তিবিশিষ্ট; সেই হেতু সাধ্যধর্মীতে (পর্বতে) বিদ্যমান। কাজেই সেখানে (পর্বতে) সাধ্যধর্ম (অগ্নি) অবশ্যই বিদ্যমান। এখানে প্রশ্ন হতে পারে 'প্রতিজ্ঞার পুনর্বচন' যদি নিগমনবাক্য হয় তা হলে তাকে পঞ্চম অবয়বরূপে উল্লেখের প্রয়োজন কি? এর উত্তরে বলা হয় প্রতিজ্ঞাবাক্যে যা সাধ্যরূপে বোধিত হয়, নিগমন বাক্যে তা সিদ্ধরূপে বোধিত হয়। মূল কথা হল, প্রতিজ্ঞাবাক্যে পক্ষে সাধ্য ধর্মটি বিদ্যমান তা ঘোষিত, আর নিগমনবাক্যে পক্ষে সাধ্য ধর্মটি যে বিদ্যমান তা প্রতিপাদিত।

তর্কঃ

মহর্ষি-সম্মত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে অষ্টম পদার্থ হল **তর্ক**। সাধারণ অর্থে তর্ক বলতে বিতর্ক, বাদানুবাদ, বচসা প্রভৃতি বোঝায়। কিন্তু ন্যায়দর্শনে 'তর্ক' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে(প্রমাণের সহকারী জ্ঞানবিশেষ) প্রয়োগ করা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম তর্কের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ'[৬৯]। অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত কিন্তু তার তত্ত্ব অবিজ্ঞাত; এমন পদার্থ-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত কারণের(প্রমাণের) উপপত্তি(সম্ভব) প্রযুক্ত 'উহ'(জ্ঞান বিশেষ) হল তর্ক। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক – আত্মা বিষয়ে সামান্যতঃ জানলেও আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানব এমন জিজ্ঞাসা জন্মালে আত্মা নিত্য না অনিত্য? এরূপ সংশয় জন্মায়। এরূপ সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত তর্ক প্রযুক্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যদি অনিত্য হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল হয় তা হলে তার সংসার-অপবর্গ ইত্যাদি সম্ভব হবে না। কারণ

[৬৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৪৪।

ন্যায়মতে জীবাত্মার পূর্বার্জিত শুভাশুভ কর্মের ফল অনুযায়ী নতুন দেহের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়। আবার দ্বাদশ প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞান জন্য মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে, মিথ্যাজ্ঞান জন্য দোষের নিবৃত্তি হয়, দোষ বিনাশপ্রাপ্ত হলে দোষজন্য প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি জন্য জন্ম, জন্ম জন্য দুঃখাদির বিনাশ ঘটে। এভাবে জীব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ অপবর্গ লাভ করে। কিন্তু আত্মা যদি উৎপত্তিধর্মক হয় তা হলে উৎপত্তিকালে নতুন আত্মারই উৎপত্তি হবে, পূর্বে তার সত্তা না থাকায় তার স্বকৃত কর্মজন্য যে দেহাদিধারণ তথা সংসারদশা প্রাপ্তি তা সম্ভব হবে না। আর সংসারের দুঃখ-কষ্টাদি না থাকলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও সম্ভাবনা নেই। এরূপ তর্কের দ্বারাই আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটে।

উদয়নাচার্য প্রমুখ আচার্যগণ অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলেন। যা কারুর ইষ্ট নয় অর্থাৎ যা প্রমাণ দ্বারা বাধিত, তাকে অনিষ্ট পদার্থ বলা হয়। আর এরূপ অনিষ্ট পদার্থের আপত্তি বা আরোপরূপ যে জ্ঞান, তা হল তর্ক পদার্থ। ন্যায়মতে অনিষ্ট দু'প্রকার – প্রামাণিক পদার্থের পরিত্যাগ এবং অপ্রাসঙ্গিক পদার্থের স্বীকার। যেমন – কেউ বললেন 'জলপান পিপাসার নিবর্তক নয়'; কিন্তু জলপান করলে যে পিপাসা নিবারিত হয় তা সর্বসম্মত। এরূপ অনিষ্ট হল প্রথম প্রকারের অনিষ্ট। এরূপ অনিষ্টের আপত্তিরূপ তর্কটি হবে – জল যদি পিপাসিত ব্যক্তির পিপাসার উপশম না করত তা হলে পিপাসু ব্যক্তি জলপান করত না। কাজেই প্রমাণিত হয় যে জলপান পিপাসার নিবর্তক। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলেন, 'জলপান অন্তর্দাহ উৎপন্ন করে'। কিন্তু জলপানে কারুর অন্তর্দাহ উৎপন্ন হয় না এটা প্রমাণসিদ্ধ। কাজেই এস্থলে অপ্রামাণিক পদার্থের স্বীকাররূপ অনিষ্ট প্রদর্শিত হয়েছে। এরূপ অনিষ্টের আপত্তিরূপ তর্কটি হবে – যদি জলপান করলে অন্তর্দাহ উৎপন্ন হয়, তা হলে আমি যে জলপান করি তাও আমাকে দগ্ধ করত। কিন্তু তা করে না। কাজেই প্রমাণিত হয় যে জল অন্তর্দাহ উৎপন্ন করে না।

কোনও কোনও আচার্য তর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ'। যেখানে ব্যাপক পদার্থ নেই সেখানে ব্যাপ্য পদার্থের আরোপের দ্বারা ব্যাপক

পদার্থের আরোপকে তর্ক বলে। যেমন, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপক পদার্থ। ব্যাপ্য যেখানে থাকে ব্যাপক পদার্থও সেখানে থাকবে। যেমন – যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি। এখন যদি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি নাও থাকতে পারে। প্রদত্ত স্থলে উক্ত সংশয় নিরসনের জন্য তর্কের প্রয়োগ করতে হয়। ব্যাপক পদার্থ বহ্নি যেখানে থাকে না, যেমন – জলহ্রদ; সেখানে যদি ধূম থাকে তা হলে বহ্নি থাকুক। এরূপ যে আপত্তি তাকে তর্ক বলে।

নির্ণয়ঃ

ন্যায়সম্মত নবম পদার্থ হল **নির্ণয়**। মহর্ষি গৌতম নির্ণয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ'[৭০] অর্থাৎ বিমৃশ্য তথা সংশয়ের পর পক্ষ তথা বাদী এবং বিপক্ষ তথা প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন এবং পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের যে অবধারণ তাকে নির্ণয় বলে। অভিপ্রায় এই যে, বাদী এবং প্রতিবাদীর নিজ নিজ পক্ষ বিষয়ে নিশ্চয় থাকলে সেই বিষয়ে মধ্যস্থগণের সংশয় উৎপন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে মধ্যস্থগণের সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত বাদী এবং প্রতিবাদী নিজ পক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ মধ্যস্থগণের কোনও একতর পক্ষ বিষয়ে নিশ্চয় উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোনও একপক্ষকে অনুমোদন করতে পারেন না। এমতাবস্থায় মধ্যস্থগণের সংশয়ের পর বাদী ও প্রতিবাদীর সপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা মধ্যস্থগণের একতর পক্ষের অবধারণ হয়, একেই নির্ণয় পদার্থ বলে। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্ণয় মাত্রই কোনও মধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের সংশয়জন্য – এমনটা বলা যায় না। কারণ জিগীষাশূন্য কোনও গুরু এবং শিষ্য বাদী ও প্রতিবাদী হয়ে যখন কোনও বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে 'বাদ' কথায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁদের মধ্যে কোনও মধ্যস্থের আবশ্যকতা থাকে না। ফলত 'বাদ' কথার দ্বারা যে তত্ত্বনির্ণয় হয় তা সংশয়পূর্বক নয়। তাই অর্থের অবধারণকেই অর্থাৎ যে কোনও প্রমাণ দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়কেই নির্ণয় বলা হয়েছে।

---

[৭০] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৫৮।

বাদঃ

ন্যায়বিচার তিনপ্রকার – বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। এই তিনটিকে একত্রে 'কথা' বলা হয়েছে। 'কথা' -এর লক্ষণ প্রসঙ্গে '*তার্কিকরক্ষা*'কার বরদরাজ বলেছেন – 'বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ' অর্থাৎ বিচার্য বিষয়ে নানা বক্তৃক যে বাক্যসমূহ, তাকে 'কথা' বলা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তিরূপ যে বাক্যসমূহ তা হল কথা। তবে যে কোনও উক্তি বা প্রত্যুক্তি কথা নয়; যেমন – লৌকিক বিবাদস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর যে উক্তি-প্রত্যুক্তি তা কথা নয়। যেহেতু তা ন্যায়ানুগত নয়। কাজেই যথোক্ত ন্যায়ের নিয়মানুসারে যখন বাদী ও প্রতিবাদী বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁদের যে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বচনসমূহ, তাকেই 'কথা' বলা হয়েছে। এই কথার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হতে পারে – তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভ। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাদী ও প্রতিবাদীর তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে 'কথা' তা হল বাদ। অপরদিকে জয়লাভের উদ্দেশ্যে যখন বাদী ও প্রতিবাদী বিচারে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁদের ন্যায়ানুগত যে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসমূহ তা হল 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা'। তবে যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী জয়লাভের উদ্দেশ্যে পরপক্ষ-খণ্ডনের মধ্যে দিয়ে নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তাঁদের 'কথা' জল্প নামে অভিহিত। কিন্তু যেখানে প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনা না করে কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বিচারে অবতীর্ণ হন, সেখানে সেই 'কথা' বিতণ্ডা নামে অভিহিত।

মহর্ষি গৌতম বাদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ'[৭১]। অর্থাৎ যে কথাতে প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে সাধন তথা সপক্ষ স্থাপন এবং উপালম্ভ তথা পরপক্ষ খণ্ডন হয়, এমন সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ ও পঞ্চাবয়বযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের পরিগ্রহ হল **বাদ**। অভিপ্রায় এই যে, যখন তত্ত্বনির্ণয়ার্থী শিষ্য আত্মা নিত্য না অনিত্য -- এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হয় এবং আত্মার অনিত্যত্ব-এর পক্ষে পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়-বাক্যের স্থাপনা করে; তখন গুরু যথোক্ত নিয়মানুসারে ন্যায়-প্রয়োগ করে শিষ্যের অনিত্যত্ব পক্ষের খণ্ডন-পূর্বক আত্মার

[৭১] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৬৭।

নিত্যত্বরূপ প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন এবং শিষ্যের তত্ত্বনির্ণয় সম্পন্ন করে থাকেন। এরূপ বিচারস্থলে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনরূপ বাক্যসমূহই বাদ নামে অভিহিত।

জল্পঃ

ন্যায়দর্শনে মোক্ষোপযোগীরূপে যে ষোড়শ-পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে একাদশ পদার্থ হল **জল্প**। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আমরা জানি তত্ত্ববুভুৎসু ব্যক্তি তত্ত্বনিশ্চয়ের নিমিত্ত বাদবিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডা স্থলে তত্ত্বনিশ্চয় উদ্দেশ্য নয়, জয়লাভের উদ্দেশ্যেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। তা হলে মোক্ষোপযোগী-রূপে জল্প ও বিতণ্ডা নামক পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কী? এর উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেছেন, 'তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে, বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ'[৭২]। অভিপ্রায় এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমোৎপন্ন তত্ত্ব-নিশ্চয় সংরক্ষণের নিমিত্ত জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োজন। এখানে তিনি একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করেছেন। যখন বীজ হতে প্রথম অঙ্কুর উদ্গিরিত হয়, তখন তা যাতে গোরু-মহিষাদি বিনষ্ট করতে না পারে, তার জন্য কণ্টক-শাখার বেষ্টন দেওয়া হয়। তদনুরূপ শাস্ত্র হতে তত্ত্ব-নিশ্চয় হলেও যাঁদের সেই তত্ত্ব-নিশ্চয় সুদৃঢ় হয়নি এবং সেই তত্ত্ব-নিশ্চয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত যাঁরা গুরুর আদেশানুসারে মননে প্রবৃত্ত, এমন মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট বিপরীত পক্ষের স্থাপনা করলে তাঁদের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের হানি হতে পারে। এই সমস্ত স্থলে তাঁরা জল্প ও বিতণ্ডার সাহায্যে বিপরীত পক্ষের অভিমতকে নিরস্ত করবেন। তাই মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে জল্প ও বিতণ্ডার পৃথক উদ্দেশ করেছেন।

মহর্ষি গৌতম জল্পের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যথোক্তোপপন্নশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ'[৭৩]। অর্থাৎ বাদের যে বিশেষণ তথা প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভ, সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, পঞ্চাবয়বোপপন্ন, পক্ষ-প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ – ঐ সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট এবং ছল, জাতি

---

[৭২] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা – ২৫৯।

[৭৩] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা – ৩৭৮।

ও সমস্ত প্রকার নিগ্রহস্থানের দ্বারাও যেখানে সপক্ষ স্থাপনা ও পরপক্ষ খণ্ডন হতে পারে, এমন বাক্যসমূহকে জল্প বলে। যদিও বাদ কথায় বাদী কিংবা প্রতিবাদীর কোনও প্রকার জিগীষা থাকে না, কিন্তু জল্প হল বিজিগীষু কথা। যেহেতু এখানে জয়লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিবাদী 'ছল' প্রভৃতির প্রয়োগ করেন।

বিতণ্ডাঃ

মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত দ্বাদশ পদার্থ হল **বিতণ্ডা**। এই বিতণ্ডা বলতে কলহ, বিবাদ কিংবা ঝগড়া বোঝায় না। যাঁরা বিচারস্থলে ক্রুদ্ধ হয়ে কুতর্ক বা কলহ করেন কিংবা সর্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে বিবাদে লিপ্ত হন, তাঁরা বিতণ্ডা কথার অধিকারী হতে পারেন না। কারণ 'কথা'র অধিকারী কারা হবেন তা নিরূপণ করতে গিয়ে তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ বলেন – যাঁরা তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়লাভে অভিলাষী এবং সর্বজনসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অপলাপ করেন না; যাঁরা বাক্য শ্রবণাদিতে পটু অর্থাৎ বধির বা প্রমত্ত নন এবং কথার সম্পাদক সমস্ত ব্যাপারে যিনি সমর্থ তথা তর্ক, নির্ণয়, পঞ্চাবয়বপ্রযুক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ, সপক্ষ স্থাপন, পরপক্ষ খণ্ডন -এ সমস্ত বিষয়ে যিনি সমর্থ এবং যাঁরা কলহ করেন না; তাঁরাই 'কথা'র অধিকারী হতে পারেন। কাজেই মহর্ষিসম্মত 'বিতণ্ডা' পদার্থটি প্রদত্ত স্থলে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহর্ষি গৌতম বিতণ্ডার লক্ষণ বলেছেন - 'স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা'[৭৪] অর্থাৎ সেই জল্প, যে জল্প প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন হয়, তাকে বিতণ্ডা বলে। অভিপ্রায় এই যে, বাদী নিজপক্ষ স্থাপনা করলে বিতণ্ডাকারী প্রতিবাদী তা কেবল খণ্ডন করে; কিন্তু নিজ কোনও পক্ষের স্থাপনা করেন না। মূল কথা হল বৈতণ্ডিক কেবল অপরপক্ষ-খণ্ডনের নিমিত্তই বিচারে অবতীর্ণ হন, নিজ পক্ষের স্থাপনা করেন না।

---

[৭৪] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৮৪।

হেত্বাভাসঃ

মহর্ষি গৌতমসম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত ত্রয়োদশ পদার্থ হল **হেত্বাভাস**। এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, ন্যায়দর্শনে হেত্বাভাস-বিষয়ক আলোচনা মূলত জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, পদার্থ-বিষয়ক আধিবিদ্যক আলোচনার মধ্যে হেত্বাভাসের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কী? এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, ন্যায়সম্মত পদার্থ-বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে হেত্বাভাস বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তা পদার্থতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। মূল কথা হল, ন্যায়দর্শনে মোক্ষ লাভের সহায়ক ষোড়শ-পদার্থের বর্ণনা রয়েছে। এই ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত একটি পদার্থ হল হেত্বাভাস।

ন্যায়দর্শনে 'হেত্বাভাস' শব্দটিকে দু'টি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'হেতুবদাভাসন্তে' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলা হয়েছে। অনুমানস্থলে যা প্রকৃত হেতু নয়, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাকে হেত্বাভাস বলা হয়। আবার 'হেতোরাভাসা দোষা হেত্বাভাসাঃ' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেতুর দোষকেও হেত্বাভাস বলা হয়ে থাকে। কাজেই 'হেত্বাভাস' শব্দটি দু'টি অর্থে প্রয়োগ হয় – হেতুর দোষ এবং দুষ্ট হেতু। এখন প্রশ্ন হল দুষ্ট হেতু কি? এ বিষয়ে বুঝতে গেলে প্রকৃত হেতু কাকে বলে তা বোঝা প্রয়োজন। প্রকৃত হেতু বা সৎ-হেতু ন্যায়মতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সৎ-হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হল পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব। যে ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সন্দেহ করা হয়, তাকে পক্ষ বলা হয়। সৎ-হেতু অবশ্যই পক্ষে থাকবে; তা না হলে উক্ত হেতু হতে সাধ্যধর্মের অনুমান সম্ভব হবে না। এই বৈশিষ্ট্যটিকে বলা হয় পক্ষসত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, সৎ-হেতু অবশ্যই সপক্ষে থাকবে তথা সপক্ষে সত্তা। যেখানে সাধ্যধর্ম নিশ্চিতভাবে থাকে তাকে বলা হয় সপক্ষ। আর যেখানে সাধ্যধর্মের নিশ্চিত অভাব থাকে, তাকে বিপক্ষ বলে। এমন বিপক্ষস্থলে সৎ-হেতু বিদ্যমান থাকবে না অর্থাৎ বিপক্ষে অসত্তা। এটি হল সৎ-হেতুর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, সৎ-হেতু কখনও বলবৎ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হবে না অর্থাৎ সৎ-হেতু সর্বদা অবাধিত হবে। এবং পঞ্চমত, সৎ-হেতুর তুল্যবলশালী বিরোধী কোনও প্রতিপক্ষ থাকবে না। উক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হেতুতে থাকলে সেই হেতুকে সৎ-হেতু

বলা হবে। আর যদি কোনও একটি ধর্মের অভাব থাকে তা হলে সেই হেতুকে দুষ্ট হেতু তথা হেত্বাভাস বলা হবে। যেমন, 'বিপক্ষাসত্ত্ব' এই ধর্মটি না থাকলে 'সব্যভিচার' নামক হেত্বাভাস হয়; 'সপক্ষসত্ত্ব' এই ধর্মটি না থাকলে 'বিরুদ্ধ'; 'অসৎপ্রতিপক্ষত্ব' এর অভাবে 'প্রকরণ-সম'; 'পক্ষসত্ত্ব' এই ধর্মটির অভাবে 'সাধ্যসম' এবং 'অবাধিতত্ব' ধর্মটির অভাবে 'কালাতীত' নামক হেত্বাভাস হয়। আর কোনও অনুমান স্থলে যদি এরূপ দুষ্ট হেতু প্রয়োগ করে সাধ্য সাধন করা হয়, তা হলে সেই অনুমানটি দোষদুষ্ট হয়ে পড়বে।

মহর্ষি গৌতম তাঁর '*ন্যায়সূত্র*' গ্রন্থে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছেন – 'সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীত হেত্বাভাসাঃ'[৭৫] অর্থাৎ হেত্বাভাস হল পাঁচপ্রকার, যথা – সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত। মহর্ষি গৌতম-প্রদত্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথম প্রকারের হেত্বাভাস হল সব্যভিচার। 'সব্যভিচার'এর লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন - 'অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ'[৭৬] অর্থাৎ যে হেতুটি ঐকান্তিক নয় তথা এরতর পক্ষে নিয়ত নয়, তা হল সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস। অভিপ্রায় এই যে, কোনও সাধ্য সাধনের জন্য যে হেতুটি প্রয়োগ করা হল তা যদি সাধ্যের অধিকরণে থাকে আবার সাধ্যাভাবের অধিকরণেও থাকে, তা হলে হেতুটি হবে সাধ্যের ব্যভিচারী। যেমন, 'অয়ং গৌর্ব্বিষাণিত্বাৎ' অর্থাৎ এটি গোরু, কারণ এর বিষাণ তথা শৃঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই শৃঙ্গবত্ত্ব ধর্মটি যেমন সাধ্য গোত্ব-এর অধিকরণে থাকে, তেমন সাধ্যের অভাবের অধিকরণ তথা গোত্বশূন্য মহিষাদিতেও থাকে। তাই শৃঙ্গবত্ত্ব হেতুটিকে অনৈকান্তিক বলা হয়েছে। এই অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের আরেক নাম হল সব্যভিচার। সব্যভিচার হেত্বাভাস আবার সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী ভেদে ত্রিবিধ। মহর্ষি উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় প্রকার হেত্বাভাসের নাম হল বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ হেত্বাভাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – কোনও সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে তার বিরোধী পদার্থকে হেতু হিসাবে গ্রহণ করলে যে হেত্বাভাস ঘটে, তা হল বিরুদ্ধ হেত্বাভাস। অভিপ্রায় এই যে, সাধ্যকে সাধন করার জন্য হেতু প্রয়োগ করলে

[৭৫] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯০-৩৯১।
[৭৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯৩-৩৯৪।

সেই হেতু যদি সাধ্যকে সাধন না করে সাধ্যাভাবকে সাধন করে অর্থাৎ সাধ্য-ধর্মের ব্যাঘাতক হেতু হল বিরুদ্ধ। যেমন, 'শব্দ নিত্যঃ উৎপত্তিমত্ত্বাৎ' - প্রদত্ত স্থলে শব্দ রূপ পক্ষ ধর্মীতে নিত্যত্বকে সাধন করার জন্য উৎপত্তিমত্ত্বকে হেতু করা হয়েছে। কিন্তু উৎপত্তিমত্ত্ব হেতুটি প্রদত্ত স্থলে সাধ্য নিত্যত্বকে সাধন না করে সাধ্যের অভাব অনিত্যত্বকেই সাধন করে। কারণ যার উৎপত্তি রয়েছে তা কখনও নিত্য হয় না, তা অনিত্যই হয়। কাজেই প্রদত্ত স্থলে 'উৎপত্তিমত্ত্ব' হেতুটি হল বিরুদ্ধ। মহর্ষি-সম্মত তৃতীয় প্রকারের হেত্বাভাস হল প্রকরণ-সম। বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষ যদি তুল্য বলশালী হয়, তা হলে ঐ প্রকরণ বিষয়ে চিন্তা জন্মায় অর্থাৎ কোনও পক্ষেরই নির্ণয় না হওয়ায় কোনও একটিকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এমন পক্ষ নির্ণয়ের জন্য হেতু প্রয়োগ করা হলে সে স্থলে প্রকরণ-সম হেত্বাভাস হয়। এই প্রকরণ-সম হেত্বাভাসকে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস নামে অভিহিত করা হয়। মহর্ষি-স্বীকৃত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের হেত্বাভাস হল সাধ্যসম হেত্বাভাস। যা সিদ্ধ হয়নি কিন্তু সিদ্ধ হতে যাচ্ছে তা হল সাধ্য। এই সাধ্য পদার্থটি অনুমানের পূর্বে অসিদ্ধ হওয়ায় তাকে সিদ্ধ করা হবে। এখন কোনও অনুমানের হেতু যদি সাধ্যের ন্যায় অনুমানের পূর্বেই অসিদ্ধ হয়, তা হলে সাধ্যসম হেত্বাভাস হয়। কারণ আমরা জানি কোনও প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই অনুমানের হেতু হতে পারে। মহর্ষি-সম্মত সর্বশেষ প্রকার হেত্বাভাসের নাম হল কালাতীত। যে হেতু অনুমানের কালাত্যয় অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হয় তাকে কালাতীত নামক হেত্বাভাস বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে, যতকাল পর্যন্ত পক্ষে সাধ্যধর্মের অভাব থাকে ততকাল পর্যন্ত সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হতে পারে। এখন যদি পূর্বে কোনও বলবৎ প্রমাণের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত হয়ে যায়, এমনস্থলে উক্ত সাধ্যকে সাধন করার নিমিত্ত যে হেতু প্রয়োগ করা হবে, তা কালাতীত নামক দুষ্ট হেতু হবে। যেমন, 'বহ্নি অনুষ্ণ কৃতকত্বাৎ, জলবৎ' – প্রদত্ত স্থলে কৃতকত্ব হল হেতু এবং সাধ্য হল অনুষ্ণত্ব। কিন্তু বহ্নি যে উষ্ণ (অনুষ্ণত্বের অভাব বিশিষ্ট) তা পূর্বেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। কাজেই বহ্নিরূপ পক্ষে সাধ্য অনুষ্ণত্ব-এর অভাব পূর্ব হতেই স্পর্শ প্রত্যক্ষের দ্বারা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। এমনস্থলে উক্ত পক্ষধর্মীতে সাধ্য

অনুষ্ণত্বকে অনুমান করার নিমিত্ত যে হেতু প্রয়োগ করা হোক না কেন; তা কালাতীত নামক হেত্বাভাস হবে। বলবৎ প্রমাণের দ্বারা সাধ্যধর্মটি পক্ষে বাধিত হওয়ায়, এই হেত্বাভাস বাধিত হেত্বাভাস নামে অভিহিত হয়েছে।

ছলঃ

মহর্ষি গৌতমসম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে **ছল** হল চতুর্দশ পদার্থ। বিচারস্থলে প্রতিবাদী সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হলে নিরব না থেকে পরাজয় ভয়ে নানা প্রকার অসদুত্তর করতে পারেন। বিচারস্থলে এরূপ অসদুত্তরসমূহকেই ছল বলা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম ছলের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং'[৭৭] অর্থাৎ বাদীর অভিমত বাক্যার্থ হতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা করে বাদীর বচনকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে যে অসদুত্তর-এর আশ্রয় নেওয়া হয়, তাকে ছল বলা হয়। ন্যায়মতে ছল ত্রিবিধ – বাক্-ছল, সামান্য-ছল ও উপচার-ছল। বিচারস্থলে বাদীর বক্তব্যের দ্বিবিধ অর্থ বের করে, বক্তার যা অভিপ্রেত নয় এমন অর্থের কল্পনা করে যখন বাদিপক্ষের দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাকে বাকছল বলে। যেমন, ধরাযাক বাদী বললেন 'নবকম্বলোঽয়ং মাণবকঃ' অর্থাৎ এই বালকের নূতন কম্বল আছে – এটাই বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু এস্থলে বক্তার এতাদৃশ অর্থ গ্রহণ না করে প্রতিবাদী জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে যদি 'নব' শব্দে নূতন না বুঝে নবসংখ্যক অর্থ বুঝে বলেন – নব-সংখ্যক কম্বল এটা আপনি বললেন; কিন্তু বালকের নয়টি কম্বল কোথায়? প্রদত্ত স্থলে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনকে বাক্-ছল বলে। দ্বিতীয় প্রকারের ছল এর নাম হল সামান্য-ছল। গৌতম বলেছেন, সম্ভাব্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অতিসামান্য ধর্মের যোগবশতঃ বক্তার অনভিপ্রেত কোনও অসম্ভব অর্থের কল্পনা দ্বারা বক্তার বক্তব্যের যে প্রতিষেধ, তাকে সামান্য-ছল বলে। যেমন, কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণ দেখে বললেন – এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচারণসম্পন্ন। তখন অপর ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব জাতিকে প্রশংসা করার নিমিত্ত বললেন – ব্রাহ্মণেই বিদ্যাচরণসম্পন্নতা সম্ভব। এখন এই শুনে যদি প্রতিবাদী উক্ত বচনের বিঘাতের উদ্দেশ্যে বলেন – যদি ব্রাহ্মণ হলেই

[৭৭] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪৩।

বিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তা হলে শিশু কিংবা ব্রাত্য (অবিদ্বান) ব্রাহ্মণও বিদ্যাচরণসম্পন্ন হোক। যেহেতু ব্রাহ্মণ শিশু কিংবা অবিদ্বান ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিদ্যমান। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিদ্যার হেতু হয় না। বাদীর বক্তব্যের তা ফলিতার্থ নয়। সুতরাং প্রদত্ত স্থলে প্রতিবাদী ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে বিদ্যার সাধক হেতুরূপে অসম্ভব কল্পনার দ্বারা বাদীর বক্তব্যের ব্যভিচার দোষ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। প্রতিবাদীর এই ব্রাহ্মণত্বরূপ সামান্য ধর্ম নিমিত্তক অসদুত্তরকে সামান্য-ছল বলে। ন্যায়সম্মত তৃতীয় প্রকারের ছলের নাম হল উপচার-ছল। বাদী কোনও শব্দের লাক্ষণিক অর্থ বোঝাতে শব্দ প্রয়োগ করলে প্রতিবাদী যদি বক্তার মুখ্য অর্থের কল্পনার দ্বারা বাদীর মতের প্রতিষেধের নিমিত্ত অসদুত্তর প্রদান করেন, তা হলে তাকে উপচার-ছল বলে। যেমন, বাদী বললেন 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'। এখানে 'মঞ্চ' শব্দটির লাক্ষণিক অর্থ হবে মঞ্চে উপবিষ্ট পুরুষ। কিন্তু প্রতিবাদী যদি এস্থলে 'মঞ্চ' শব্দটির শক্যার্থ গ্রহণ করে বলেন মঞ্চ কখনও ক্রোশন তথা আহ্বান করতে পারে না। কারণ, মঞ্চ জড় পদার্থ, তার আহ্বান-কর্তৃত্ব নেই। 'মঞ্চ' শব্দের 'উপচার' নিমিত্তক বক্তার অভিপ্রেত অর্থের প্রতিষেধের নাম হল উপচার-ছল।

জাতিঃ

ভারতীয়-দর্শনে 'জাতি' শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধদর্শনে জাতি বলতে জন্মকে বোঝানো হয়েছে। আবার বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত জাতি হল সামান্য, যা নিত্য এবং অনেক-সমবেত। তবে মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত পঞ্চদশ পদার্থ যে জাতি তা উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তিনি 'জাতি' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি জাতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ'[৭৮] অর্থাৎ বিচারস্থলে বাদী হেতু প্রয়োগ করলে, কোনও প্রকার ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করে কেবল সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ (দোষ-উদ্ভাবন) তাকে **জাতি** বলা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক কোনও বিচারস্থলে বাদী বললেন – "শব্দোঽনিত্যঃ কার্যত্বাদ্ ঘটবৎ" অর্থাৎ শব্দ অনিত্য যেহেতু তা কার্য, যেমন – ঘট। এস্থলে

[৭৮] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৬৪।

বাদী অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব শব্দে থাকায়, উক্ত হেতুর দ্বারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করলে, প্রতিবাদী যদি বলেন শব্দে ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব যেমন আছে, তেমন আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। কাজেই শব্দ আকাশের ন্যায় নিত্য হোক। প্রতিবাদীর এরূপ অসদুত্তরকেই জাতি বলা হয়েছে। একইভাবে শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব আছে, তদনুরূপ অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। কাজেই ঘটের বৈধর্ম্য অমূর্তত্ব শব্দে থাকায়, শব্দ কখনও ঘটের ন্যায় অনিত্য হতে পারে না। কাজেই শব্দ নিত্য হোক। এভাবে বৈধর্ম্য-প্রদর্শনের দ্বারা প্রতিবাদী বাদীর মতের প্রতিষেধ করতে পারেন। এস্থলে প্রতিবাদীর এরূপ উত্তরকে জাতি বলা হয়েছে। কাজেই জাতিও একপ্রকার অসদুত্তর-বিশেষ। তবে যে কোনও অসদুত্তর জাতি নয়। ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করে কেবল সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য ইত্যাদির দ্বারা যে আসদুত্তর, তা জাতি।

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, জাতি প্রভৃতি যদি অসদুত্তর হয়, তা হলে তত্ত্বনিশ্চয় স্থলে মহর্ষি কেন এগুলিকে উপস্থাপন করেছেন? এর উত্তরে বলা হয়, বাদী যখন ন্যায়াদি প্রয়োগ করেন তখন তাঁর অসাবধানবশতঃ এরূপ অসদুত্তরের প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে কিনা কিংবা প্রতিবাদী যখন এরূপ উত্তর প্রদান করছেন; তখন তা উদ্ভাবনের জন্যও এসব পদার্থের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপ বিষয়ে অবগত থাকলে তবেই বাদী নিজপক্ষে উক্তরূপ অসদুত্তর বর্জন এবং প্রতিবাদীর বাক্যে উদ্ভাবন করতে সমর্থ হবেন। শুধু তাই নয়, জাতি প্রভৃতির জ্ঞান থাকলে তবেই বাদী প্রতিবাদীর জাতিঘটিত বক্তব্যের সম্যক উত্তর প্রদানে সক্ষম হবেন। তাই ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি পদার্থের স্বতন্ত্র পরিচয় মহর্ষি-কর্তৃক উদ্দিষ্ট হয়েছে।

মহর্ষি গৌতম তাঁর *'ন্যায়সূত্র'* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে চব্বিশ প্রকার জাতির উল্লেখ করেছেন, যথা – সাধর্ম্য-সমা, বৈধর্ম্য-সমা, উৎকর্ষ-সমা, অপকর্ষ-সমা, বর্ণ্য-সমা, অবর্ণ্য-সমা, বিকল্প-সমা, সাধ্য-সমা, প্রাপ্তি-সমা, অপ্রাপ্তি-সমা, প্রসঙ্গ-সমা, প্রাপ্তিদৃষ্টান্ত-সমা, অনুৎপত্তি-সমা, সংশয়-সমা, প্রকরণ-সমা, অহেতু-সমা, অর্থাপত্তি-সমা, অবিশেষ-সমা, উপপত্তি-সমা, উপলব্ধি-সমা, অনুপলব্ধি-সমা, অনিত্য-সমা, নিত্য-সমা এবং কার্য্য-সমা।

নিগ্রহস্থানঃ

গৌতমোক্ত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত সর্বশেষ পদার্থ হল **নিগ্রহস্থান**। মহর্ষি গৌতম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্'[৭৯] অর্থাৎ যার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি তথা বিপরীতজ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি তথা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাকে নিগ্রহস্থান বলে। ন্যায়মতে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা – এই বিচারত্রয় 'কথা' নামে অভিহিত হয়েছে। জল্প এবং বিতণ্ডা স্থলে বাদী কিংবা প্রতিবাদীর পরাজয়কেই নিগ্রহ বলা হয়েছে। কিন্তু বাদ স্থলে পরাজয়রূপ নিগ্রহ থাকে না, যেহেতু গুরু এবং শিষ্য জয়লাভের কামনাশূন্য হয়ে কেবল তত্ত্বনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বিচারে প্রবৃত্ত হন। তবে বাদ স্থলে জিগীষাশূন্য গুরু এবং শিষ্য বিবক্ষিত বিষয়ের প্রতিপাদন করতে না পারলে নিগৃহীত হন। কাজেই বাদ স্থলে নিজপক্ষ প্রতিপাদন করতে না পারাই তথা গুরু শিষ্যের বিবক্ষিত বিষয়ের অপ্রতিপাদকত্বই হল নিগ্রহ। যাকে 'খলীকার' শব্দের দ্বারা উক্ত করা হয়েছে। কাজেই পরাজয়রূপ নিগ্রহ কিংবা খলীকাররূপ নিগ্রহের যে স্থান অর্থাৎ কারণ তাকে নিগ্রহস্থান বলে। বিচারস্থলে পরাজয় প্রাপ্তি কিংবা খলীকার প্রাপ্তি কিন্তু নিগ্রহস্থান নয়, তা নিগ্রহস্থানের ফল। মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থানের মত দ্বাবিংশতি প্রকার প্রদর্শন করেছেন। সেগুলি হল – প্রতিজ্ঞা-হানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত এবং হেত্বাভাস। এর মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা ও পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ – এই কয়টি অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থান, আর বাকিগুলি বিপ্রতিপত্তিমূলক।

ন্যায়-দর্শন তর্কশাস্ত্র বা বিচারশাস্ত্র নামে পরিচিত। তাই বিচারের আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়-দর্শনের পদার্থতত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে। এহেতু ন্যায়-দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি গৌতম বিচারের সহায়করূপে ষোড়শ-পদার্থের সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অপরদিকে

---

[৭৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৬৭।

বৈশেষিক-দর্শন প্রমেয়-শাস্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। কারণ যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞেয় তথা প্রমেয়, সে সমস্তই সুবিস্তৃতভাবে বৈশেষিক-দর্শনে আলোচিত হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন হলেও উভয়ের পদার্থতত্ত্বের বৈলক্ষণ্যই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমরা যদি ন্যায়-বৈশেষিক চর্চার ধারার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তা হলে এটা পরিষ্কার যে, উভয় পদার্থতত্ত্ব পরস্পর বিরোধী নয়। ন্যায়-দর্শন অনিয়ত-পদার্থবাদী। তাই এঁরা পদার্থের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা-নিয়ম মানেন না। এঁদের মতে পদার্থ অসংখ্য। তবে যেগুলি ন্যায়-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি; তার উপযোগী, কেবল সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি গৌতম-কর্তৃক উদ্দিষ্ট হয়েছে। তাই মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগিরূপে ষোড়শ-পদার্থের উদ্দেশ করেছেন। যদিও বৈশেষিক-সম্মত দ্রব্যাদি পদার্থও ন্যায়-সম্মত। তবে উক্ত পদার্থ সকল ন্যায়-দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য উপপাদনে সহায়তা না করায় পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়নি। যদিও দ্রব্যাদি পদার্থসমূহ ন্যায়দর্শনে অস্বীকৃত হয়নি। তার সমর্থন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্তি হতে স্পষ্ট হয়। তিনি ন্যায়সূত্রভাষ্যে বলেছেন – 'অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্‌ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্'[৮০]। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা বোঝা যায় যে, বৈশেষিক-সম্মত পদার্থ-সমূহও ন্যায়-দর্শনে স্বীকৃত। কিন্তু তা হলেও একটা আপত্তি থেকেই যায় যে, বৈশেষিক-দর্শন তো নিয়ত-পদার্থবাদী। তাঁরা পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়মে বিশ্বাসী। অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকমতে পদার্থ সাত প্রকার। এতদ্‌অতিরিক্ত পদার্থ যেমন বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত হয়নি, তদনুরূপ এর থেকে অল্প পদার্থও বৈশেষিক-দর্শনে সমালোচিত হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন হল, বৈশেষিক-সম্মত পদার্থ ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত হলেও ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ কি বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত? যদি ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত হয় তা হলে তাঁদের পদার্থের সংখ্যা-নিয়মের হানি হয় না কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, বৈশেষিকমতে পদার্থ সাত প্রকার, তার অধিকও নয় অল্পও নয়। তবে এ জগতে যা কিছু রয়েছে তা সমস্তই উক্ত সপ্ত-শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত,

---

[৮০] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৭-১৯৮।

তার বাইরে কিছু নেই। কাজেই ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ন্যায়দর্শনে বর্ণিত ষোড়শ-পদার্থকে বৈশেষিক সপ্ত-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হলে বৈশেষিক-প্রদত্ত পদার্থের সংখ্যা-নিয়মের হানি হবে না। এখন ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণের মত অনুসরণ করে ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বে অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হচ্ছে-

ন্যায়সম্মত প্রথম পদার্থ হল প্রমাণ। এই প্রমাণ ন্যায়মতে চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। 'প্রত্যক্ষ' শব্দের অন্তর্গত 'অক্ষ' শব্দের অর্থ হল ইন্দ্রিয়। কাজেই ইন্দ্রিয় জন্য যে জ্ঞান তা হল প্রত্যক্ষ। কাজেই ইন্দ্রিয় হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় দু'প্রকার, বাহ্য-ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এবং অন্তরিন্দ্রিয় (মন)। চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বৈশেষিক-সম্মত ভূতপদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বৈশেষিকমতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি হল হল ভূতদ্রব্য। কাজেই ন্যায়সম্মত চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকল বৈশেষিক-সম্মত দ্রব্য-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়টিও বৈশেষিক-সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের একটি। কাজেই মন একটি দ্রব্য-পদার্থ। ন্যায়মতে প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়। কাজেই অনুমিতি প্রমার করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানই হল অনুমান-প্রমাণ। তদনুরূপ উপমিতি প্রমার করণ সাদৃশ্যজ্ঞান হল উপমান-প্রমাণ, শাব্দবোধের করণ পদজ্ঞান হল শব্দ-প্রমাণ। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান, সাদৃশ্যজ্ঞান, পদজ্ঞান স্পষ্টতই বৈশেষিক-সম্মত জ্ঞান নামক গুণ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু জ্ঞান বৈশেষিক-সম্মত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে একটি অন্যতম গুণ। ন্যায়সম্মত দ্বিতীয় পদার্থ হল প্রমেয়। ন্যায়মতে প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার। এর মধ্যে আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয় দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি অর্থ কণাদসম্মত গুণ-পদার্থের অন্তর্গত। বুদ্ধি নামক প্রমেয়টিও বৈশেষিক-সম্মত চতুর্বিংশতি গুণের একটি। অন্তরিন্দ্রিয় মন যে দ্রব্য-পদার্থ তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ন্যায়সম্মত সপ্তম প্রমেয় হল প্রবৃত্তি। ন্যায়মতে বাচিক, কায়িক ও মানসিক ধর্মাধর্মের জনক শুভাশুভ কর্মই হল প্রবৃত্তি। কাজেই তা বৈশেষিক-সম্মত কর্ম পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায়মতে পাপ-পুণ্য কর্মে প্রবৃত্তির জনক যে রাগ, দ্বেষ, মোহ তা দোষ নামে পরিচিত। 'রাগ' হল আসক্তি তথা কোনও বিষয়ে নিরন্তর কামনা, দ্বেষ হল ক্রোধ আর মোহ হল শরীরাদিতে

আত্মতত্ত্বজ্ঞান তথা মিথ্যাজ্ঞান। কাজেই ন্যায়সম্মত রাগ, দ্বেষ, মোহ-রূপ যে দোষ তা গুণ-পদার্থেরই অন্তর্গত। গৌতমসম্মত নবম প্রমেয় হল প্রেত্যভাব। 'প্রেত্যভাব' এর অর্থ মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম; কিন্তু আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য। তাই তার জন্ম কিংবা মৃত্যু সম্ভব নয়। ন্যায়মতে জন্ম বলতে শরীর ও প্রাণের প্রথম সংযোগকে বোঝানো হয়েছে, যা স্পষ্টতই গুণ-পদার্থের অন্তর্গত। আর শরীর ও প্রাণের অন্তিম সংযোগ ধ্বংসকে মৃত্যু বলা হয়েছে, যা স্পষ্টতই বৈশেষিক-সম্মত সপ্তম পদার্থ অভাবের অন্তর্গত। ন্যায়মতে ফল দ্বিবিধ – মুখ্য ফল ও গৌণ ফল। সুখ, দুঃখ হল মুখ্যফল আর সুখ, দুঃখাদির সাধন দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হল গৌণ ফল। কাজেই গৌতমোক্ত 'ফল' নামক প্রমেয়-পদার্থটির অন্তর্গত সুখ-দুঃখাদির অনুভবরূপ মুখ্য ফল গুণ-পদার্থের অন্তর্গত; আর সুখ-দুঃখাদির সাধন দেহাদি দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত। ন্যায়সম্মত একাদশ প্রমেয় হল দুঃখ। এই পীড়া বা তাপ রূপ যে দুঃখ; তা স্পষ্টতই কণাদোক্ত চব্বিশ প্রকার গুণের একটি। গৌতমোক্ত সর্বশেষ প্রমেয় হল অপবর্গ তথা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা ধ্বংস। যা বৈশেষিকস্বীকৃত সপ্তম পদার্থ অভাব এর অন্তর্গত। এভাবে মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত প্রমাণ ও প্রমেয়-পদার্থ যে বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যা তা প্রদর্শন করা হল। এখন ন্যায়সম্মত সংশয়াদি পদার্থ-সকলও যে বৈশেষিক সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্গত তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। ন্যায়মতে এক ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞানকে সংশয় বলা হয়েছে। কাজেই সংশয় জ্ঞানবিশেষ হওয়ায় তা বৈশেষিক-সম্মত গুণ-পদার্থেরই অন্তর্গত। যে বিষয়ে মানুষের স্বতঃই ইচ্ছা জন্মায়, যাকে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যরূপে নিশ্চয় করে তার প্রাপ্তি কিংবা পরিহার তথা নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্ত হয়, তাকে প্রয়োজন বলে। এই প্রয়োজন ন্যায়মতে দ্বিবিধ – মুখ্য প্রয়োজন ও গৌণ প্রয়োজন। প্রতিটি জীবমাত্রই সুখলাভ করতে চায় এবং দুঃখকে পরিহার করতে চায়। তাই এই সুখ-লাভ ও দুঃখ-নিবৃত্তি জীবমাত্রেরই মুখ্য প্রয়োজন। আর এই সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারের যা কিছু উপায়, তা সমস্তই গৌণ প্রয়োজন। কাজেই প্রদত্ত স্থলে ন্যায়সম্মত সুখপ্রাপ্তি বা সুখ অনুভূতিরূপ প্রয়োজন কণাদোক্ত গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। আর দুঃখ-নিবৃত্তি বা দুঃখ ধ্বংস রূপ যে প্রয়োজন, তা স্পষ্টতঃ অভাব-পদার্থের

অন্তর্গত। আর যা কিছু গৌণ প্রয়োজন তথা সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারের উপায়সমূহ; তা সমস্তই দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত। ন্যায়মতে যে পদার্থে বাদী এবং প্রতিবাদীর হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে, তাকে দৃষ্টান্ত পদার্থ বলে। যেমন, মহানসাদিতে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় সর্বসম্মত। তাই মহানসাদি দ্রব্য-পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুণ, কর্ম প্রভৃতিও দৃষ্টান্ত হতে পারে। কাজেই ন্যায়সম্মত দৃষ্টান্ত পদার্থটিও কণাদোক্ত সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্গত। ন্যায়মতে যা নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত সেই পদার্থই হল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত ন্যায়মতে চতুর্বিধ, যথা – সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং অভ্যুপগম্যমান সিদ্ধান্ত। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি সিদ্ধান্ত বৈশেষিকোক্ত দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। আর 'অভ্যুপগম' এর অর্থ যদি হয় আপাতভাবে মেনে নেওয়া বা স্বীকার করে নেওয়া, তা হলে তা জ্ঞানবিশেষ হওয়ায় গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। মহর্ষি-সম্মত ষড়শ পদার্থের অন্তর্গত সপ্তম পদার্থটির নাম হল অবয়ব। ন্যায়সম্মত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যই হল অবয়ব। আর বাক্যগুলি শব্দ-বিশেষ হওয়ায় তা কণাদোক্ত গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ন্যায়মতে ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপই হল তর্ক। এই তর্ক আহার্য ভ্রমজ্ঞান বিশেষ। তর্ক জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তা কণাদোক্ত গুণ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান, তা হল নির্ণয়, তথা প্রমাণের ফল। তাই নির্ণয়ও গুণ-পদার্থের অন্তর্গত। ন্যায়মতে তত্ত্ব-নিশ্চয়ের উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য জিগীষাশূন্য হয়ে প্রমাণ ও তর্কের সাহায্যে যে সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন, সেই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ বাক্যসমূহই হল বাদ, আর জয়লাভের উদ্দেশ্যে যখন বাদী ও প্রতিবাদী প্রমাণ, তর্ক, পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের দ্বারা সপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ-খণ্ডনের নিমিত্ত বাক্যপ্রয়োগ করেন, তখন তাকে জল্প বলে। আর সপক্ষ-সংস্থাপন ছাড়া কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনের নিমিত্ত বিজিগীষুর যে কথা, তাকে বিতণ্ডা বলে। কাজেই উক্ত ত্রিবিধ কথাই বাক্যবিশেষ তথা শব্দবিশেষ হওয়ায় বৈশেষিকোক্ত গুণ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। ন্যায়মতে হেত্বাভাসগুলি অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়; নচেৎ সেগুলি অনুমিতির কারণ পরামর্শ ইত্যাদি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে যথার্থ জ্ঞান, তার বিষয় হয়। মূল কথা হল, যার জ্ঞান হলে আর অনুমিতি হতে পারে না কিংবা

অনুমিতির কারণ পরামর্শ ইত্যাদি জ্ঞান হতে পারে না, তা হল হেত্বাভাস। কাজেই ন্যায়সম্মত হেত্বাভাস সকল দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্গত হবে। যেহেতু অনুমিতির প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয় বা অনুমিতির কারণ পরামর্শ ইত্যাদি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে জ্ঞান তার বিষয় অবশ্যই দ্রব্যাদি পদার্থই হবে। আবার যারা দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলেন, তাঁদের সেই দুষ্ট হেতু দ্রব্যাদি পদার্থই হবে। কারণ হেতু বা লিঙ্গ দ্রব্যাদি পদার্থই হয়ে থাকে। ন্যায়মতে বিচারস্থলে প্রতিবাদী সদুত্তর প্রদানে সমর্থ না হলে বক্তার অভিপ্রেত অর্থের অন্য অর্থ কল্পনা করে বক্তার অভিমত বক্তব্যের দোষ প্রদর্শনের জন্য অযথার্থ বাক্যপ্রয়োগ করে থাকেন, তাকে ছল বলে। আর অসৎ উত্তর তথা বিচারস্থলে বাদীর স্বাভিমত অর্থের ব্যাঘাতক উত্তর বাক্যই হল জাতি। কাজেই ন্যায়সম্মত ছল ও জাতিরূপ পদার্থ দু'টি বাক্যবিশেষ হওয়ায় গুণ-পদার্থের অন্তর্গত হবে। ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের সর্বশেষ পদার্থের নাম হল নিগ্রহস্থান। ন্যায়মতে বিচারস্থলে নিগ্রহের হেতু হল নিগ্রহস্থান। এই নিগ্রহস্থান মহর্ষি গৌতমের মতে দ্বাবিংশতি প্রকার। এগুলির মধ্যে প্রতিজ্ঞা-হানি, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অভাব-পদার্থের অন্তর্গত। আর অন্যগুলি গুণ-পদার্থের অন্তর্গত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত দ্রব্যাদি সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বঃ

বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ তাঁর '*বৈশেষিকসূত্র*-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে বলেন, 'ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্'[৮১]। অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত সংখ্যক হলেও সেগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। পদার্থধর্মসংগ্রহকার প্রশস্তপাদও সূত্রকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদার্থের বিভাগ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং

[৮১] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা - ১৬।

সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ'[৮২] অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এই ছয় প্রকার পদার্থের সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের যে তত্ত্বজ্ঞান তা মুক্তির কারণ। তবে অনেক টীকাকার মনে করেন প্রশস্তপাদাচার্য নিঃশ্রেয়সের ক্ষেত্রে অভাব-পদার্থের উপযোগীতার কথা উপদেশ না করলেও, অভাব-পদার্থ যে তিনিও স্বীকার করতেন তা 'পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানাং' এই অংশ হতে পরিষ্কৃত। অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদাচার্য *ভাষ্যে* ছয় প্রকার পদার্থের উদ্দেশ করলেও অভাব-পদার্থ তাঁর সম্মত। কারণ বৈধর্ম্য মানে অসাধারণ ধর্ম অর্থাৎ যা সাধারণ ধর্ম হতে ভিন্ন তা হল বৈধর্ম্য। আর ভিন্নতা বা ভেদ অভাবেরই নামান্তর। কাজেই প্রশস্তপাদাচার্যের মতেও পদার্থ সাত প্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। এখন প্রশ্ন হতে পারে 'অভাব' নামক পদার্থ যদি বৈশেষিক-সম্মত হয়, তা হলে উদ্দেশসূত্রে তার উল্লেখ কেন আচার্যগণ করলেন না? এর উত্তরে উদয়নাচার্য বলেন, 'অভাবস্তু স্বরূপবানপি পৃথঙ্ নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ'[৮৩]। অভিপ্রায় এই যে, অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞান-নির্ভর। যেমন, ঘটাভাব – এস্থলে প্রদত্ত অভাবের প্রতিযোগী হল ঘট। কারণ যার অভাব তা হল প্রতিযোগী। এখন আমরা যদি ঘটাভাবকে জানতে চাই তা হলে পূর্বে ঘটের জ্ঞান থাকতেই হবে। ঘটের জ্ঞান না থাকলে শুদ্ধ ঘটাভাব আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না। তাই অভাব নিরূপণের পূর্বে আচার্যগণ অভাবের জ্ঞান যে প্রতিযোগীর জ্ঞানের অধীন সেই প্রতিযোগীসমূহের নিরূপণ করেছেন। কিন্তু এখানে একটি আপত্তি থেকেই যায়, সংযোগ-বিভাগের নিরূপণও তার প্রতিযোগী নিরূপণের অধীন হয়ে থাকে; কিন্তু শাস্ত্রে তো সংযোগাদির পৃথক উদ্দেশ পরিলক্ষিত হয়। তা হলে কি অভাব নামক পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত নয়? এর উত্তরে বলা যায়, অভাব নামক পদার্থটি যে বৈশেষিক-সম্মত তা বৈশেষিক-দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি কণাদের *'বৈশেষিক সূত্র'* এর নবম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের

---

[৮২] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা-৩৯।

[৮৩] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা – ৫৭।

প্রথম সূত্র হতে পরিস্কৃত হয়। তিনি বলেছেন – 'ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ'[৮৪]। প্রশস্তপাদাচার্য জগতের সৃষ্টি ও সংহার আলোচনাতেও প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। আবার বৈধর্ম্যের ব্যাখ্যাতেও অত্যন্তাভাবের আলোচনা রয়েছে। কাজেই অভাব নামক পদার্থটি বৈশেষিক-সম্মত। সুতরাং বৈশেষিকমতে পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু বিদ্যমান তাকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় – ভাব এবং অভাব। ভাব-পদার্থ ছয় প্রকার – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়; আর অভাব – এই সপ্ত পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত।

বৈশেষিক সম্প্রদায় নিয়ত-পদার্থবাদী। তাই তাঁরা পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়মে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে পদার্থ সাত প্রকার। এর অধিক পদার্থ যেমন বৈশেষিক-দর্শনে খণ্ডিত হয়েছে; তেমনই এর কম পদার্থও বৈশেষিকাচার্যগণ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। যেমন, প্রাভাকর-সম্প্রদায় বৈশেষিকস্বীকৃত বিশেষ ও অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকারই করেন না। তাঁদের মতে পৃথক্ত্ব নামক গুণের সাহায্যে যে কোনও বস্তুর ভেদ নিরূপিত হয়ে যায়। তার জন্য বিশেষ নামক স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। তাঁরা আরও মনে করেন অভাব যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণ অতিরিক্ত অভাব বলে কিছুই নেই। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ মীমাংসক সম্প্রদায়ের উক্ত মত খণ্ডন করে অভাবের পৃথক পদার্থত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিষয়ে বৈশেষিকাচার্যগণের যুক্তি বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে তাই প্রদত্ত স্থলে উক্ত আলোচনা হতে বিরত থাকলাম। প্রাভাকর-সম্প্রদায় বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত পদার্থ অতিরিক্ত শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্যা প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। '*তন্ত্ররহস্য* গ্রন্থে বলা হয়েছে – 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যসমবায়শক্তিসংখ্যাসাদৃশ্যান্যষ্টৌ পদার্থাঃ'[৮৫]। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণ তা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শক্তি, সংখ্যা, সাদৃশ্য প্রভৃতি দ্রব্যাদি সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মীমাংসক-মতে বীজ থেকে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় কিংবা অগ্নি থেকে যে দাহ উৎপন্ন

[৮৪] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৪১৫-৪১৭।

[৮৫] Shamashastry, R. *Tantrarahasya* by Ramanujacharya, Baroda, Central Library, 1923, page – 20.

হয় তার জন্য বীজে কিংবা অগ্নিতে একপ্রকার শক্তি অবশ্য স্বীকার্য। তাঁদের মতে শক্তি তিন প্রকার, যথা – সহজ-শক্তি, আধেয়-শক্তি এবং পদশক্তি। যদিও অনেক আচার্য পদশক্তিকে সহজশক্তির প্রকারান্তর স্বীকার করেন। বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন করার যে শক্তি থাকে, তাকে সহজ-শক্তি বলে। আর প্রোক্ষণাদি হতে ধান্য যব প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্যে যে শক্তি উৎপন্ন হয়; যা স্বর্গ লাভের সহায়ক হয়, তাকে আধেয়-শক্তি বলে। আর যে শক্তির জন্য নির্দিষ্ট পদ হতে নির্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়ে থাকে; এমন অর্থবোধানুকূল পদনিষ্ঠ শক্তি হল পদশক্তি। মীমাংসামতে বীজ হতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় কিংবা অগ্নি যে দহন কার্য উৎপন্ন করে তা সর্বজনবিদিত। এখন প্রশ্ন হল বীজ কি বীজত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন হয়ে অঙ্কুর উৎপন্ন করে নাকি অন্য ধর্ম সহযোগে অঙ্কুর উৎপাদনের জনক হয়? এমন বলা যাবে না যে, বীজ বীজত্ব ধর্ম পুরস্কারে অঙ্কুরোদ্গমের কারণ হয়, কেননা ভাজা বীজ কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত বীজেও বীজত্ব ধর্ম বর্তমান; তা সত্ত্বেও ভাজা বীজ কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত বীজ হতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। কাজেই মানতে হয় বীজত্ব ধর্মের অতিরিক্ত এমন কোনও ধর্ম বীজে অবশ্যই রয়েছে যা অঙ্কুরোদ্গমের কারণ হয়ে থাকে। আর তা হল শক্তিরূপ-পদার্থ। এরূপ শক্তি দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই মীমাংসামতে তা স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত। প্রদত্ত স্থলে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন, বীজ হতে অঙ্কুর উৎপত্তির ব্যাখ্যার নিমিত্ত মীমাংসকগণ বীজে যে অঙ্কুরজননানুকূল শক্তি স্বীকার করেছেন, তা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এরূপ শক্তি কল্পনা না করেই বীজের অঙ্কুর জনকত্ব উপপন্ন হয়ে যায়। অভিপ্রায় এই যে, ভাজা বীজ কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত বীজ হতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; কারণ কোনও বীজ ভাজা হলে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাতে অঙ্কুরবিরোধী গুণের উৎপত্তি হয়। যার ফলে ঐরূপ বীজ হতে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হতে পারে না। কাজেই গুণ স্বীকারের মাধ্যমে উপরোক্ত স্থলের ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হওয়ায় বৈশেষিকাচার্যগণ শক্তি নামক পদার্থান্তর কল্পনা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তাঁরা সংখ্যাকেও অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না। যাঁরা সংখ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন তাঁদের যুক্তি হল – সংখ্যা সকল পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম হয়ে থাকে, যেমন – ‘একটি পুস্তক’, ‘একটি রস’, ‘একটি ক্রিয়া’,

‘একটি জাতি’ এভাবে একত্বাদি প্রতীতির দ্বারা সংখ্যা সকল পদার্থের সাধারণ ধর্ম হয়। কিন্তু দ্রব্যাদি এভাবে সকল পদার্থের সাধারণ ধর্ম হয় না। কাজেই বৈশেষিক-সম্মত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ অতিরিক্ত সংখ্যাকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণ সংখ্যার পৃথক পদার্থত্ব স্বীকারই করেন না। তাঁদের মতে, সংখ্যা বৈশেষিক-সম্মত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। এস্থলে মীমাংসকগণ আপত্তি করে বলতে পারেন- বৈশেষিকমতে, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য প্রভৃতি পদার্থ স্বরূপতঃ গুণহীন হয়ে থাকে। এখন সংখ্যাকে যদি গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হলে ‘একটি রস’, ‘একটি ক্রিয়া’, ‘একটি জাতি’ প্রভৃতি প্রতীতির ব্যাখ্যা প্রদান কীভাবে সম্ভব হবে? এর উত্তরে বলা হয়, গুণ, ক্রিয়া, জাতিতে সংখ্যা সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না একথা ঠিকই, কিন্তু স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে ঐগুলি সংখ্যার সম্বন্ধী হতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সংখ্যা নামক গুণাদি দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, আর ঐ দ্রব্যে গুণ, কর্ম, জাতি প্রভৃতিও সমবেত থাকে। কাজেই গুণ, কর্ম, জাতি প্রভৃতিতেও স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে একত্ব, দ্বিত্ব আদির প্রতীতি উৎপন্ন হতে পারে। কাজেই গুণাদিতে একত্বাদি প্রতীতির ব্যাখ্যার জন্য সংখ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নেই। তা বৈশেষিক-সম্মত দ্বিতীয় পদার্থ গুণেরই অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে বৈশেষিকাচার্যগণ মীমাংসা-সম্মত সাদৃশ্য নামক পদার্থটিরও অতিরিক্ত পদার্থত্ব খণ্ডন করেছেন। মীমাংসামতে, ‘গো সদৃশ গবয়’ এস্থলে সাদৃশ্যরূপ পদার্থটি দ্রব্যাদি হতে ভিন্ন, কিন্তু বৈশেষিকমতে সাদৃশ্যরূপ পদার্থটি দ্রব্যাদি হতে অতিরিক্ত নয়, তা দ্রব্যাদিরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন – ‘গো সদৃশ গবয়’ এস্থলে সাদৃশ্যরূপ ধর্মটি শৃঙ্গ, লাঙ্গূল প্রভৃতি স্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, গরুতে শৃঙ্গ, লাঙ্গূল প্রভৃতি ধর্ম বিদ্যমান। এখন এই ধর্মগুলিকে যদি আমরা গবয়রূপ প্রাণীতে দর্শন করি, তা হলে গবয়ে গোএর সাদৃশ্যের প্রতীতি হয়। কাজেই এস্থলে শৃঙ্গ, লাঙ্গূল প্রভৃতি ধর্মগুলিই সাদৃশ্যরূপে প্রতীত হয়। এভাবে সাদৃশ্য দ্রব্যাদি পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কাজেই বৈশেষিকমতে, পদার্থ সাত প্রকার – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব।

এখন বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের স্বরূপ আলোচনা করা হচ্ছে –

দ্রব্য

বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল **দ্রব্য**। এখন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বৈশেষিকস্বীকৃত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে প্রথমেই কেন দ্রব্যের আলোচনা করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায় দ্রব্য হল গুণাদি সকল পদার্থের আধার; কারণ গুণাদি পদার্থ দ্রব্যেই সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত। আর গুণাদি সমস্ত পদার্থ হল আধেয়। এখন নিয়ম আছে, আধার সিদ্ধ হলে তবেই আধেয় সিদ্ধ হতে পারে। তাই আধেয় গুণাদির আলোচনার পূর্বে আধারস্বরূপ দ্রব্যরূপ পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্রব্য অনিত্য গুণ, কর্ম প্রভৃতির সমবায়িকারণ হয়ে থাকে। এখন আমরা জানি কারণ সর্বদা কার্যের পূর্ববর্তী হয় এবং কার্য হল কারণের পরবর্তী। তাই বৈশেষিক-আচার্যগণ প্রথমেই দ্রব্যের আলোচনা করেছেন। দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্"[৮৬]। এখানে দ্রব্যের তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যা ক্রিয়াবৎ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় হয় তা হল দ্রব্য, কিন্তু এটি দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ নয়। কারণ আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা – এই চারটি দ্রব্য বিভু হওয়ায় নিষ্ক্রিয়। তাই দ্রব্যের দ্বিতীয় লক্ষণটি বলা হয়েছে – 'গুণবত্ত্ব' অর্থাৎ যা গুণের আশ্রয় হয় তা হল দ্রব্য। কিন্তু এটিও দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ হতে পারে না। কারণ উৎপত্তিকালীন দ্রব্য গুণের আশ্রয় হয় না, তা গুণহীন হয়ে থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকমতে পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা ও মন হল নিত্য দ্রব্য। তাই এদের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু পরমাণু ভিন্ন পৃথিব্যাদির দ্ব্যণুক হতে শুরু করে সকল পার্থিব দ্রব্যমাত্রই অনিত্য, যেহেতু এদের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। এই অনিত্য উৎপত্তিবিনাশশীল দ্রব্যমাত্রই উৎপত্তিক্ষণে গুণহীন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ক্ষণে তাতে গুণ উৎপন্ন হয়। কারণ বৈশেষিকমতে, গুণ যে আশ্রয়ে থাকে তা হল গুণের সমবায়িকারণ। আর যা কারণ তা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হয়ে থাকে এবং কার্য-কারণের নিয়ত পরবর্তী হয়। যেমন – কপালাদিতে ঘট সমবায়-

[৮৬] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৪৬।

সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কাজেই কপালাদি হল ঘটের সমবায়িকারণ। এস্থলে ঘট উৎপত্তির অন্ততঃ একক্ষণ পূর্বে কপালাদি যে বিদ্যমান তা অবশ্য স্বীকার্য । তদনুরূপ দ্রব্য হল গুণের সমবায়িকারণ। যেহেতু দ্রব্যে গুণ সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। ফলত গুণ উৎপত্তির অন্ততঃ একক্ষণ পূর্বে দ্রব্য অবশ্যই অস্তিত্বশীল। ঐ একটি ক্ষণেই দ্রব্য গুণহীন থাকে। কাজেই গুণাশ্রয়ত্বকে দ্রব্যের লক্ষণ বললে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এই অব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য আচার্যগণ বলেন প্রদত্ত স্থলে 'গুণবত্ত্ব' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মাধব সরস্বতী তাঁর '*মিতভাষিণী*' টীকাতে বলেছেন – 'যদ্বা গুণাত্যন্তাভাববিরোধিমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বিবক্ষিতম্'[৮৭] অর্থাৎ যা গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ হয় তা দ্রব্য, কারণ দ্রব্যে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না। দ্রব্য হল গুণের আশ্রয়। উৎপত্তিকালীন দ্রব্য উৎপত্তিক্ষণে নির্গুণ হলেও দ্বিতীয়-তৃতীয় ক্ষণে তাতে গুণ বিদ্যমান থাকে। তাই তা গুণের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না। অত্যন্তাভাব হল ত্রৈকালিক অভাব, কাজেই 'গুণবত্ত্ব' এর অর্থ করতে হবে – গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব তথা প্রতিযোগিব্যধিকরণ গুণাভাবশূন্যত্ব। গুণাভাবের প্রতিযোগী হল গুণ। যেখানে গুণাভাব থাকে সেখানে যদি পরবর্তিকালে গুণ থাকে তা হলে গুণাভাব ও তার প্রতিযোগী গুণ সমানাধিকরণ হয়, প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না। যেখানে গুণাভাব থাকে সেখানে যদি গুণ কখনও থাকে তা হলে সেই গুণাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয়। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণাভাব থাকলেও সেই গুণাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না। কারণ ঐ দ্রব্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয়। তা হলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে দ্রব্য-লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু তা হলেও আপত্তি থেকেই যায় – যে ক্ষণে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার পরক্ষণেই যদি সেই দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সেই দ্রব্যটিও কোনও কালেই গুণের আশ্রয় হতে পারে না। এমন দ্রব্য গুণের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয়ে যাচ্ছে, অনধিকরণ হচ্ছে না।

---

[৮৭] Tarkartirtha, Amarendra Mohan and Narendra Chandra Vedantatirtha (ed.), Sivaditya's *Saptapadarthi* (with three commentaries), Calcutta, Metropolitan Printing House Limited, 1994, page- 88-89.

ফলস্বরূপ এমন উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যে উক্ত দ্রব্য লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এই জন্য দ্রব্যের তৃতীয় লক্ষণ বলা হয়েছে – ‘‘সমবায়িকারণং দ্রব্যম্’’ অর্থাৎ ‘‘সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বম্ দ্রব্যত্বম্’। দ্রব্য যেহেতু সমবায়িকারণ হয় সেহেতু সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হবে দ্রব্যত্ব। আর এই দ্রব্যত্বের আশ্রয় হল দ্রব্য। প্রশস্তপাদাচার্য ‘দ্রব্যত্ববত্ত্ব’ কেই দ্রব্যের লক্ষণ বলেছেন। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে যেমন দ্রব্যত্ববত্ত্ব থাকে, তেমনি উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যেও দ্রব্যত্ববত্ত্ব থাকে। কাজেই অব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। সুতরাং ‘দ্রব্যবত্ত্বং দ্রব্যত্বম্’ এটিই হল দ্রব্যের লক্ষণ। কিন্তু এস্থলে পুনরায় আপত্তি করে বলা হয় যে, উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যে দ্রব্যের উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি থেকেই যায়। কারণ উৎপত্তির পরক্ষণেই যে দ্রব্য বিনষ্ট হয় তা কখনও সমবায়িকারণ হয় না। যে অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে কার্যটি উৎপন্ন হয় তাকে সমবায়িকারণ বলে। কিন্তু যে অধিকরণটি উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়ে যায়, তাতে সমবায়-সম্বন্ধে কোনও কিছু উৎপন্ন হতেই পারে না। ফলত এমন দ্রব্যেকে সমবায়িকারণ বলা সঙ্গত হবে না। সুতরাং অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যায়। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্য বৈশেষিক-সম্মত নয়। যে দ্রব্য উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাকে উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্য বলা হয়। বৈশেষিকাচার্যগণ এমন উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যই স্বীকার করেন না। কারণ তাঁদের মতে সকল জন্য দ্রব্যের নাশে স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশই কারণ হয়ে থাকে। যেমন – পট নাশের প্রতি তন্তুসংযোগনাশ কারণ হয়। এখন যা কারণ তা কার্যের নিয়ত পূর্বকালবৃত্তি হয়। পট উৎপন্ন হতে গেলে দণ্ড, তুরী, বেমা প্রভৃতি কারণকে তার পূর্বে অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু সমবায়ী কিংবা অসমবায়ী কারণকে কার্য উৎপত্তির পূর্বে যেমন থাকতে হয় তদনুরূপ কার্যোৎপত্তিক্ষণেও তাদের থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তন্তু-সংযোগ যেমন পট-উৎপত্তির পূর্বক্ষণে থাকে তদনুরূপ পট-উৎপত্তিক্ষণেও থাকতে হবে, তা না হলে পট উৎপন্ন হবে না। কিন্তু এমন স্বীকার করলে আর উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্য স্বীকার করা যাবে না। কারণ এমতাবস্থায় কার্যোৎপত্তির পরক্ষণে তার বিনাশ সম্ভব হবে না। যখন কোনও দ্রব্য উৎপন্ন হবে পরক্ষণে তার বিনাশ স্বীকার করতে হলে ঐ দ্রব্যটির উৎপত্তিক্ষণে

দ্রব্যটির বিনাশের যে কারণ অসমবায়িকারণের নাশ তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এমনটা হতে পারে না। কারণ পটোৎপত্তির ক্ষেত্রে উৎপত্তিক্ষণেও তার অসমবায়িকারণকে অর্থাৎ তন্তু-সংযোগকে স্বীকার করতে হবে। তা না হলে পটোৎপত্তি সম্ভব হবে না। তাই বৈশেষিকমতে উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্য স্বীকার করা যায় না। কাজেই এমন উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যে উক্ত দ্রব্য লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। এজন্য শিবাদিত্য দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দ্রব্যং তু দ্রব্যত্বসামান্যযোগি গুণবৎ সমবায়িকারণং চেতি'[৮৮]।

বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি'’[৮৯] অর্থাৎ বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার; যথা - পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। এর ন্যূন্যধিক দ্রব্য বৈশেষিক-দর্শনে সমালোচিত ও খণ্ডিত হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে ভাট্টমীমাংসা ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় অন্ধকারকে দশম দ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণ অন্ধকারকে পৃথক দ্রব্য হিসাবে স্বীকারই করেন না। মীমাংসামতে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ অনুভব আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে আর যা আমাদের প্রত্যক্ষানুভব সিদ্ধ তার সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। মীমাংসা-দর্শনে স্বীকৃত এই অন্ধকার নামক পদার্থটি বৈশেষিক-সম্মত সম্মত সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ সমবায়-সম্বন্ধের জ্ঞান হতে গেলে তার সম্বন্ধিদ্বয়ের জ্ঞান-আবশ্যক। কিন্তু অন্ধকার প্রত্যক্ষে আমাদের কোনও সম্বন্ধীর জ্ঞান হয় না। কাজেই অন্ধকারকে সমবায় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অন্ধকার বিশেষ নামক পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আশ্রয়ের জ্ঞান ব্যতীত বিশেষের উপলব্ধিই হয় না। কিন্তু অন্ধকার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আশ্রয়ের জ্ঞান আমাদের হয় না। অনুরূপভাবে অন্ধকারকে সামান্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ অন্ধকার যদি সামান্যের অন্তর্ভুক্ত হত, তা হলে সামান্যের

---

[৮৮] Tarkartirtha, Amarendra Mohan and Narendra Chandra Vedantatirtha (ed.), Sivaditya's *Saptapadarthi* (with three commentaries), Calcutta, Metropolitan Printing House Limited, 1994, page- 88-89.

[৮৯] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ২৮।

যা অভিব্যঞ্জক তা অন্ধকারেরও অভিব্যঞ্জক হত; কিন্তু তা হয় না। আলোক সামান্যের অভিব্যঞ্জক হয় কিন্তু অন্ধকারের অভিব্যঞ্জক হয় আলোকাভাব। প্রকাশকার বলেছেন – 'তস্য চ আলোকোঽয়ং ব্যঞ্জকঃ'[৯০]। তা ছাড়া সামান্যের আশ্রয় যে ব্যক্তি তার উপলব্ধি ব্যতীত সামান্যের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু অন্ধকার প্রত্যক্ষে কোনও রূপ ব্যক্তিরই উপলব্ধি হয় না। অন্ধকারকে কর্ম-পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; কারণ কর্ম সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধকারের দ্বারা কোনও বস্তু কোনও দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না কিংবা বিভক্তও হয় না। কাজেই অন্ধকার কর্ম-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত-এমন বলা যায় না। অন্ধকারকে গুণ-পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গুণমাত্রই দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু অন্ধকার বৈশেষিকস্বীকৃত পৃথিব্যাদি নয়টি দ্রব্যের কোনওটিতেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। যদিও অন্ধকার একটি জন্য দ্রব্য হওয়ায় তার অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কারণ জন্য দ্রব্যমাত্রই তার অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান। মীমাংসামতে তা অভাব-পদার্থেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর এবং অনুযোগীর অর্থাৎ অধিকরণের জ্ঞানের অধীন। কিন্তু অন্ধকার প্রত্যক্ষস্থলে অন্য কোনও পদার্থের জ্ঞানই হয় না। কাজেই অন্ধকার গুণ হতে ভিন্ন, সামান্য হতে ভিন্ন, বিশেষ হতে ভিন্ন, সমবায় হতে ভিন্ন, কর্ম হতে ভিন্ন - এভাবে পরিশেষানুমানের দ্বারা তা দ্রব্য-পদার্থ হিসাবে গৃহীত হবে। তবে মীমাংসামতে অন্ধকার দ্রব্য-পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত হলেও তা পৃথিব্যাদি নয় প্রকার দ্রব্যের কোনওটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অতিরিক্ত দশম পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত। অভিপ্রায় এই যে, প্রাত্যহিক জীবনে অন্ধকার প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ-

'তমঃ খলু চলং নীলং পরাপরবিভাগবৎ।

প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্যান্নবভ্যো ভেত্তুমর্হতি'[৯১]।

---

[৯০] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা – ১৬৭।

[৯১] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৭৯।

অর্থাৎ ‘অন্ধকার নীল’ (কৃষ্ণবর্ণ), ‘অন্ধকার গতিশীল’ - এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব আমাদের প্রত্যকেরই হয়ে থাকে। আর যা গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় হয়, তাকে দ্রব্য বলা হয়ে থাকে। কাজেই অন্ধকার একটি দ্রব্য-পদার্থ হিসাবে গণ্য হবে। তবে তা দ্রব্য হলেও জল কিংবা তেজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ পৃথিব্যাদির স্পর্শ গুণ রয়েছে কিন্তু অন্ধকারের স্পর্শ নেই। অন্ধকারকে বায়ুর অন্তর্ভুক্ত এমন বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকমতে বায়ু স্পর্শযুক্ত কিন্তু রূপহীন। অপরদিকে অন্ধকারের স্পর্শ নেই কিন্তু মীমাংসামতে অন্ধকার নীলরূপযুক্ত। কাজেই তা বায়ুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তা আকাশ, দিক্, কাল কিংবা আত্মারও অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা বিভু দ্রব্য হওয়ায় তা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মীমাংসামতে অন্ধকার গতিবিশিষ্ট। তা মনেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ বৈশেষিকমতে মন অণুপরিমাণ; তাই তা অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু অন্ধকার মীমাংসামতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। কাজেই অন্ধকার বৈশেষিক-সম্মত নয়প্রকার দ্রব্যের কোনও একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়; অথচ রূপ, পরত্ব, অপরত্ব, সংযোগ, বিভাগ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব প্রভৃতি গুণ ও গতিরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় হয়। কাজেই মীমাংসামতে তা পৃথিব্যাদি হতে অতিরিক্ত দশম দ্রব্যরূপেই পরিগণিত।

বৈশেষিক-দর্শনে অন্ধকারের পৃথক দ্রব্যত্ব খণ্ডিত হয়েছে। মীমাংসকগণ রূপাদি গুণ ও গতিরূপ ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলেছেন। কিন্তু বৈশেষিকমত অন্ধকারে যদি বাস্তবতই রূপাদি গুণ কিংবা ক্রিয়া থাকত, তা হলে আলোকসহকৃত চক্ষুজন্য তার প্রত্যক্ষ হত, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। অভিপ্রায় এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবিষয়ের সংযোগ যেমন আবশ্যক, তদনুরূপ সহকারিকারণ হিসাবে আলোকের উপস্থিতিও আবশ্যক। আলোক সহকারী কারণ হিসাবে না থাকলে কোনও বস্তুকে রূপবান হিসাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষস্থলে আলোক উপস্থিত থাকে না। আলোকের অভাব উপস্থিত থাকে। আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকার গৃহীত হয়। কাজেই রূপাদি গুণের আশ্রয়রূপে অন্ধকারকে পৃথক দ্রব্য বলা যায় না। তাছাড়া অন্ধকারকে দ্রব্য বলা হলে হয় তা নিরবয়ব দ্রব্য হবে, না হলে সাবয়ব দ্রব্য হবে। অন্ধকারকে নিরবয়ব দ্রব্য বলা যায়

না কারণ পরমাণুর ন্যায় তা নিরবয়ব হলে অতীন্দ্রিয় হবে। আবার তাকে সাবয়ব দ্রব্যও বলা যায় না কারণ অন্ধকারের স্পর্শ নেই। তাই বৈশেষিক-দর্শনে অন্ধকারকে পৃথক দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। এস্থলে মীমাংসকগণ বলতে পারেন, 'অন্ধকার নীলরূপবান' কিংবা 'অন্ধকার গতিশীল' এরূপ অনুভব তো সর্বজনসিদ্ধ। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন, অন্ধকারে যে নীলরূপের জ্ঞান তা যথার্থ নয়, তা ভ্রমবিশেষ। ঈষৎ আলোকে রজ্জুতে আমাদের সর্প বলে যে জ্ঞান হয় তা যেমন যথাযথ নয়, তদনুরূপ অন্ধকারের রূপবত্ত্বার যে জ্ঞান তাও ভ্রমবিশেষ। এখন পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলতে পারেন - স্বল্প আলোতে যখন আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়ে থাকে তার কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট আলোকে 'এটি সর্প নয়' এরূপ বাধক প্রতীতি হয়ে থাকে। তখনই আমরা বুঝতে পারি পূর্বের 'এটি সর্প' এই জ্ঞানটি ভ্রম। কিন্তু 'অন্ধকার নীল' কিংবা 'অন্ধকার গতিশীল' এই জ্ঞান হওয়ার পরবর্তী সময়ে 'অন্ধকার অনীল' কিংবা 'অন্ধকার অগতিশীল' এরূপ বাধক-প্রতীতি আমাদের হয় না। তা হলে কীভাবে অন্ধকারকে ভ্রম বলা যেতে পারে? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন, পূর্বেই বলা হয়েছে – অন্ধকার যদি রূপের অধিকরণ হত তা হলে তা আলোকসহকৃত চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য হত। কারণ রূপ কখনও আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হতে পারে না। কাজেই আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুঃগ্রাহ্যত্বই হল অন্ধকারের রূপবত্ত্বার বাধক। তাই ন্যায়বৈশেষিকমতে অন্ধকারে রূপবত্ত্বার কিংবা গতিবত্ত্বার জ্ঞান ভ্রমবিশেষ। ফলত অন্ধকারকে দ্রব্য বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, অন্ধকারের জ্ঞান আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে তা হলে বৈশেষিকাচার্যগণ কি এই সর্বজনের অনুভূত অন্ধকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন? এর উত্তরে বলা যায়, বৈশেষিক-দর্শনে অন্ধকারের পৃথক দ্রব্যত্ব খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের সত্তা অস্বীকৃত হয়নি। কারণ বৈশেষিকমতে যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় কিংবা জ্ঞানের বিষয় হওয়ার যোগ্য তা সপ্ত-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। যদিও মীমাংসক সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁরা অন্ধকারকে পৃথক দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করেন না। মহর্ষি কণাদ অন্ধকারকে অভাব নামক সপ্তম পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, অন্ধকার পৃথক

দ্রব্য নয়, তা হল আলোকের অভাবস্বরূপ। তবে যৎকিঞ্চিৎ আলোকের অভাব অন্ধকার নয়। কারণ ধরাযাক, একটি ঘরে চারটি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে, সেই ঘরে যদি একটি বাল্ব নিভিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোকের অভাব ঘটে। কিন্তু তাকে অন্ধকার বলা যায় না। তাই বলতে হবে, 'পৌঢ়প্রকাশক-তেজঃসামান্যের অভাব'ই হল অন্ধকার। এখানে উল্লেখ্য যে, যৎকিঞ্চিৎ তেজের অভাব অন্ধকার নয়; তার মানে এই নয় যে যাবৎ তেজের অভাব হল অন্ধকার। কারণ যাবৎ তেজের অভাবকে অন্ধকার বলা হলে সেই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ কখনও সম্ভব হবে না। যেহেতু অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির জ্ঞান কারণ হয়ে থাকে। কাজেই যাবৎ তেজের অভাবরূপ অন্ধকার প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগী যাবৎ তেজের জ্ঞান কারণ হবে। কিন্তু বিশ্বের যাবৎ তেজের জ্ঞান আমাদের মতো অল্পধীবিশিষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই 'পৌঢ়প্রকাশক-তেজঃসামান্যাভাব'কে অন্ধকার বলতে হবে। 'পৌঢ়প্রকাশক-তেজঃ' বলতে বোঝায় প্রকৃষ্ট ও মহত্ত্বের সমানাধিকরণ উদ্ভূত ও অনভিভূত তেজ। আর এরূপ প্রকৃষ্টমহত্ত্বোদ্ভূতানভিভূতরূপবৎ তেজের অভাবকেই বৈশেষিকাচার্যগণ অন্ধকার বলেছেন। অভিপ্রায় এই যে, চক্ষু তেজপদার্থ হলেও তার রূপ অনুদ্ভুত। তাই অন্ধকার ঘরে চক্ষু থাকলেও অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। আবার সুবর্ণও তেজপদার্থ। কিন্তু তার রূপ পার্থিব রূপের দ্বারা অভিভূত। তাই অন্ধকার ঘরে সুবর্ণস্বরূপ তেজের উপস্থিতিতেও অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। তৈজস পরমাণু বা দ্ব্যণুকের রূপটি উদ্ভূত ও অনভিভূত হলেও তা মহত্ত্বসমানাধিকরণ নয়। যেহেতু পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতিতে মহত্ত্ব থাকে না। কিন্তু তৈজস ত্র্যণুকের রূপটি মহত্ত্বসমানাধিকরণ উদ্ভূত ও অনভিভূত। এতদ্‌সত্ত্বেও অন্ধকার ঘরে তৈজস ত্র্যণুক উপস্থিত থাকলেও অর্থাৎ ত্র্যণুকরূপ তেজকণিকার উপস্থিতিতেও অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে; এর কারণ হল তৈজস ত্র্যণুকে মহত্ত্ব থাকলেও প্রকৃষ্টমহত্ত্ব নেই। যে মহত্ত্বসমানাধিকরণ রূপবৎ তেজ থাকলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় তাকে প্রকৃষ্টমহত্ত্ব বলে। যেমন – প্রদীপাদিতেজের মহত্ত্ব হল প্রকৃষ্ট মহত্ত্ব আর রূপ হল উদ্ভূত ও অনভিভূত। কাজেই প্রদীপ প্রভৃতি তেজ হল প্রকৃষ্টমহত্ত্বসমানাধিকরণ উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপবৎ তেজ। আর এরূপ তেজঃসামান্যের অভাবই হল অন্ধকার।

যদিও অনেক আচার্য অন্ধকারকে অভাবস্বরূপ বলাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যেমন - ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য অন্ধকারকে অভাবস্বরূপ না বলে তেজের অত্যন্তাভাবস্থলে আরোপিত রূপবিশেষকেই অন্ধকার বলেছেন। তাঁর মতে, 'তস্মাৎ রূপবিশেষোঽয় – মত্যন্তং তেজোঽভাবে সতি সর্বত সমারোপিতস্তম ইতি প্রতীয়তে'[৯২]। যাঁরা আলোকাভাবকে অন্ধকার বলেন না তাঁদের যুক্তি হল – আলোকাভাব যদি অন্ধকার হত তা হলে অন্ধকারের চাক্ষুষ প্রতীতি সম্ভব হত না। কারণ আলোকসহযোগিত্ব ব্যতিরেকে চাক্ষুষ প্রতীতি হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি অভাবের জ্ঞান হতে গেলে পূর্বে তার প্রতিযোগীর জ্ঞান আবশ্যক। এখন আলোকাভাবকে যদি অন্ধকার বলা হয় তা হলে আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের জ্ঞান হতে গেলে পূর্বে তার প্রতিযোগী আলোকের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকালে কিংবা গিরিগহ্বরাদিতে দিবাভাগেও যে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে সেখানে আলোক উপস্থিত থাকে না। তৃতীয়ত, অভাবের প্রত্যক্ষে তার অধিকরণের জ্ঞান আবশ্যক। যেমন – 'ভূতলে ঘটাভাব' প্রত্যক্ষস্থলে পূর্বে ভূতলের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ আবশ্যক হয়ে থাকে না। ভূতলের সঙ্গে চক্ষু সংযুক্ত হলে পরই ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধকার প্রত্যক্ষস্থলে কোনওরূপ অধিকরণের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। চতুর্থত, অভাবের জ্ঞান সর্বদা নিষেধমুখে হয়ে থাকে। অভিপ্রায় এই যে, ভূতলে ঘটাভাবস্থলে যখন চক্ষুর সঙ্গে ভূতলরূপ অধিকরণের সংযোগ হয়, তখন 'ভূতলে ঘট নেই' এরূপ নিষেধমুখে অভাবের জ্ঞান হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধকারের জ্ঞান নিষেধমুখে হয় না, তা বিধিমুখে হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্ধকার প্রত্যক্ষস্থলে 'এখানে অন্ধকার আছে' কিংবা 'ওখানে বেশি অন্ধকার রয়েছে' এরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে। কাজেই অন্ধকারকে আলোকাভাবস্বরূপ বলা সঙ্গত হবে না। এরূপ পূর্বপক্ষীর মতের সমালোচনা করে *কিরণাবলীকার* উদয়নাচার্য বলেছেন – ঘট, পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষস্থলে আলোক সহকারী কারণ হিসাবে অপেক্ষিত হলেও সর্বত্র চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে আলোক অপেক্ষিত-এমন বলা যায় না। যেমন – আলোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে

---

[৯২] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৮৯-৯০।

আলোকের সহযোগীতা আমরা কেউ স্মরণেই আনি না। আলোক-সংযোগ-ব্যতীতই আলোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার্ নিশীথে কিংবা পর্বতের গুহায় দিবাভাগেও যে আলোকাভাবরূপ অন্ধকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে সেস্থলে অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীজ্ঞান সাপেক্ষ হওয়ায় প্রদত্ত স্থলে আলোকের জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার্ রাত্রিতে কিংবা গিরিগহ্বরাদিতে দিবাভাগেও কোনওরূপ আলোক থাকে না। অথচ সে স্থলে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কাজেই অন্ধকারকে আলোকাভাব স্বরূপ বলা সঙ্গত হবে না – এমন আপত্তিও যথাযথ নয়। কারণ প্রদত্ত স্থলগুলিতে অন্ধকার প্রত্যক্ষ কালে আলোকের উপস্থিতি না থাকলেও ব্যক্তির আলোকের পূর্ব জ্ঞান অবশ্যই থাকে। এখন যদি বলা হয়, যিনি যোগীপুরুষ বহুকাল ধ্যানে মগ্ন, পর্বতের গুহা হতে কখনওই বের হন না এমন ব্যক্তিরও অন্ধকার প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। অথচ পূর্বে তাঁর তো আলোকের জ্ঞান নেই। এর উত্তরে বলা হয় যোগী ব্যক্তি যদি নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন তা হলে তাঁর পক্ষে অন্ধকার প্রত্যক্ষ করা সম্ভবই নয়। আর যদি তিনি অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করেও থাকেন, তা হলে মানতে হবে নিশ্চয়ই পূর্বে তাঁর আলোকের জ্ঞান ছিল; কিংবা যোগজ শক্তি বলে তাঁর আলোকের জ্ঞান হয়েছে। তৃতীয়ত, ভূতলে ঘটাভাব প্রত্যক্ষস্থলে ভূতলরূপ অধিকরণের জ্ঞান অপেক্ষিত – একথা সত্য হলেও অভাবের চাক্ষুষ প্রতীতি মাত্রেরই অধিকরণের চাক্ষুষ জ্ঞান আবশ্যক তা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বায়ুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে রূপরহিত বায়ুর চাক্ষুষ প্রতীতি অপেক্ষিত নয়। কারণ বায়ু কখনও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। চতুর্থত, নিষেধমুখে অন্ধকারের প্রতীতি হয় না মানেই তার প্রতীতি বিধিমুখে হয় এমনটা বলা যায় না। কারণ 'নঞ' শব্দের প্রয়োগ কেবল না, নয় প্রভৃতি আকারে হয় তা নয়; প্রলয়, বিনাশ প্রভৃতি শব্দও অভাবকে নির্দেশ করে। কাজেই অন্ধকারের প্রতীতি নিষেধমুখে হয় না বলেই তাকে অভাব-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না – এমন আপত্তি নিরর্থক। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন অন্ধকার অতিরিক্ত দ্রব্য নয়; তা আলোকাভাবস্বরূপ। আর অন্ধকারকে যে আমরা গতিশীল দেখি কিংবা নীল (কৃষ্ণ) রূপবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করি তা

এক প্রকার ভ্রান্তিবিশেষ। ভ্রমবশতঃই সচল আলোকের স্থলে অন্ধকারকেই আমরা সচল বলে প্রত্যক্ষ করে থাকি। অন্ধকারের যদি স্বাভাবিক গতি থাকত তা হলে তার গতির জ্ঞানের জন্য দ্রব্যান্তরের আবশ্যকতা থাকত না। কিন্তু অন্ধকারকে গতিবিশিষ্ট রূপে আমরা তখনই জানতে পারি যখন পূর্বে আবরক প্রদীপাদির আলোকের জ্ঞান থাকে। অন্ধকারের প্রদীপ নিয়ে অগ্রসর হলে আমরা অন্ধকারকে সরে যেতে দেখি। কাজেই অন্ধকারের গতি স্বাভাবিক নয়; তা আরোপিত। তদনুরূপ অন্ধকারে যে নীলগুণবত্ত্ব (কৃষ্ণগুণবত্ত্ব) –এর প্রতীতি হয় তা স্বরূপতঃ অন্ধকারের গুণ নয়। অন্ধকারের বিরোধী যে শুক্লভাস্বর তার সঙ্গে নীল গুণের বিরোধ থাকায় স্ববিরোধীবিরোধীত্বরূপ সারূপ্য নিবন্ধন অন্ধকারে নীলরূপের আরোপ হয়ে থাকে। যদিও ন্যায়কন্দলীকার আচার্য শ্রীধর বিনিগমনা না থাকায় আলকাভাবকে অন্ধকার না বলে আলোকের অত্যন্তাভাবস্থলে আরোপিত নীলিমাকেই অন্ধকার বলেছেন। কিরণাবলীকার আচার্য উদয়ন কন্দলীকারের মতের প্রত্যুত্তরে বলেছেন – 'অন্ধকার নীলরূপবিশিষ্ট' এরূপ অনুভব আমাদের হয়ে থাকে; পরন্তু 'নীলিমাই অন্ধকার' এরূপ অনুভব আমাদের হয় না। নিলিমাই যদি অন্ধকার হত তা হলে সাদা বস্ত্রে নীল রঙ করা হলে তাতে অন্ধকার বুদ্ধি উৎপন্ন হত। কিন্তু এরূপ নীলাভ বস্ত্র মাত্রেই অন্ধকার বুদ্ধি আমাদের হয় না। তাছাড়া আরোপিত নীলিমাই যদি অন্ধকার হত, তা হলে নীলবুদ্ধি এবং অন্ধকার বুদ্ধি, নীল সংজ্ঞা এবং অন্ধকার সংজ্ঞা এক বিষয়ক হওয়ায় 'নীলং তমঃ' এরূপ প্রয়োগ ব্যর্থ হত। সুতরাং আলোকাভাব স্থলে আরোপিত নীলিমাকে অন্ধকার না বলে আলোকাভাবকেই অন্ধকার বলা সঙ্গত। যেহেতু অন্ধকার প্রতীতি স্থলে নিয়তভাবে আলোকাভাবেরই প্রতীতি হয়ে থাকে।

কোনও কোনও আচার্য্য শব্দ ও সুবর্ণকে বৈশেষিক-সম্মত পৃথিব্যাদি দ্রব্য হতে অতিরিক্ত পৃথক দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণের মতে শব্দকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলা যায় না। তাঁরা শব্দকে গুণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তদনুরূপ সুবর্ণের পৃথক দ্রব্যত্বও তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা সুবর্ণকে তেজ নামক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত

করেন। কাজেই বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার – পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন।

পৃথিবীঃ বৈশেষিক-সম্মত নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে প্রথম দ্রব্য হল **পৃথিবী**। বৈশেষিকাচার্যগণ পৃথিবীত্ব জাতির আশ্রয়কেই পৃথিবী বলেছেন – 'পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধাৎ পৃথিবী- রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগ-পরত্বাপরত্ব-গুরুত্ব-দ্রবত্ব-সংস্কারবতী'[৯৩]। কারণ এই পৃথিবীত্ব ধর্মটি সমস্ত পার্থিব বস্তুতে বিদ্যমান থেকে স্বজাতীয় তথা অন্যান্য দ্রব্য, যেমন- জল, তেজ প্রভৃতি হতে এবং বিজাতীয় তথা গুণাদি পদার্থ হতে পৃথিবীকে ব্যাবৃত্ত করে। এই পৃথিবীত্ব জাতির সিদ্ধি প্রসঙ্গে আচার্যগণ বলেছেন- গন্ধনামক গুণটি পৃথিবীতে সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কাজেই পৃথিবী হল গন্ধের সমবায়ী কারণ। ফলত এই পৃথিবীতে থাকবে গন্ধের সমবায়িকারণতা। আর এই সমবায়িকারণতা নিশ্চিত কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবে। আর সেই অবচ্ছেদক ধর্মটি হল পৃথিবীত্ব। তাই পৃথিবীত্ববত্ত্বকেই পৃথিবীর লক্ষণ বলা হয়েছে। গন্ধনামক গুণটি কেবলমাত্র পৃথিবীতে থাকায় অনেক আচার্য গন্ধবত্ত্বকেও পৃথিবীর লক্ষণ বলেছেন। মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে – 'যদ্যপি গন্ধবত্ত্বমাত্রং পৃথিব্যা লক্ষণমুচিতং, তথাপি পৃথিবীত্ব-জাতৌ প্রমাণোপন্যাসায়কারণত্বমুপন্যস্তম্'[৯৪]। এখানে আপত্তি হতে পারে পাষাণে গন্ধের অনুভব আমাদের হয় না তা হলে পাষাণকে কি পার্থিব দ্রব্য বলা যাবে না? এর উত্তরে বলা যায়, পাষাণে উৎকট গন্ধ না থাকায় তা আমাদের কাছে অননুভূত। কিন্তু পাষাণ ভস্মে গন্ধের বিদ্যমানতাই প্রমাণ করে যে পাষাণ গন্ধযুক্ত। কাজেই তা পার্থিব দ্রব্যরূপেই বিবেচিত। এখন অনেক সময় আমাদের জলে কিংবা বায়ুতে ও গন্ধের বোধ হয়ে থাকে; তা থেকে মনে হতেই পারে জল কিংবা বায়ুও তো গন্ধের আশ্রয় হয়। এর উত্তরে বলা যায় জল কিংবা বায়ু কখনও গন্ধের আশ্রয় হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বায়ুতে কিংবা জলে পার্থিব অংশ মিশ্রিত থাকলে সেখানে আমাদের গন্ধের অনুভব হচ্ছে

---

[৯৩] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৫৪।

[৯৪] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ১৩৫-১৩৬।

বলে মনে হয়। যেমন- বাতাসে আমরা ফুলের গন্ধ পাই প্রকৃতপক্ষে বাতাসে ফুলের গন্ধ নেই। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফুলের রেনু বাতাসে মিশ্রিত হলে 'বাতাসে ফুলের সুবাস ভাসছে' বলে আমাদের বোধ হয়। কাজেই সমবায়-সম্বন্ধে গন্ধের আশ্রয়কেও পৃথিবী বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বৈশেষিকমতে পৃথিবীনামক দ্রব্যটি গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার (বেগ ও স্থিতিস্থাপক)- এই চতুর্দশ গুণের আশ্রয় হয়। তবে গন্ধনামক গুণটি কেবলমাত্র পৃথিবীতেই থাকে, অন্য কোনও দ্রব্যে থাকে না। তাই গন্ধবত্ত্বকে পৃথিবীর লক্ষণ বলা হয়েছে। কিন্তু গন্ধবত্ত্বকে পৃথিবীর লক্ষণ বলা হলে উৎপত্তিকালীন গন্ধহীন ঘট কিংবা বিজাতীয় গন্ধবিশিষ্ট কপালজন্য উৎপন্ন গন্ধহীন ঘটে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হবে। তাই পৃথিবীত্ববত্ত্বকে পৃথিবীর লক্ষণ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, যাতে গন্ধ থাকে তাকেই পৃথিবী বলা হয়েছে। কিন্তু উৎপত্তিকালীন যে ঘট তা তো গন্ধহীন হয়ে থাকে। ফলত লক্ষ্যে লক্ষণ প্রযুক্ত হল না; কাজেই অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এর উত্তরে যদি বলা হয় 'গন্ধবত্ত্ব' এর অর্থ করতে হবে- 'গন্ধসমবায়িকারণত্ব' অর্থাৎ যে দ্রব্যটি গন্ধের সমবায়িকারণ হয় তাকে পৃথিবী বলা হয়। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যটি উৎপত্তিক্ষণে গন্ধহীন হলেও পরক্ষণে তাতে সমবায়-সম্বন্ধে গন্ধ উৎপন্ন হয়। কাজেই তা গন্ধের সমবায়িকারণ হয়। ফলত অব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। এতদ্ সত্ত্বেও আপত্তি হয় বিজাতীয় গন্ধবিশিষ্ট কপাল জন্য উৎপন্ন ঘটে কখনও গন্ধ উৎপন্ন হয় না। কারন, ঘট তার কপালদ্বয়ে সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। এই কপালদ্বয় যদি বিজাতীয় গন্ধবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ একটি সুগন্ধযুক্ত এবং আরেকটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তা হলে এরূপস্থলে উৎপন্ন ঘটটিতে কোনও গন্ধই থাকবে না। কারণ দুই কপালে স্থিত দুইপ্রকার গন্ধ পরস্পরের প্রতিবন্ধকতা করায় কোনও প্রকার গন্ধ উৎপন্ন হবে না। সুতরাং বিজাতীয় গন্ধবিশিষ্ট ঘট কখনও গন্ধের সমবায়িকারণ হয় না। এরূপ ঘটে তো উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। এই অব্যাপ্তি পরিহারের নিমিত্ত পৃথিবীত্ব জাতির আশ্রয়কেই পৃথিবী বলা হয়েছে। উৎপত্তিকালীন ঘটে যেমন পৃথিবীত্ব থাকে, তেমনই বিজাতীয় গন্ধবিশিষ্ট কপালজন্য ঘটেও পৃথিবীত্ব বিদ্যমান। কাজেই পৃথিবীত্বই হল পৃথিবীর লক্ষণ।

বৈশেষিকাচার্যগণ পৃথিবীর লক্ষণ-প্রসঙ্গে বলেছেন - 'সা তু দ্বিবিধা – নিত্যা অনিত্যা চ। পরমাণুলক্ষণা নিত্যা। কার্যলক্ষণাত্বনিত্যা'[৯৫]। অর্থাৎ পৃথিবী নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুস্বরূপ পৃথিবী হল নিত্যপৃথিবী। অভিপ্রায় এই যে, কোনও পার্থিব বিষয়কে তথা ঘটাদিকে যদি আমরা অবয়বে বিভক্ত করতে থাকি তা হলে শেষপর্যায়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হব যাকে আর বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। সেই অবিভাজ্য অবস্থার নাম হল পরমাণু। এখন এমনও বলা যাবে না যে কোনও পার্থিব দ্রব্যকে বিভাগ করে তারও বিভাগ আবার তার বিভাগ এমন চলতে থাকবে। এই বিভাগের কোনও শেষ সীমা থাকবে না। এমন বললে অনবস্থাদোষ দেখা দেবে। আবার বিভাগের শেষে শূন্যতা পাব এমনও বলা সঙ্গত হবে না। কারণ যখন আমরা একটি ঘটকে বিভক্ত করি, তখন কিছু খণ্ড পাই আবার সেই খণ্ডগুলোকে বিভক্ত করলে আরও কিছু খণ্ড পাই। এভাবে যতদূর এগোনো হোক না কেন শূন্যতায় উপনীত হব না। কিছু না কিছু খণ্ডাংশ অবশিষ্ট থাকে, যাকে আর বিভাগ করা যাবে না সেই অবিভক্ত, অবিভাজ্য কণাসমূহকে বৈশেষিক-দর্শনে পরমাণু বলা হয়েছে, এইপরমাণু নিরাবয়ব ও নিরংশ। এদের উৎপত্তি ও বিনাশ নেই তাই পরমাণুকে নিত্য অবস্থা বলা হয়েছে। যাই হোক পরমাণুরূপে যে পার্থিব অবস্থা তাকে বৈশেষিকাচার্যগণ নিত্য পৃথিবী বলেছেন। অপরদিকে দ্ব্যণুকাদি থেকে শুরু করে স্থূল পৃথিবী পর্যন্ত কার্যরূপ যে পৃথিবী তা হল অনিত্য পৃথিবী। যেহেতু কার্যরূপ পৃথিবীর উৎপত্তি রয়েছে আবার বিনাশও রয়েছে। এই কার্যস্বরূপ অনিত্য পৃথিবী আবার তিনপ্রকার যথা- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বৈশেষিক-দর্শনে যা হিতপ্রাপ্তি ও অহিতানুবৃত্তিরূপ চেষ্টার আশ্রয় হয় তাকে শরীর বলা হয়েছে। এই শরীর দুইপ্রকার- যোনিজ ও অযোনিজ। শুক্র ও শোণিতের সংযোগজন্য যে শরীর উৎপন্ন হয় তা হল যোনিজ শরীর। যোনিজ শরীর আবার জরায়ুজ ও অণ্ডজ ভেদে দ্বিবিধ। মনুষ্য, পশু প্রভৃতির যে শরীর তা হল জরায়ুজ। যেহেতু গর্ভবেষ্টনচর্ম-পাত্রবিশেষ হতে তথা জরায়ু হতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয়।

---

[৯৫] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৫৪।

অপরদিকে পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতির শরীরকে অণ্ডজ বলা হয়। আর শুক্র-শোণিতাদিকে অপেক্ষা না করেই যে শরীর উৎপন্ন হয় তাকে অযোনিজ শরীর বলা হয়। দেবতা ও ঋষিগণের শরীর অযোনিজ শরীরের উদাহরণ। এখন শরীরাশ্রিত যে দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তি অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করে তাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধ; এর জ্ঞান নাসিকানামক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই গন্ধের অভিব্যঞ্জক নাসিকা নামক ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পার্থিব ইন্দ্রিয় বলা হয়। আর শরীর ও ইন্দ্রিয়ভিন্ন যা জ্ঞায়মানরূপে উপভোগের সাধন হয় তাকে বিষয় বলা হয়। কাজেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ভিন্ন সমস্ত কার্য-পৃথিবীই হল বিষয়। বৈশেষিকমতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে উৎপন্ন পার্থিব বিষয় তিনপ্রকার- মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্থাবর। প্রাচীর, ইষ্টক প্রভৃতি হল মৃত্তিকারূপ পৃথিবী। পাথর, মণি, বজ্র প্রভৃতি হল পাষাণরূপ পৃথিবী। আর লতা, বৃক্ষ, বনস্পতি প্রভৃতিকে বৈশেষিকাচার্যগণ স্থাবররূপ পৃথিবী বলেছেন।

জলঃ বৈশেষিক-সম্মত দ্বিতীয় দ্রব্য হল **জল**। প্রশস্তপাদাচার্য জলনিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'অপ্‌ত্বাভিসম্বন্ধাদাপঃ'[৯৬]। অভিপ্রায় এই যে জলত্ব জাতির আশ্রয়ই হল জল। কারণ এই জলত্বজাতি কেবল জলেই থাকে এবং অন্যান্য স্বজাতীয় তথা পৃথিব্যাদি এবং বিজাতীয়পদার্থ তথা গুণ প্রভৃতি হতে জলকে পৃথক করে। *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থে জলত্বজাতি সিদ্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'স্নেহ-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়াজলত্ব-জাতি-সিদ্ধিঃ'[৯৭]। অভিপ্রায় এই যে স্নেহ নামক গুণটি সমবায়-সম্বন্ধে জলেই থাকে। কাজেই স্নেহনামক গুণের সমবায়ীকারণ হয় জল। এই জলে থাকে স্নেহের সমবায়িকারণতা। আর কারণতা নিরবচ্ছিন্ন হয় না, তা অবশ্যই কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাকে বলা হয় অবচ্ছেদক। প্রদত্ত স্থলে

[৯৬] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৮৪।

[৯৭] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ১৬৪।

স্নেহনামক[৯৮] গুণের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হবে জলত্ব[৯৯]। এই জলত্বকেই বৈশেষিকাচার্যগণ জলের লক্ষণ বলেছেন। পৃথিবীর ন্যায় জলেও চোদ্দটি গুণ থাকে, যথা- রূপ, রস, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব ও সংস্কার (বেগ)। যদিও গন্ধনামক গুণটি যেমন কেবল পৃথিবীতেই থাকে তেমনই স্নেহনামক গুণটিও কেবল জলেই থাকে অন্যত্র থাকে না। এখানে আপত্তি হতে পারে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈলাদির সঙ্গে আটা-ময়দাদি সংযুক্ত হলেও আটা প্রভৃতি চূর্ণীরূপ পিণ্ডীভূত হয়ে যায়। তা হলে স্নেহনামক গুণটি যে কেবল জলেই থাকে তা বলা কি সঙ্গত হবে? এর উত্তরে আচার্যগণ বলেন স্নেহ কেবল জলেই থাকে তবে দুগ্ধাদির সঙ্গে জলীয় অংশ সংযুক্ত থাকায় সেই জলে আশ্রিত স্নেহই আটা প্রভৃতিকে পিণ্ডাকার প্রদান করে। কাজেই ঘৃতাদি স্নেহের আশ্রয় হয় না। কেবল জলই স্নেহের আশ্রয় হয়ে থাকে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে পৃথিবীর ন্যায় জলও নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। নিত্যজল হল পরমাণুস্বরূপ। আর দ্ব্যণুকাদি হতে শুরু করে স্থূল জল (সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি) পর্যন্ত সমস্তই অনিত্য জলের অন্তর্ভুক্ত। এই অনিত্য জল আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ। এদের মধ্যে বরুণলোকে যেসব দেবতা থাকেন তাদের যে শরীর তা জলীয়। আর জলীয় ইন্দ্রিয় হল রসনেন্দ্রিয়। যেহেতু তা কেবল রসেরই অভিব্যঞ্জক হয়ে থাকে। আর নদী, সমুদ্র, হিম (তুষার), করকা (শিলাবৃষ্টির শিলা) প্রভৃতি হল জলীয় বিষয়।

তেজঃ বৈশেষিক-সম্মত তৃতীয় দ্রব্য হল **তেজ**। প্রশস্তপাদাচার্য তেজ এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'তেজস্ত্বাভিসম্বন্ধাৎ তেজঃ'[১০০]। অর্থাৎ তেজস্ত্ব সমবায়-সম্বন্ধে যেখানে থাকে তথা সমবায়-সম্বন্ধে তেজস্ত্বের অধিকরণই হল তেজ। এই তেজস্ত্ব তেজ-দ্রব্যকে সমানজাতীয় পৃথিব্যাদি দ্রব্য হতে যেমন ব্যাবৃত্ত করে তদনুরূপ বিজাতীয় গুণাদি হতেও তেজ-দ্রব্যকে

---

[৯৮] আটা, ময়দা প্রভৃতি চূর্ণ দ্রব্যকে যে গুণ পিণ্ডাকার প্রদানে সহায়তা করে, তাকে স্নেহ পদার্থ বলা হয় –'চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহ'।

[৯৯] 'জলনিষ্ঠা স্নেহত্বাবচ্ছিন্ন-স্নেহ-সমবায়ি-কারণতা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ, দণ্ডনিষ্ঠ-ঘট-কারণতাবৎ' এরূপ অনুমানের দ্বারাই জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

[১০০] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৯২।

ব্যাবৃত্ত করে। যদিও উষ্ণ স্পর্শগুণটি কেবলমাত্র তেজে থাকায় অনেকে উষ্ণস্পর্শবত্ত্বকেও তেজের লক্ষণ বলে থাকেন। কিন্তু সুবর্ণাদিতে উষ্ণস্পর্শের অনুভব না হওয়ায় উক্ত লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তাই আচার্যগণ উষ্ণস্পর্শ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদককে তেজের লক্ষণ বলেছেন। কিন্তু তদপেক্ষা তেজস্ত্ববত্ত্বকে তেজের লক্ষণ বলা শ্রেয়। তাই *কিরণাবলী*তে তেজের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'তেজসো লক্ষণমাহ তেজস্ত্বাভিসম্বন্ধাদিতি'[১০১]। বৈশেষিকমতে তেজোদ্রব্যে রূপ, স্পর্শ, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব (নৈমিত্তিক দ্রবত্ব) ও সংস্কার (বেগ) - এই একাদশ গুণ বিদ্যমান থাকে, যদিও উষ্ণস্পর্শনামক গুণটি কেবল তেজেই থাকে অন্যত্র থাকে না।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে তেজ দুইপ্রকার- নিত্য তেজঃ এবং অনিত্য তেজঃ। পরমাণুস্বরূপ যে তেজ দ্রব্য তা নিত্য, যেহেতু তাদের উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই। তবে দ্ব্যণুকাদি হতে শুরু করে স্থূল তেজ তথা কার্যরূপে যে তেজ দ্রব্য তা অনিত্য, যেহেতু তা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। এই অনিত্য তেজ আবার পৃথিব্যাদির ন্যায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ। তার মধ্যে সূর্যালোকের দেবতাদের যে শরীর তা হল তৈজস্ শরীর। এরূপ শরীর শুক্র-শোণিতসংঘাতজন্য না হওয়ায় অযোনিজ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে তেজ-দ্রব্য অগ্নিরূপে দাহক স্বভাব হয়। এমন অবয়বের দ্বারা যদি কোনও শরীর গঠিত হয়; তা কীভাবে উপভোগে অর্থাৎ সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকারে সমর্থ হতে পারে? এর উত্তরে বলা হয় পার্থিব অবয়বের সংযোগবশতঃই তৈজস্‌শরীর উপভোগে সমর্থ হয়। অভিপ্রায় এই যে তৈজস্‌শরীরের প্রতি তেজ অবয়বসকল হল সমবায়িকারণ, পার্থিব অবয়ব সকল হয় নিমিত্তকারণ। এই পার্থিব অবয়ব তৈজস্ অবয়বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে শরীর গঠন করে তার দ্বারা বিশিষ্ট ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় তা ভোগাদিতে সমর্থ হতে পারে। যাই হোক সূর্যালোকে দেবতাদের শরীর হল তৈজস্ শরীরের উদাহরণ। বৈশেষিকমতে তৈজস্ ইন্দ্রিয় হল চক্ষু, কারণ চক্ষু তেজ অবয়ব দ্বারা গঠিত। তাই তা কেবল রূপের অভিব্যঞ্জক হয়ে থাকে, গন্ধাদির

---

[১০১] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* তৃতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা – ২২২-২২৩।

অভিব্যঞ্জক হয় না। আর তৈজস্ বিষয়কে আচার্যগণ চারভাগে বিভক্ত করেছেন যথা- ভৌম, দিব্য, উদর্য ও আকরজ। ভূমি তথা পৃথিবীরূপ কাষ্ঠ, খড় প্রভৃতি হতে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তা হল ভৌম তেজ। দিবি তথা জলভূতে যে তেজ উৎপন্ন হয় তথা সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হল দিব্য তেজ, আর যে তেজ আমাদের খাদ্যদ্রব্যের পরিপাকে সহায়তা করে তাকে বলা হয় উদর্য তেজ। সর্বশেষ তেজ হল আকরজ তেজ। আকর তথা খনি হতে প্রাপ্ত সুবর্ণাদিরূপ তেজ হল আকরজ তথা খনিজ তেজ।

এখানে উল্লেখ যে অনেক আচার্য সুবর্ণকে পার্থিব দ্রব্য বলে থাকেন, যেহেতু হরিদ্রাদি পার্থিব দ্রব্যের ন্যায় সুবর্ণতেও পীতরূপ এবং গুরুত্ব বর্তমান। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণের মতে সুবর্ণকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায় না তা তেজ দ্রব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সুবর্ণের তৈজসত্বসিদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তিগুলি হল- সুবর্ণকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায় না। কারণ অত্যন্তঅগ্নিসংযোগের ফলে পৃথিবীমাত্রেই রূপের ও গুরুত্বের পরিবর্তন হয়। যেমন ঘৃতাদি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ ঘটলে ঘৃতাদির পূর্বের রূপ আর থাকে না, নতুনরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুবর্ণে অগ্নিসংযোগ ঘটলেও তার রূপের কিংবা গুরুত্বের কোনওরূপ পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই সুবর্ণকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায় না। এখন আপত্তি হতে পারে জলে অগ্নিসংযোগ ঘটলেও জলের রূপের পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই সুবর্ণকে জলীয় দ্রব্য বলা হোক। এর উত্তরে বলা হয়, সুবর্ণকে জলীয় দ্রব্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ জলের সাংসিদ্ধিক (স্বাভাবিক) দ্রবত্ব বিদ্যমান। কিন্তু সুবর্ণের যে দ্রবত্ব তা নৈমিত্তিক। অগ্নিসংযোগ ঘটলে তবেই সুবর্ণের দ্রবত্ব প্রাপ্তি হয়। এস্থলে উল্লেখ্য যে পৃথিবীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বিদ্যমান, তথাপি তাকে পার্থিব দ্রব্য বলা যাবে না। কারণ ঘৃতাদি পার্থিব দ্রব্যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকলেও সমুদায় পার্থিব দ্রব্যে তথা ঘটপটাদিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে না, যেহেতু অত্যন্তঅগ্নিসংযোগেও ঘটপটাদি দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয় না। কাজেই তা যেমন জলীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, তদনুরূপ পার্থিব দ্রব্যেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। শুধু তাই নয় জলে স্নেহনামক গুণ বিদ্যমান। যার দ্বারা জল আটা-ময়দা প্রভৃতি চূর্ণীকৃত বস্তুর পিণ্ডাকার প্রদানে সমর্থ হয়। কিন্তু সুবর্ণ অগ্নিসংযোগ হেতুক দ্রুতবস্থা প্রাপ্ত হলেও তদ্দ্বারা চূর্ণ দ্রব্যের পিণ্ডভাব হতে

দেখা যায় না। কারণ সুবর্ণে স্নেহ গুণের অভাব বিদ্যমান। কাজেই তাকে জলীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এখন পুনরায় আপত্তি হতে পারে, বৈশেষিকাচার্যগণ তেজের শুক্লভাস্বর স্বীকার করেছেন। কিন্তু সুবর্ণে তো আমরা পীতবর্ণ (অ-ভাস্বররূপ) প্রত্যক্ষ করে থাকি। তা হলে তাকে তৈজস্ দ্রব্য বলা যাবে কীভাবে? এর উত্তরে আচার্যগণ বলেন - সুবর্ণে ভাস্বর রূপের উপলব্ধি হয় না মানেই তাতে ভাস্বর রূপ নেই এমন আপত্তিটি সঙ্গত হয়নি। কারণ সুবর্ণের শুক্লভাস্বররূপ বিদ্যমান থাকলেও তার সঙ্গে যে পার্থিব অংশযুক্ত থাকে, তার রূপের দ্বারা তা অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই সুবর্ণে শুক্লভাস্বর রূপের উপলব্ধি হয় না। যেমন - মধ্যাহ্ন কালে যদি ঘরের বাইরে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় তা হলে তার শুক্লভাস্বর রূপের উপলব্ধি আমাদের হয় না; তাই বলে কি প্রদীপে শুক্লভাস্বররূপ নেই- এমনটা বলা যায় না। এস্থলে প্রকৃতপক্ষে বলবৎ সূর্যালোকের শুক্লভাস্বররূপের দ্বারা এস্থলে প্রদীপাদির রূপ অভিভূত হয়ে যায়। তাই তার উপলব্ধি হয় না। তদনুরূপ সুবর্ণের মধ্যে যে পার্থিব অংশ বিদ্যমান তার শুক্লভাস্বর রূপের দ্বারা সুবর্ণের রূপ চিরকালের মত অভিভূত[১০২] হয়ে যাওয়ায় তার উপলব্ধি হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সুবর্ণকে পৃথিবী বা জলের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তথাপি তা যেহেতু সূর্যালোকের ন্যায় রূপবৎ, তাই বৈশেষিকাচার্যগণ তাকে তেজ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই অভিপ্রায়ে কিরণাবলীকার বলেছেন – 'তৈজস্ঞ্চৈতৎ পার্থিবাপ্যভ্যামন্যত্বে সতি রূপবত্ত্বাৎ সূর্যালোকবৎ'[১০৩]।

বায়ুঃ বৈশেষিক-সম্মত নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে চতুর্থ দ্রব্য হল **বায়ু**। প্রশস্তপাদাচার্য বায়ুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'বায়ুত্বাভিসম্বন্ধাদ্বায়ুঃ'[১০৪] অর্থাৎ বায়ুত্বই হল বায়ুর লক্ষণ। কারণ বায়ুত্ব ধর্মটি বায়ুকে অন্যান্য দ্রব্য তথা পৃথিব্যাদি দ্রব্য থেকে পৃথক করে, তদনুরূপ গুণাদি বিজাতীয় পদার্থ হতেও বায়ুকে পৃথক করে থাকে। যদিও অনেক আচার্য অপাকজ-অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শবত্ত্বকে বায়ুর লক্ষণ বলে থাকেন। কারণ অপাকজ অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শবৎ একমাত্র

[১০২] 'অভিভব' এর অর্থ হল বলবৎ সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানজন্য অপর পদার্থের জ্ঞানের অভাব।

[১০৩] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* তৃতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা – ২৫৫-২৫৬।

[১০৪] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০০।

বায়ুই হয়ে থাকে। কাজেই গুণাদিতে লক্ষণটি প্রযুক্ত হবেনা। আবার জল এবং তেজেও লক্ষণটি প্রযুক্ত হবেনা। কারণ তেজের স্পর্শ হল উষ্ণ আর জলের স্পর্শ হল শীত। এখানে আপত্তি হতে পারে অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শবত্ত্বকে বায়ুর লক্ষণ বলা হলে তা তেজ কিংবা জলে প্রযুক্ত না হলেও পৃথিবীতে প্রযুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ বৈশেষিকমতে পৃথিবীতেও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বিদ্যমান। এর উত্তরে বলা যায় পৃথিবীতে বায়ুর ন্যায় অনুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকলেও, উভয় অনুষ্ণাশীত স্পর্শের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীর যে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ তা পাকজ; অর্থাৎ তেজ-সংযোগ ঘটলে পৃথিবীজ স্পর্শের পরিবর্তন ঘটে। পাকজন্য পূর্বস্পর্শের নিবৃত্তি পূর্বক স্পর্শান্তরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু বায়ুর যে অনুষ্ণাশীত স্পর্শ তা পাকজ নয়। কাজেই বায়ু পৃথিবী হতে বিলক্ষণ। এই হেতু অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্ত্বকেও বায়ুর লক্ষণ বলা হয়ে থাকে। এখন এই অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুতে সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হওয়ায় বায়ু তার সমবায়িকারণ হয়। ফলত বায়ুতে থাকবে অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শের সমবায়িকারণতা। আর এই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হবে বায়ুত্ব। তাই প্রশস্তপাদাচার্য বায়ুত্বকেই বায়ুর লক্ষণ বলেছেন। বৈশেষিকমতে কেবল স্পর্শ নয় সংখ্যা, পরিমাণ, বিভাগ, সংস্কার (বেগ) -এই নয়টি গুণের আশ্রয় হয় বায়ু। কাজেই তা চতুর্থ দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত।

বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদির ন্যায় বায়ুও দু'প্রকার হয়ে থাকে, তথা – নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপ যে বায়ু তা হল নিত্য। আর তদ্ভিন্ন দ্ব্যণুকাদি হতে শুরু করে সমস্ত কার্য বায়ু হল আনিত্য। এই কার্যস্বরূপ বায়ু আবার চার প্রকার - শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং প্রাণ। এদের মধ্যে বায়ুলোকের দেবতাগণের শরীর হল বায়বীয়। আর যার মাধ্যমে প্রাণীর স্পর্শের উপলব্ধি হয়ে থাকে, সেই ত্বককে বায়বীয় ইন্দ্রিয় বলা হয়ে থাকে। বৃক্ষ প্রভৃতি কম্পনের, মেঘ প্রভৃতিকে এদিক্ হতে ওদিক্ প্রেরণের হেতু যে বায়ু তাকে বৈশেষিকাচার্যগণ বিষয় বলেছেন। আর যা প্রাণিগণের খাদ্য ও পানীয়কে রসাদিরূপে পরিণত করে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে, শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে তাকে প্রাণ বলেছেন। এই প্রাণবায়ু শরীরের মধেই থাকে। কিন্তু তা সুখ-দুঃখাদি ভোগের আয়তন তথা শরীর

নয়। কারণ প্রাণবায়ুতে প্রাণীর সুখ, দুঃখের সাক্ষাৎকার ঘটে না। আবার তাকে ভোগের করণ ইন্দিয়ও বলা যায় না, কারণ প্রাণবায়ুর মাধ্যমে জীবের মধ্যে সুখ-দুঃখাদি বিষয়ের জ্ঞান আসে না। তা সুখ-দুঃখাদি ভোগের বিষয়ও হয় না। তাই প্রাণবায়ুকে কার্যবায়ুর চতুর্থ প্রকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

বৈশেষিকমতে পরমাণুস্বরূপ নিত্য পৃথিব্যাদি ভুতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, যেহেতু পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়। তাই তাদের আস্তিত্ব আনুমানগম্য। তবে বায়ু নিত্য কিংবা অনিত্য উভয়রূপেই আনুমানগম্য। তাঁদের মতে বায়ুকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি, কম্পন, প্রভৃতির দ্বারা আমরা বায়ুকে আনুমান করে থাকি। আভিপ্রায় এই যে, সর্বশরীরব্যাপী ত্বক্ নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণরত অবস্থায় আমাদের একরকম স্পর্শের অনুভব হয়ে থাকে। যে স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নয় আবার শীতও নয়। এই স্পর্শ একটি গুণ। আর আমরা জানি গুণ কখনও নিরাশ্রয় থাকেতে পারে না, তা কোনও না কোনও দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে। এই দ্রব্যটিই হল বায়ু। স্পর্শের আশ্রয় দ্রব্য পৃথিবী হতে পারে না। কারণ পার্থিব দ্রব্য যদি উদ্ভূত স্পর্শবান হয় তা হলে তা উদ্ভূত রূপপবান হবে। কিন্তু উক্ত রূপ স্পর্শের আশ্রয় দ্রব্যটি উদ্ভূত স্পর্শবান হলেও রূপবান নয়। কারণ তাকে দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়। আবার অনুষ্ণাশীত স্পর্শাশ্রয় দ্রব্যটিকে তেজ কিংবা জলও বলা যাবে না। কারণ বৈশেষিকমতে তেজে উষ্ণস্পর্শ থাকে আর জলে শীতলস্পর্শ থাকে। কিন্তু স্পর্শাশ্রয় দ্রব্যটি অনুষ্ণাশীত হয়ে থাকে। তা আকাশাদি বিভু দ্রব্য হতে পারবে না কারণ তা হলে বিভুত্বহেতুক সর্বত্রই এই স্পর্শের উপলব্ধি হত; কিন্তু তা হয় না। স্পর্শাশ্রয় দ্রব্যটি মন হতে পারবে না। কারণ বৈশেষিকমতে মন অতীন্দ্রিয়। কাজেই স্পর্শের আশ্রয় দ্রব্যটি অতীন্দ্রিয় হলে স্পর্শও অতীন্দ্রিয় হত। কিন্তু ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শের অনুভব করে থাকি। কাজেই স্পর্শাশ্রয় দ্রব্যটি পৃথিব্যাদি হতে ভিন্ন বায়ু হবে। তাছাড়া অনেক সময় সোঁ সোঁ শব্দের দ্বারাও আমরা বায়ুর অনুমান করে থাকি। কখনও একটি তৃণ বা তুলার উর্ধ্বগতি দেখে কিংবা গাছের শাখার কম্পন দেখেও আমরা বায়ুর অনুমান করে থাকি। কাজেই বৈশেষিকমতে বায়বীয় স্পর্শের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ

হলেও, বায়ুকে আমরা জানি অনুমানের মাধ্যমে। যদিও নব্য আচার্যগণ ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেছেন।

আকাশঃ বৈশেষিক-সম্মত পঞ্চম দ্রব্য হল **আকাশ**। বৈশেষিক-দর্শনে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশকে ভূতদ্রব্য বলা হয়েছে। যেহেতু এদের বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ বিদ্যমান। আকাশের বিশেষ গুণ হল শব্দ; যা শোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যদিও পৃথিব্যাদি তথা, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু হল মূর্ত-দ্রব্য। কারণ তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু আকাশ তেমন নয়। সকল মূর্ত-দ্রব্যের সঙ্গেই আকাশের সম্বন্ধ রয়েছে। তাই আকাশকে বৈশেষিক-দর্শনে বিভুদ্রব্য বলা হয়েছে। আকাশ একটি নিত্যদ্রব্য, কারণ তার উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই। আকাশের কোনও উদ্ভূতরূপ কিংবা উদ্ভূতস্পর্শ না থাকায় আকাশকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, যদিও আকাশের গুণ শব্দ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। আর তার মাধ্যমেই আমরা আকাশকে অনুমান করে থাকি। তবে বৈশেষিকাচার্যগণ সাক্ষাৎভাবে আকাশের অনুমান করেননি। তাঁরা প্রথমে শব্দ যে গুণ-পদার্থ তা প্রতিপাদন করেছেন। অতঃপর শব্দগুণের আশ্রয়রূপে একটি দ্রব্যের নিরূপণ করেছেন। তারপর সেই দ্রব্যটি যে আকাশ, তা প্রতিপাদন করেছেন। তাৎপর্য এই যে, মীমাংসা-দর্শনে শব্দকে দ্রব্য বলা হয়েছে। কারণ, তাঁদের মতে কোনও গুণ সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। যেমন, আমরা যখন গোলাপ ফুলের লাল রঙের প্রত্যক্ষ করি তখন প্রথমে চক্ষুর সঙ্গে গোলাপফুলের (দ্রব্যের) সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (সংযোগ) হয়। এরপর ঐ গোলাপফুলে যে লাল রঙ (গুণ) সমবেত থাকে তার সঙ্গে পরম্পরায় সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ হয়। অতঃপর গোলাপফুলের লাল বর্ণের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কর্ণেন্দ্রিয় সাক্ষাৎভাবেই শব্দকে গ্রহণ করে। তাই মীমাংসকাচার্যগণ শব্দকে গুণ-পদার্থ বলেন না। তাঁদের মতে শব্দ হল একটি দ্রব্য-পদার্থ। কোনও কোনও শব্দাচার্য এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন কর্ণেন্দ্রিয় সাক্ষাৎ সমবায়-সম্বন্ধে শব্দকে গ্রহণ করে মানেই শব্দ দ্রব্য-পদার্থ -এমন বলা যায় না। কারণ তাঁদের মতে শব্দাশ্রয় আকাশ আর কর্ণ অভিন্ন। বৈশেষিক-দর্শনে কর্ণশষ্কুলী দ্বারা অবচ্ছিন্ন

আকাশকেই কর্ণ বলা হয়েছে। কাজেই শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশস্বরূপ, যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু রূপাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং রূপাদির আশ্রয়দ্রব্য এক ও অভিন্ন না হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎভাবে রূপাদি গুণকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। যাই হোক বৈশেষিকমতে শব্দ হল একপ্রকার গুণ, যা সমবায়-সম্বন্ধে আকাশে থাকে। শব্দের গুণত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত '*সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে যে অনুমানের আকারটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল – 'শব্দো গুণঃ চক্ষুর্গ্রহণাযোগ্য-বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-জাতিমত্ত্বাৎ স্পর্শবৎ'[১০৫]। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ হল গুণ-পদার্থ কারণ শব্দ চক্ষু দ্বারা গৃহীত নয়; অথচ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যজাতি অর্থাৎ শব্দত্বের আশ্রয় হয়। শব্দত্ব জাতি কর্ণ নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে স্পর্শকে উল্লেখ করা হয়েছে। স্পর্শ চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য নয় অথচ তা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাতি স্পর্শত্বের আশ্রয় হয়ে থাকে। তাই তাকে যেহেতু গুণ বলা হয়েছে; তদনুরূপ শব্দকেও গুণ-পদার্থ বলাই সঙ্গত হয়। এখন শব্দকে গুণ-পদার্থ বলা হলে তার নিশ্চিত কোনও আশ্রয় থাকবে। কারণ গুণ কখনও নিরাশ্রয় থাকতে পারে না। কাজেই সমবায়-সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের একটি আশ্রয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল সমবায়-সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের আশ্রয় কে হবে? এর উত্তরে আচার্যয়গণ পরিশেষানুমানের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন।

বৈশেষিকমতে গুণ সর্বদা সমবায়-সম্বন্ধে তার আশ্রয় দ্রব্যে থাকে। এখন সমবায়-সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের আশ্রয় পৃথিব্যাদি তথা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু হতে পারবে না। কারণ শব্দ কখনও স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ হতে পারে না। যেহেতু স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ কারণগুণ পূর্বক হয়ে থাকে। যেমন পট একটি স্পর্শবান দ্রব্য। এই পটের যে রূপ তা পটের কারণ তন্তুর রূপ জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ নামক গুণটি শোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হলেও; তা শব্দের কারণ যে আকাশ তার কোনও গুণজন্য নয়। যদিও দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন শব্দের প্রতি অন্য কোনও শব্দ কারণ হয়ে থাকে তথাপি প্রথমোৎপন্ন শব্দের প্রতি

---

[১০৫] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ১৯০।

অন্য কোনও শব্দ কারণ হয় না। কাজেই শব্দ মাত্রই কারণগুণ পূর্বক নয়। সুতরাং শব্দকে স্পর্শবান পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু - এই চারটি দ্রব্যের বিশেষগুণ বলা যায় না। তা হলে শব্দকে কি আত্মার বিশেষ গুণ বলা যাবে? এর উত্তরে বলা হয় শব্দকে আত্মার বিশেষ গুণ বলা যায় না। কারণ, আত্মার কোনও গুণই বহিরিন্দ্রিয়র দ্বারা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু শব্দ শোত্রেন্দ্রিয়রূপ বাহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত, যে আত্মাতে আত্মার বিশেষ গুণ সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন হয় সেই আত্মাতেই তার উপলব্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু বীণা, শঙ্খাদি হতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা শব্দসন্ততিক্রমে পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থানরত সমস্ত সমর্থ-পুরুষেরই অবগত হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, শব্দ আত্মাতে আসমবেত তাই তা আত্মার গুণ হতে পারে না। কারণ গুণমাত্রই তার আশ্রয়ে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। চতুর্থত, আত্মার গুণাদির তথা সুখ-দুঃখাদির অনুভব হলে পর 'আমি সুখী' কিংবা 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি রূপে প্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু 'আমি শব্দ' এরূপ প্রতীতি আমাদের কখনও হয় না। কাজেই শব্দকে আত্মার গুণ বলা যায় না।

শব্দ দিক্, কাল ও মনেরও বিশেষ গুণ হতে পারে না। যেহেতু শব্দ শোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু দিক্, কাল, মনের গুণ শোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। তাছাড়া দিক্, কাল ও মনের কোনও বিশেষ গুণই থাকে না। কাজেই শব্দকে দিক্, কাল কিংবা মনেরও বিশেষ গুণ বলা যায় না। এভাবে বৈশেষিকাচার্যগণ শব্দ পৃথিব্যাদি ভূতদ্রব্যের গুণ নয়, তা আত্মার গুণ নয়, তা দিক্, কাল কিংবা মনেরও গুণ নয়। অথচ তা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। কাজেই তা গুণবিশেষ। আর গুণ কখনও নিরাশ্রয় হয় না, তার একটি আশ্রয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর সেই আশ্রয়টি হল আকাশ। এভাবে পরিশেষানুমানের দ্বারা বৈশেষিক-দর্শনে শব্দগুণাশ্রয়ত্বরূপে আকাশ স্বীকার হয়েছে। শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ তবে আকাশে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সাধারণ গুণও বিদ্যমান। এই আকাশ বৈশেষিকমতে এক এবং অখণ্ড। যদিও উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে আমরা কল্পনা করে থাকি। বৈশেষিক-দর্শনে আকাশ নিত্য দ্রব্যরূপে স্বীকৃত। যেহেতু আকাশের উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। এখানে উল্লেখ্য যে আকাশ এক

হওয়ায় আকাশত্বকে জাতি বলা যায় না। তাই ‘আকাশত্ববিশিষ্ট যা তা হল আকাশ’ - এভাবে আকাশের লক্ষণ দেওয়া হয়নি।

কালঃ বৈশেষিক সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে **কাল** হল ষষ্ঠ দ্রব্য। আকাশের ন্যায় কালও এক, নিত্য ও বিভু। তবে কালের কোনও বিশেষ গুণ নেই। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সামান্যগুণ কালে বিদ্যমান। কালের নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – ‘কালঃ পরাপরব্যতিকরযৌগপদ্যাযৌগপদ্যচিরক্ষিপ্রপ্রত্যয়লিঙ্গম্’[১০৬]। অভিপ্রায় এই যে সূর্যের পরিবর্তন (পরিস্পন্দন) জন্য যে পরত্ব, অপরত্ব, যৌগপদ্য, অযৌগপদ্য, চিরত্ব, ক্ষিপ্রত্ব প্রতীতি উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীতির ঘটকরূপে যে পদার্থ সিদ্ধ হয় তাকে বৈশেষিক-দর্শনে কাল বলা হয়েছে। এই কাল বৈশেষিকমতে অতীন্দ্রিয়; তাই তার প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের হয় না। বৈশেষিকমতে কালকে আমরা জানতে পারি অনুমানের দ্বারা, ‘পিতা পুত্রের অপেক্ষায় অধিক বয়স্ক’ কিংবা ‘পুত্র পিতার অপেক্ষা অল্প বয়স্ক’ এরূপ ব্যবহারের দ্বারাই কালের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল, আমরা যখন কোনও ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তি হতে জ্যেষ্ঠ তথা অধিক বয়স্ক কিংবা এই ব্যক্তিটি ঐ ব্যক্তিটির তুলনায় কনিষ্ঠ তথা অল্পবয়স্ক বলে থাকি তখন তার কারণ হল পরত্ব, অপরত্ব গুণ। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরত্ব গুণ উৎপন্ন হয় আর কনিষ্ঠ ব্যক্তিতে অপরত্ব গুণ উৎপন্ন হয়। কাজেই এই পরত্ব-অপরত্ব হল জন্য ভাব-পদার্থ। আর এরূপ জন্য ভাব-পদার্থমাত্রেরই উৎপত্তিতে তিন প্রকার কারণ তথা সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত – এই তিন প্রকার কারণই অপেক্ষিত হয়। এই পরত্ব, অপরত্ব গুণ উৎপত্তির সমবায়িকারণ হবে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর। কারণ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীরেই পরত্বাদি সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। অসমবায়িকারণ হবে কালের সঙ্গে উক্ত শরীরের সংযোগ আর নিমিত্ত কারণ হবে অধিক-অল্প সূর্যক্রিয়ার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান। এখন যদি কাল নামক দ্রব্যটিকে স্বীকার না করা হয় তা হলে উক্ত পরত্ব-অপরত্বের উৎপত্তির অসমবায়িকারণ বলে কিছু

[১০৬] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৩৩।

থাকবে না। শুধু তাই নয়, কাল নামক দ্রব্যটি স্বীকার না করলে পরত্বাদি উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত কারণটিও অনুপপন্ন হবে। তাৎপর্য এই যে, পরত্ব-অপরত্ব রূপ ভাবকার্যের উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত কারণ হবে অধিক, অল্প সূর্যক্রিয়ার সঙ্গে জ্যেষ্ঠাদি শরীরের সম্বন্ধের জ্ঞান। কিন্তু সূর্যক্রিয়াদির সঙ্গে জ্যেষ্ঠাদি শরীরের সম্বন্ধ হবে কীভাবে? সূর্যক্রিয়া তো সমবায়-সম্বন্ধে সূর্যেই থাকে। তা জ্যেষ্ঠাদি ব্যক্তির শরীরে থাকে না। আবার জ্যেষ্ঠব্যক্তির শরীরের সঙ্গে সূর্য-পরিস্পন্দন রূপ ক্রিয়ার সংযোগ সম্বন্ধ হবে – এমনটাও বলা যায় না। কারণ, সংযোগ সর্বদা দু'টি দ্রব্যের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত – এমনটাও হবে না। কারণ সূর্য-পরিস্পন্দন হল কর্ম পদার্থ। আর ব্যক্তির শরীর হল দ্রব্য-পদার্থ। এমন সম্বন্ধটি সূর্য-পরিস্পন্দনস্বরূপ বললে তা ব্যক্তির শরীরে থাকবে না। আবার ব্যক্তির শরীর স্বরূপ বললে তাতে সূর্য-ক্রিয়াটি থাকবে না। কাজেই তাদের মধ্যে স্বাশ্রয়সূর্যসংযোগীসংযোগরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। 'স্ব' মানে এখানে সূর্যের পরিস্পন্দনক্রিয়া, তার আশ্রয় হবে সূর্য। আর সেই সূর্য-সংযোগী হল কাল। আর সেই সেই কালের সঙ্গে ব্যক্তির শরীর সংযোগ বিদ্যমান। কাজেই পরত্ব, অপরত্বাদির নিমিত্ত কারণকে ব্যাখ্যা করতে হলে পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটকরূপে অবশ্যই কাল নামক দ্রব্যটিকে স্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে 'এই ক্ষণে কার্যটি উৎপন্ন হয়েছে' কিংবা 'এই মুহূর্তে এই কার্যটির বিনষ্ট হয়েছে' এরূপ বাক্য ব্যবহার করে থাকি। এরূপ বাক্য ব্যবহারের হেতু রূপেও কাল দ্রব্যটি সিদ্ধ হয়। যদিও একথা ঠিক যে কাল আকাশের ন্যায় এক ও অখণ্ড। কিন্তু আমরা এক ও অখণ্ড কালকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করে থাকি। কালে এরূপ যে ভেদবুদ্ধি তা উপাধি প্রসূত। যেমন, একটি ব্যক্তি যখন রান্না করেন, তখন তাঁকে আমরা পাচক বলি, তিনি যখন বই পড়েন তখন তাঁকে পাঠক বলি, আবার তিনিই যখন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন, তখন তাঁকে শিক্ষক বলে থাকি। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিটি এক। তদনুরূপ কালও স্বরূপতঃ এক এবং নিরংশ; ভেদবুদ্ধিবশতঃ তাতে অতীতাদির আরোপ করে থাকি মাত্র।

দিক্ঃ বৈশেষিক-সম্মত সপ্তম দ্রব্য হল **দিক্**। দিক্ও কালের ন্যায় এক, নিত্য ও বিভু। দিকেরও কোনও বিশেষগুণ নেই, তবে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ ও বিভাগ - এই পাঁচটি সাধারণগুণ দিকেও বর্তমান। দিক্ নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – 'দিক্ পূর্বাপরাদিপ্রত্যয়লিঙ্গম্'[১০৭]। অর্থাৎ 'এটি এর থেকে পূর্বে', 'এটি এর থেকে অপর' এরূপ প্রতীতির অসাধারণ কারণ রূপে যে দ্রব্যটি সিদ্ধ হয় তা হল দিক্। অভিপ্রায় এই যে, সমীপবর্তী স্থানে স্থিত কোন মূর্ত-দ্রব্য অপেক্ষা দূরবর্তী স্থানে স্থিত কোন মূর্ত-দ্রব্যে দৈশিক অপরত্ব থাকে। যেমন – আমরা অনেকসময় বলি বারুইপুর অপেক্ষা নামখানা শিয়ালদহ হতে দূরে অর্থাৎ দূরে অর্থাৎ পর, এবং নামখানা অপেক্ষা বারুইপুর শিয়ালদহ হতে কাছে অর্থাৎ অপর – এরূপ ব্যবহার সর্বসাধারণসিদ্ধ। আর এরূপ ব্যবহারের দ্বারা শিয়ালদহ হতে বারুইপুর অপেক্ষা নামখানা দূর হওয়ায় নামখানাতে পরত্ব এবং নামখানা অপেক্ষা বারুইপুর অধিক শিয়ালদহ সমীপবর্তী হওয়ায় বারুইপুরে অপরত্ব থাকে। যেহেতু কোন মানুষ যখন শিয়ালদহ হতে বারুইপুর ও নামখানার অভিমুখে চলতে থাকে, তখন সে বারুইপুর আগে প্রাপ্ত হয় এবং নামখানা পরে প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির এই অগ্রপশ্চাৎ, এর দ্বারাই বোঝা যায় শিয়ালদহ হতে বারুইপুর কাছে এবং তুলনামূলকভাবে নামখানা দূরে। এভাবে আমরা প্রথম প্রাপ্তস্থানে অপরত্ব স্বীকার করে তাতে নৈকট্যের ব্যবহার করে থাকি, আর পরে প্রাপ্তস্থানে পরত্ব স্বীকার করে তাকে দূর বলে থাকি। এখন এই দূরত্বাদি ব্যবহারের অসাধারণ কারণ যে পরত্ব-অপরত্ব, তা জন্যগুণ। আর জন্য গুণ (ভাবকার্য) হওয়ায় এদের সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্তকারণ স্বীকার করতে হয়। প্রদত্ত স্থলে সমবায়িকারণ হবে যে মূর্ত দ্রব্যে পরত্বাদি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বারুইপুর কিংবা নামখানা নামক স্থান দুটি, আর অসমবায়িকারণ হবে দিক্ ও পরত্বাদির আশ্রয়রূপ মূর্ত-দ্রব্যের সংযোগ (দিক্-পিণ্ড সংযোগ)। এখানে উল্লেখ্য যে, পরত্বাদি যে আশ্রয়ে থাকে সেই আশ্রয়টি সমবায়িকারণ হলেও, সেই আশ্রয়স্থিত কোনও গুণই পরত্বাপরত্বের সমবায়িকারণ হতে পারবে না। যেহেতু ঐ গুণটি পূর্বাপর একই রূপে থাকে। অথচ পরত্ব বুদ্ধিকালে অপরত্ব

[১০৭] ঐ, পৃষ্ঠা – ১৪০।

কিংবা অপরত্ব বুদ্ধিকালে পরত্বের জ্ঞান আমাদের হয় না। এই আশ্রয়দ্রব্যগত আত্মসংযোগ কিংবা আকাশসংযোগ উক্ত পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়িকারণ হবে না। কেননা যা অপর ধর্মের অসমবায়িকারণ হয় তা আর অসমবায়িকারণ হতে পারবে না। এই একই যুক্তিতে আশ্রয়দ্রব্যগত কালসংযোগও উক্ত পরত্বাদির অসমবায়িকারণ হবে না, যেহেতু তা কালিক পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়িকারণ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্য কোনও বিভুদ্রব্যের সংযোগই প্রদত্তস্থলে অসমবায়িকারণ হবে; সেই বিভু দ্রব্যটি হল দিক্। এছাড়া প্রদত্ত স্থলে নিমিত্ত কারণ হবে যা দূর এবং যা হতে দূর কিংবা যা নিকট এবং যা হতে নিকট এই উভয়ের সংযোগের বহুত্ব কিংবা অল্পত্বের জ্ঞান। এস্থলে সংযোগ-বহুত্ব কিংবা সংযোগ-অল্পত্বের সঙ্গে উক্ত স্থানদ্বয়ের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। কাজেই তাদের মধ্যে পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। এই পরম্পরা-সম্বন্ধের ঘটক হবে এমন পদার্থ যা উভয় স্থানের সঙ্গে যুক্ত; আর সেই পদার্থটিই হল দিক্ নামক দ্রব্য। এভাবে বৈশেষিকাচার্যগণ দৈশিক পরত্ব-অপরত্ব বুদ্ধির ঘটক হিসাবে দিক্ নামক দ্রব্যের অস্তিত্বের অনুমান করে থাকেন।

বৈশেষিকমতে দিক্ হল একটি বিভু দ্রব্য। কারণ সমস্ত মূর্ত-দ্রব্যের সঙ্গেই দিকের সম্বন্ধ রয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে দিক্-কে এক বলা হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, দিক্ যদি এক হয় তা হলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, ঊর্ধ্ব, অধঃ এরূপ যে দিকের দশবিধ ব্যবহার তা কীভাবে উৎপন্ন হবে? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে বলা যায়, দিক্ স্বরূপতঃ এক। কিন্তু কাল এক হলেও উপাধিভেদে তাতে যেমন অতীতাদির ব্যবহার হয়ে থাকে, তদনুরূপ উপাধিবশতই এক ও অখণ্ড দিকে পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি দশবিধ ব্যবহার হয়ে থাকে। এই দিক্ বৈশেষিক মতে পরম-মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট। কারণ দিক্ যদি অণু কিংবা মধ্যম-পরিমাণবিশিষ্ট হত, তাহলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মূর্ত-দ্রব্যসমূহে দৈশিক অপরত্ব তথা সামীপ্য এবং দৈশিক পরত্ব বা দূরত্বের উৎপত্তি হতে পারতো না, যেহেতু সমস্ত মূর্ত-দ্রব্যের সঙ্গে একই সময়ে দিক্-এর সংযোগ সম্ভব হত না। কিন্তু দিক্‌কে পরমমহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্টরূপে স্বীকার করলে

বিশ্বের সমস্ত মূর্ত-দ্রব্যের সঙ্গে একই সময়ে দিক্-এর সংযোগ সম্ভব হবে। ফলত দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি সম্ভব হবে।

আত্মাঃ বৈশেষিক-সম্মত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে অষ্টম দ্রব্য হল **আত্মা**। আত্মার লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন - 'আত্মত্বাভিসম্বন্ধাদাত্মাঃ'[১০৮] অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে আত্মত্ব যেখানে থাকে তা হল আত্মা। মুল কথা হল আত্মত্বের আশ্রয়কেই আত্মা বলা হয়েছে। আত্মত্ব কেবল আত্মাতেই বিদ্যমান থেকে তাকে আত্মেতর বস্তু তথা পৃথিব্যাদি, আকাশ, দিক্, কাল ও মন থেকে ব্যাবৃও করে। জ্ঞান হল আত্মার একটি বিশেষগুণ। তাই অনেক আচার্য জ্ঞানের অধিকরণকেই আত্মা বলেছেন। যদিও ইচ্ছা এবং প্রযত্নও আত্মার বিশেষ গুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বৈশেষিকমতে আত্মা দ্বিবিধ - জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মাতে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব , সংযোগ ও বিভাগ - এই পাঁচটি সাধারণ গুণ এবং জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার - এই নয়টি বিশেষ গুণ নিয়ে মোট চতুর্দশ গুণ বিদ্যমান। তবে পরমাত্মার গুণের সংখ্যা হল আটটি, যথা - সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ - এই পাঁচটি সাধারণ গুণ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন - এই তিনটি বিশেষ গুণ। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের বিশেষ গুণ হলেও জীবাত্মা অনিত্যজ্ঞান, অনিত্য ইচ্ছা ও অনিত্য প্রযত্নের আশ্রয় হয়। অপরদিকে পরমাত্মা হল নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্নের আশ্রয়। যদিও অনেক আচার্য মনে করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা কিংবা প্রযত্ন থাকতে পারে না। তাঁর নিত্যজ্ঞানই ইচ্ছা ও প্রযত্নরূপে কাজ করে। যাই হোক বৈশেষিকমতে গুণের আশ্রয় হওয়ায় আত্মা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একটি দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত।

এখন প্রশ্ন হল, আত্মারূপ দ্রব্যকে তো বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না তা হলে আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি কি? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আত্মাকে জানতে না পারলেও মন নামক আন্তর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মার প্রত্যক্ষ আমাদের হয়ে থাকে। 'অহংজানামি', 'অহং ইচ্ছামি', 'অহং সুখী', 'অহং

[১০৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ১৪৪।

দুঃখী’ ইত্যাদি রূপে আত্মার (জীবত্মার) সাক্ষাৎ অনুভব আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। কিন্তু এস্থলে আপত্তি উঠতে পারে, যখন আমরা বলি ‘আমি জানছি’ তখন ‘আমি’ বলতে কাকে বোঝানো হবে? যখন আমরা বলি ‘আমি স্থূল’; ‘আমি শীর্ণ’ তখন আমি বলতে তো আমরা শরীরকে বুঝে থাকি। তা হলে শরীরকে কি বৈশেষিকাচার্যগণ আত্মা বলেন? এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন জ্ঞানাদির আশ্রয়রূপেই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়; কিন্তু শরীর কখনও জ্ঞান ইত্যাদির আশ্রয় হতে পারে না। কারণ জ্ঞান একটি গুণ-পদার্থ; তা দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু শরীর কখনও জ্ঞানের সমবায়িকারণ হতে পারে না। যেহেতু শরীর একটি ভৌতিক দ্রব্য। ঘট, পটাদি ভৌতিক দ্রব্য হওয়ায় তা যেমন জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না তদনুরূপ শরীর ভূত দ্রব্যের কার্য হওয়ায় তা কখনও জ্ঞানের আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ হতে পারবে না। শুধু তাই নয় শরীর যদি জ্ঞানের আশ্রয় হত তা হলে মৃত শরীরেও জ্ঞানের উপলব্ধি হত। কিন্তু মৃত শরীরে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। কাজেই শরীরকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা সঙ্গত হবে না। তা হলে কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গুলি জ্ঞানের আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ হবে? যেহেতু ‘আমি অন্ধ’, ‘আমি বধির’ এরূপ প্রতীতিতে আমি বলতে ইন্দ্রিয়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন ইন্দ্রিয়কেও জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকমতে, ছেদনরূপ ক্রিয়া যেমন কুঠার জন্য তদনুরূপ শব্দাদি উপলব্ধি ক্রিয়াও সকরণক হবে, অর্থাৎ শব্দাদি উপলব্ধির নিশ্চয়ই কোনও করণ থাকবে। আর তা হল ইন্দ্রিয়। এখন যা করণ তা কখনও সমবায়িকারণ হতে পারে না। যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞানের আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ বলা হয় তা হলে ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলে বা বিকল হয়ে গেলে ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হতে পারবে না। যেহেতু পূর্বানুভবটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তির যে বিষয়ে পূর্বানুভব থাকে, সেই ব্যক্তিরই সেই বিষয়ে স্মৃতি হতে পারে। এখন ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের আশ্রয় বলা হলে, কোনও ব্যক্তি যিনি দিল্লী শহর দেখেছেন; এখন তার যদি চক্ষু ইন্দ্রিয়টি বিকল হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তা হলে দিল্লী শহরের পূর্বানুভবটিও নষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু তার আশ্রয়টিই বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলত দিল্লী

শহরের জ্ঞান তিনি স্মরণ করতেই পারবেন না। কিন্তু অন্ধব্যক্তির পূর্বের অভিজ্ঞতার যে স্মৃতি হয়ে থাকে - একথা সর্বজন স্বীকৃত। কাজেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না। এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আশ্রয় না হলেও 'মন' নামক অন্তরিন্দ্রিয়টি জ্ঞানের আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ হোক। যেহেতু যেকোনও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে মনের সহায়তা প্রয়োজন। মন-সংযোগ ব্যতীত কোনও ইন্দ্রিয় বাহ্য-জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। তাছাড়া এই মন নিত্য, কাজেই তার বিনাশের সম্ভাবনাও নেই। কাজেই মন জ্ঞানাদির আশ্রয় হতে পারে। বিরুদ্ধবাদীগণের এরূপ মতের সমালোচনা করে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – মন কখনও জ্ঞানের আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ হতে পারে না। কারণ ঘটাদি জ্ঞানের আশ্রয় যদি মন হত তা হলে ঘটাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবই হত না। কারণ মন হল অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট। আর যে দ্রব্য অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট হয়; তার গুণ প্রত্যক্ষগম্য হয় না, যেমন – পরমাণু। পরমাণু অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট; তাই পরমাণু অতীন্দ্রিয়। ফলত পরমাণুর গুণসমূহও অতীন্দ্রিয় হয়ে থাকে; তাদের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ঘট, পটাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। ঘট, পট আদি জাগতিক বস্তুর জ্ঞান যে আমাদের হয় তার প্রমাণ হল অনুব্যবসায়। ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুকে জানার পর 'আমার ঘটজ্ঞান হয়েছে'; 'আমার পটজ্ঞান হয়েছে' এরূপ অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। এর থেকে প্রমাণিত যে ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুর জ্ঞান আমাদের হয়। সুতরাং মনকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা যাবে না। এভাবে বৈশেষিকাচার্যগণ পরিশেষানুমানের দ্বারা সিদ্ধ করেন যে জ্ঞানাদির আশ্রয় শরীর কিংবা ইন্দ্রিয় কিংবা মন হতে পারে না। কাজেই এমন এক দ্রব্য স্বীকার করতে হবে যা জ্ঞানাদির আশ্রয় হতে পারে; আর তা হল আত্মা (জীবাত্মা)। এখানে উল্লেখ্য যে জ্ঞান একমাত্র আত্মার বিশেষ গুণ নয়, প্রযত্ন, ইচ্ছা, সুখ প্রভৃতিও আত্মার বিশেষ গুণ হওয়ায় প্রযত্নাদির আশ্রয়রূপেও আত্মার (জীবাত্মার) অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বৈশেষিকমতে জীবাত্মা এক নয়, তা শরীরভেদে বহু। কারণ জীবাত্মা এক হলে জগৎবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যাই সম্ভব হত না। আমরা এই জগৎএর দিকে তাকালে দেখতে পাই

কেউ সুখী, কেউ আবার দুঃখী; কেউ জ্ঞানী আবার কেউ অজ্ঞান। জীবাত্মা এক হলে একই আত্মাতে পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু একই ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে না। কাজেই স্বীকার করতে হয় জীবাত্মা বহু। শুধু তাই নয়, জীবাত্মা যে বহু তার আরও একটি প্রমাণ হল আমাদের স্মৃতি। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানতে পারি একজনের যা অনুভবের বিষয় তা অন্যজন স্মরণ করতে পারেন না। আবার অন্যজনের যা অনুভবের বিষয় তার স্মরণ ভিন্ন আরেকজনের হয় না। এর মূল কারণ হল আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। যে আত্মাতে যে বিষয়ের অনুভব উৎপন্ন হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়ে স্মরণ হয়ে থাকে। যদিও বৈশেষিকমতে জীবাত্মা বহু হলেও তা নিত্য অর্থাৎ তার উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই। আত্মাকে যদি অনিত্য বলা হয় তা হলে যিনি কর্ম করবেন তিনি ফলভোগ করবেন – এই সর্বজন স্বীকৃত নিয়মটি ব্যাহত হয়ে যায়। কারণ, যিনি কর্ম করবেন শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মা বিনষ্ট হলে তাঁর কৃত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের ফলভোগ তাঁর হবে না। ফলত কর্ম করেও ফলভোগ না করতে পারায় কৃতপ্রণাশ দোষ ঘটবে। আবার শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করা হলে উৎপত্তির পর তাঁর যে সুখ-দুঃখাদি ফলভোগ তা তাঁর স্বকৃত কর্মজন্য হবে না। যেহেতু উৎপত্তির পূর্বে সেই আত্মার অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই কর্ম না করেও তাঁকে ফলভোগ করতে হবে। ফলত অকৃতাভ্যাগম দোষ দেখা দেবে। এহেতু ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ আত্মাকে নিত্য বলেছেন।

বৈশেষিক-দর্শনে আত্মাকে বিভু পরিমাণ বলা হয়েছে। যদিও রামানুজাচার্য প্রমুখ আত্মাকে অণুপরিমাণ বলেছেন। কিন্তু বৈশেষিকমতে আত্মাকে অণুপরিমাণ বলা যায় না। কারণ আত্মা (জীবাত্মা) যদি অণুপরিমাণ হত তা হলে তা শরীরের নির্দিষ্ট কোনও অংশে থাকত; কিন্তু আত্মা আমাদের সমগ্র শরীর ব্যেপে বিদ্যমান। তাই যখন সুখ-দুঃখাদির উপলব্ধি হয় তখন সম্পূর্ণ শরীর ব্যেপে তা হয়ে থাকে। তাছাড়া আত্মাকে অণুপরিমাণ বলা হলে তা পরমাণুর ন্যায় অতীন্দ্রিয় হয়ে পড়বে। ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি আত্মার গুণসমূহকেও অতীন্দ্রিয় বলতে হবে। কিন্তু সুখ-দুঃখাদির অনুভব আমাদের প্রত্যেকেরই হয়ে

থাকে। সুতরাং আত্মাকে অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট বলা যায় না। জৈনদার্শনিকগণের ন্যায় আত্মাকে মধ্যমপরিমাণবিশিষ্টও বলা যায় না। জৈন মতে কর্মফল ভোগের জন্য আত্মা যখন যে শরীরে প্রবেশ করে তখন তা সেই শরীরের সমান পরিমাণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ আত্মা শরীরের দ্বারা পরিমিত তথা পরিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু এমন বললে ঘট, পটাদি বস্তুর ন্যায় আত্মা অনিত্য হয়ে পড়বে। ফলস্বরূপ কর্মফল ভোগে অব্যবস্থা সৃষ্টি হবে। যে ব্যক্তি কর্ম করবেন, আর যিনি ফলভোগ করবেন তাঁরা এক না হলে কৃতপ্রণাশ, অকৃতাভ্যাগম প্রভৃতি দোষ দেখা দেবে। তাই ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনে আত্মাকে নিত্য বলা হয়েছে। সুতরাং আত্মাকে মধ্যম পরিমাণ-বিশিষ্ট বলা যায় না। এই জন্য ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ আত্মাকে পরম মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট তথা বিভু বলেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, আত্মা যদি সর্বব্যাপী তথা বিভু দ্রব্য হয় তা হলে সর্বত্রই আমাদের সুখ, দুঃখাদির অনুভব হত। কিন্তু বাস্তবিকই তা হয় না। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন শরীরাবছিন্ন আত্মাতেই কেবল সুখাদির উপলব্ধি হয়ে থাকে। ঘটাবছিন্ন বা পটাবছিন্ন আত্মাতে সুখাদির উপলব্ধি হয় না।

পরমাত্মাকে বৈশেষিক-দর্শনে ঈশ্বর নামে আভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা বহু হলেও, বৈশেষিকমতে পরমাত্মা এক। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ নিত্য ও বিভু। সুখ, দুঃখ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি জীবাত্মার বিশেষ গুণসমূহ পরমাত্মাতে নেই। পরমাত্মার লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈশেষিক-দর্শনে বলা হয়েছে - নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্নের আশ্রয় দ্রব্যটি হল পরমাত্মা। জীবাত্মার ন্যায় তিনিও জ্ঞান প্রভৃতির আধার হলেও তাঁর যে জ্ঞান, ইচ্ছা বা প্রযত্ন তা নিত্য। এখন প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, পরমাত্মা রূপ ঈশ্বর তো ইন্দ্রিয়গম্য নন; তা হলে তাঁর অস্তিত্বে প্রমাণ কী? এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – প্রতিটি জীব তার অদৃষ্টের অধীন। এই অদৃষ্ট অনুযায়ী জীব তার স্বকৃত-কর্মের ফলভোগ করে থাকে। কিন্তু অদৃষ্ট তো অচেতন পদার্থ। আমরা জানি চেতনের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কোনও অচেতন কার্য উৎপাদন করতে পারে না। অচেতন কুঠার যেমন চেতন কাঠুরিয়া ব্যতীত ছেদনরূপ ক্রিয়া করতে পারে না তদনুরূপ অচেতন অদৃষ্টের ফলপ্রদানের ক্ষেত্রে একজন চেতন কর্তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই চেতন কর্তা

কোনও জীব হতে পারে না। কারণ জীব চেতন হলেও তার জ্ঞান সীমিত, এ জগতের অসংখ্য জীবের অসংখ্য অদৃষ্টকে জানা আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং নিয়ন্ত্রক রূপে একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর তিনিই হলেন ঈশ্বর।

শুধু তাই নয়, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় হলেন আস্তিক। তাঁরা বেদকেই প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করেন। এই বেদের সৃষ্টিকর্তারূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'সংজ্ঞাকর্ম্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্'[১০৯]। অভিপ্রায় এই যে, যখন কোনও ব্যক্তি তাঁর পুত্রের নামকরণ করেন, সে স্থলে নামকরণের পূর্বে পুত্রটি পিতার প্রত্যক্ষগোচর হয়ে থাকে। তদনুরূপ যখন কোনও কুম্ভকার ঘট-নির্মাণ করেন তৎপূর্বে তাঁর ঘটের অবয়ব কপালদ্বয় প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎএর একসময় সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎএর মূল উপাদান পরমাণু হতে শুরু করে দ্ব্যণুকাদি প্রভৃতি নিশ্চিত কারুর প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল; আর তিনি কখনও আমাদের মত সসীম জীব হতে পারেন না। কারণ সৃষ্টির পূর্বে কোনও জীবেরই তখন উৎপত্তি হয়নি। কাজেই এমন এক কর্তাকে মানতে হবে যিনি এই জগৎএর সমস্ত সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই জগতের সমস্ত বস্তুর নামকরণের যিনি কর্তা; সেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ সত্তাই হলেন ঈশ্বর।

মনঃ বৈশেষিক-সম্মত নবম দ্রব্য হল **মন**। মনের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – 'মনস্ত্বযোগান্মনঃ'[১১০] অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে মনস্ত্ব জাতির আশ্রয় হল মন। এই মনস্ত্ব জাতি কেবল মনেই থাকে এবং যা মন হতে যা ভিন্ন তা হতে মনকে ব্যাবৃত্ত করে। মনস্ত্ব জাতির সিদ্ধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - সুখ-দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ হল মন। কাজেই মনে রয়েছে সুখ-দুঃখাদি সাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণতা। এই কারণতা কোনও

---

[১০৯] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ১৩৩।

[১১০] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৫৯।

না কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই ধর্মটিকেই বলা হয় অবচ্ছেদক। প্রদত্ত স্থলে মনস্ত্বই হবে সুখাদি-উপলব্ধির অসাধারণ কারণতার অবছেদক। আর এই মনস্ত্ব জাতির আশ্রয়কেই বৈশেষিকাচার্যগণ মন নামে অভিহিত করেছেন। বৈশেষিকমতে মনে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার (বেগ) -এই আটটি গুণ বিদ্যমান। তাই কোনও কোনও আচার্য মনের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – যা স্পর্শশূন্য এবং ক্রিয়াবান তা হল মন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং মন -এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্রিয়া থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ুতে স্পর্শ থাকলেও মনে স্পর্শ থাকে না। একমাত্র মনই স্পর্শরহিত এবং ক্রিয়াবান হয়ে থাকে। যাই হোক বৈশেষিকমতে গুণের আশ্রয় হওয়ায় মন দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত।

ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রে মনকে অন্তঃকরণ বলা হয়েছে। কারণ বাহ্য-জগতের রূপ-রসাদি উপলব্ধির করণ হয় চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়সমূহ। কিন্তু আত্মার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতির উপলব্ধি চক্ষুরাদি বাহ্যরিন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। যেহেতু চক্ষুরাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় কেবল বাহ্য-জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আন্তর জগতের সুখ-দুঃখাদির গ্রহণ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ 'আমি সুখী'; 'আমি দুঃখী' এরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। কাজেই স্বীকার করতে হয় পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এমন ইন্দ্রিয় রয়েছে যা আন্তর জগতের সুখ, দুঃখাদির উপলব্ধির সাধন হয়। বৈশেষিকাচার্যগণ এই অন্তরিন্দ্রিয়কে মন নামে অভিহিত করেছেন।

বৈশেষিকমতে সুখাদি উপলব্ধির সাধন হিসাবে কেবল মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় - এমনটা নয়। সুখাদির উৎপত্তির কারণ হিসাবেও মনকে স্বীকার করতে হয়। অভিপ্রায় এই যে, সুখ-দুঃখাদি গুণগুলি আত্মায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই এগুলি জন্য ভাব-পদার্থ। আর জন্য ভাব-পদার্থমাত্রেরই উৎপত্তিতে সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ অপেক্ষিত হয়। সুখ-দুঃখাদি উৎপত্তির প্রতি সমবায়িকারণ হবে আত্মা। যেহেতু আত্মাতে সমবায়-সম্বন্ধে

সুখাদি গুণসমূহ উৎপন্ন হয়। আর অসমবায়িকারণ হবে আত্ম-মন সংযোগ। কাজেই আত্ম-মন সংযোগের আশ্রয়রূপে 'মন' নামক দ্রব্যটি অবশ্য স্বীকার্য।

'মন' নামক দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন – স্মৃতিরূপ জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্যও মন নামক ইন্দ্রিয় স্বীকার করতে হবে। অভিপ্রায় এই যে, শব্দাদির উপলব্ধির সাধন হিসাবে যেমন শোত্রেন্দ্রিয় প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, অদনুরূপ স্মৃতি এক প্রকার জ্ঞান হওয়ায় তা অবশ্যই কোনও ইন্দ্রিয়জন্য হবে এবং তা হল মন। এখানে কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন – স্মৃতি মূলত পূর্বানুভব নির্ভর। আর চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকল হতেই আমাদের বাহ্য-জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি জন্মায়। কাজেই স্মৃতির ব্যাখ্যার জন্য অন্তরিন্দ্রিয় মনের কোনও আবশ্যকতা নেই। এর উত্তরে বলা যায় কোনও ব্যক্তি অন্ধ হলেও তার রূপের স্মৃতি হতে পারে। আবার কোনও ব্যক্তি বধির হলেও তার শব্দের স্মৃতি হতে পারে। মন নামক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে প্রদত্ত স্থলগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। অভিপ্রায় এই যে, কোনও ব্যক্তি বধির হলেও যখন তার স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান হয়ে থাকে তখন স্বীকার করতে হবে শোত্রেন্দ্রিয় হতে অতিরিক্ত অবশ্য কোনও ইন্দ্রিয় রয়েছে; যার সাহায্যে বধির ব্যক্তির শব্দের স্মৃতি হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য-জগতের রূপাদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও মনের আবশ্যকতা রয়েছে। মন-সংযোগ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বাহ্য-জগতের রূপ-রসাদি গ্রহণে সমর্থ হয় না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন ঘটনা অনেক সময় ঘটতে দেখা যায় যে, আমি কোনও বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছি; অথচ অন্যমনস্কতার কারণে সেই বস্তুর জ্ঞান আমাদের হচ্ছে না। কাজেই আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বাহ্যরিন্দ্রিয়ের, বাহ্যরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাদের স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ হলেই তবে বাহ্য-জগতের রূপ-রসাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়ে থাকে। এহেতু অনেক আচার্য মনকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তকমা দিয়েছেন। এখন যদি বাহ্য-জগতের রূপ-রসাদি প্রত্যক্ষে মনের আবশ্যকতা স্বীকার না করা হয় তা হলে একই সময়ে বাহ্যরিন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হলে জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি হবে। অভিপ্রায় এই যে, যদি ইন্দ্রিয় ও তার গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগকেই

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র কারণ বলা হয়, তা হলে একই সময়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক – এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের সঙ্গে সম্বদ্ধ হলে একই সময়ে ঐ ব্যক্তিতে রূপ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, গন্ধের আঘ্রাণ, স্বাদের আস্বাদন ও স্পার্শন প্রত্যক্ষের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে; যেহেতু ঐ সময়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তার স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ বিদ্যমান। কিন্তু এমনটা আমাদের কখনও হয় না। যদি এমনটা হত, তা হলে একই সময়ে রূপাদি প্রত্যক্ষের ব্যাঞ্জক শব্দাদি ব্যবহার সম্ভব হত। শুধু তাই নয়, আমাদের যে জ্ঞান হয়েছে তা আমরা জানতে পারি অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের একই সময়ে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের অনুব্যবসায় কখনও হয় না। কাজেই যুগপৎ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় 'মন' নামক একটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করতে হবে। 'মন' নামক ইন্দ্রিয়টি যে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে সেই ইন্দ্রিয়টি তার গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হলেই আত্মায় সেই বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হবে; অন্য বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। এখন যদি পুনরায় আপত্তি করে বলা হয়, অনেক সময়ই তো আমাদের একই সঙ্গে ফুচকা খাওয়ার সময় টকের স্বাদ এবং মশলার গন্ধ পাচ্ছি বলে অনুভব হয়। কাজেই মন স্বীকারের আবশ্যকতা কী? এর উত্তরে বলা হয় মন অতীব চঞ্চল এবং দ্রুতগামী। তার দ্রুতগামীতাই উক্তরূপ ভ্রম প্রতীতির হেতু। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একশত পদ্মপত্রকে যদি একটি সূঁচ দ্বারা বিদ্ধ করা হয় তখন আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় একই ক্ষণে সবকটি পত্র সূঁচবিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারবো পত্রগুলি একইক্ষণে বিদ্ধ হয়নি; একটির পর একটি বিদ্ধ হয়েছে। তদনুরূপ মন এত দ্রুত একটি ইন্দ্রিয় হতে অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় যে একই সময়ে ফুচকার স্বাদ গ্রহণ, তার রূপ দর্শন কিংবা গন্ধ আঘ্রায়ন হচ্ছে বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু তা একই সময়ে ঘটে না। কাজেই বাহ্যবস্তুর রূপাদি-প্রত্যক্ষেও মনের আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকৃত।

এস্থলে একটি আশঙ্কা হতে পারে, মন তো অণু। তা একই সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। তা হলে পাঁচটি ইন্দ্রিয় যদি স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ

থাকে, তা হলে মন প্রথমে কোনও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে? এর উত্তরে বলা হয় আত্মার ইচ্ছা ও প্রযত্নের দ্বারা মন নিয়ন্ত্রিত হয়। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হওয়ার পর আত্মার ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুসারে মন বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হবে। অভিপ্রায় এই যে ব্যক্তির যদি গান শুনতে ইচ্ছা হয় তা হলে মন কর্ণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হবে। আর যদি ব্যক্তি গোলাপ ফুলের রঙ দেখতে ইচ্ছুক হন তা হলে মন নামক ইন্দ্রিয়টি চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হবে। কাজেই বৈশেষিকমতে আন্তর বস্তু ও বাহ্য বস্তু উভয়ের গুণাদি প্রত্যক্ষে মনে আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়।

বৈশেষিকমতে প্রতিটি আত্মার ভোগসাধক রূপে প্রতিটি শরীরে একটি করে মন স্বীকৃত। কারণ এক শরীরে যদি বহু মন স্বীকার করা হয় তা হলে একই সময়ে একই শরীরে যুগপৎ জ্ঞানের আপত্তি হবে। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ প্রতিটি শরীরে একটি করে মন স্বীকার করেছেন। তবে বৈশেষিকমতে জীবাত্মা সংখ্যায় বহু হওয়ায় প্রতিটি আত্মার ভোগসাধকরূপে বহুসংখ্যক মন স্বীকার করতে হবে। কারণ মন হল অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট। এখন্ন মন যদি একটি হত, তা হলে এক শরীরে যখন মন থাকত তখন অন্য শরীরে জ্ঞান প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হত না। কিন্তু একই সময়ে একাধিক ব্যক্তিতে একাধিক বিষয়ে জ্ঞান হতে দেখা যায়। কাজেই বৈশেষিকমতে প্রতিটি শরীরে একটি করে মন থাকলেও মন সংখ্যায় বহু। এই মন বৈশেষিকমতে অণু পরিমাণ। যেহেতু একই সময়ে একই ব্যক্তিতে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে মনকে মধ্যম পরিমাণ কিংবা বিভু পরিমাণও বলা যায় না। কারণ মন যদি মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট তথা দেহ-পরিমাণবিশিষ্ট হত তা হলে মনকে অনিত্য বলতে হত। কিন্তু মন নিরবয়ব; তাই তাঁকে অনিত্য বলা যায় না। তাছাড়া মনকে যদি মধ্যম পরিমাণ তথা দেহ-পরিমাণবিশিষ্ট বলা হয় তা হলে একই সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকায় একই সঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এমনটা আমাদের হয় না। কাজেই মনকে মধ্যমপরিমাণবিশিষ্ট বলা যাবে না। মনকে বিভু বলা যাবে না। কারণ মন যদি বিভু দ্রব্য হত; তা হলে সমস্ত মূর্ত-দ্রব্যের সঙ্গে মনের

সংযোগ থাকায়, এক শরীরে এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য রূপাদির যেমন প্রত্যক্ষ হত; তদনুরূপ নানা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপাদিও এক ক্ষণে জানা যেত। ফলত জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি হবে। কিন্তু আমাদের একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। শুধু তাই নয়, অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপাদির জ্ঞানও আমাদের কখনও হয় না। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, মন বিভু হতে পারে না। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ মনের অণুত্বে বিশ্বাসী। এই অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট মন প্রতিটি শরীরে একটি এবং শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

গুণ

বৈশেষিক-দর্শনে যে সপ্তবিধ পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থটি হল **গুণ**। বৈশেষিকাচার্যগণ দ্রব্য-পদার্থ নিরূপণের পরই গুণ-পদার্থের নিরূপণ করেছেন। যেহেতু কর্ম নামক পদার্থটি কেবল সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য গুণের কারণ হতে পারে না। পরন্তু অদৃষ্ট, প্রযত্ন, প্রভৃতি গুণগুলি কর্মমাত্রের প্রতি কারণ হয়ে থাকে। এজন্য প্রথমে দ্রব্য (সমস্ত কিছুর সমবায়িকারণ), তদনন্তর গুণ (কর্ম মাত্রের প্রতি কারণ) পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকল দ্রব্য গুণের সমবায়িকারণ হয়, কিন্তু সকল দ্রব্য কর্মের সমবায়িকারণ হয় না। তাই দ্রব্যের পর বৈশেষিকাচার্যগণ গুণের আলোচনা করেছেন। গুণ-পদার্থের লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈশেষিকসূত্রকার মহর্ষি কণাদ বলেছেন – ‘দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ-লক্ষণম্’[১১১] -অর্থাৎ যা দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান্ এবং সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকে গুণ-পদার্থ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, গুণ মাত্রই দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। তাই দ্রব্য হল আশ্রয়। আর গুণ হল আশ্রিত। কিন্তু কেবল ‘দ্রব্যাশ্রিতত্ব’ গুণের লক্ষণ হতে পারে না। কারণ সাবয়ব দ্রব্যে গুণের উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। সাবয়ব দ্রব্য মাত্রই তার অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কাজেই সাবয়ব দ্রব্যেও দ্রব্যাশ্রিতত্ব বিদ্যমান। তাই গুণের লক্ষণ বলা হয়েছে যা দ্রব্যাশ্রিত কিন্তু অগুণবান্। সাবয়ব ঘট, পটাদি দ্রব্য তার অবয়বে আশ্রিত

---

[১১১] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৪৮।

হলেও তাতে গুণ বিদ্যমান। কাজেই তা অগুণবান হয় না। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অপরদিকে গুণ সর্বদা গুণহীনই হয়ে থাকে। কারণ গুণে গুণ স্বীকার করা হলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। কাজেই গুণ নামক পদার্থটি দ্রব্যাশ্রিত কিন্তু অগুণবান হয়ে থাকে। ফলত লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত হয়। কিন্তু এখানেও আপত্তি হয় যে গুণ যেমন দ্রব্যাশ্রিত এবং অগুণবান্, তেমনি কর্ম পদার্থটিও দ্রব্যে আশ্রিত এবং তা গুণের আশ্রয় হয় না। কাজেই কর্মে উক্ত গুণের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। এই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহারের নিমিত্ত গুণের লক্ষণে 'সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ' এই অংশটি সন্নিবেশিত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, কর্ম সংযোগ বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ হয় অর্থাৎ অন্য কোনও কারণকে অপেক্ষা না করেই কর্ম সংযোগ বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু গুণ সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয় না। বেগ আদি গুণ কর্মকে অপেক্ষা করেই সংযোগ বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। তাই মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাশ্রিত, গুণহীন এবং সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণকে গুণ-পদার্থ নামে অভিহিত করেছেন। কর্ম পদার্থটি দ্রব্যাশ্রিত ও গুণহীন হলেও তা সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয়ে থাকে। তাই কর্মে উক্ত গুণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

আচার্য শঙ্কর মিশ্র আবার যা দ্রব্য ও কর্ম হতে ভিন্ন কিন্তু সামান্যবান্ তাকেই গুণ বলেছেন। তিনি গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'সামান্যবত্ত্বে সতি কর্মান্যত্বে চ সত্যগুণবত্ত্বমেব বা গুণ-লক্ষণম্[১১২]। 'সামান্যবান্' এই পদটির দ্বারা সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব হতে গুণ-পদার্থ যে ভিন্ন তা বোঝানো হয়েছে। কারণ, সামান্যাদিতে সামান্য থাকে না। যদিও দ্রব্য, গুণ ও কর্ম সামান্যের আশ্রয় হয়ে থাকে; তাই দ্রব্য ও কর্ম হতে গুণকে পৃথক করার জন্য 'দ্রব্য ও কর্ম হতে ভিন্ন' এই অংশটুকু বলা হয়েছে। কাজেই যা দ্রব্য ও কর্ম নয়; অথচ সামান্যের আশ্রয় হয় তাকেই গুণ বলা হয়েছে। কিন্তু গুণের এই দু'টি লক্ষণই লঘু নয়। তাই প্রশস্তপাদাচার্য গুণের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে – 'রূপাদীনাং গুণানাং

---

[১১২] Misra, sri Narayana (ed.), SriSankarMisra's *Vaisesikasutropaskara* with the '*Prakasika*' hindi commentary by Acarya Dhundhirajasastri, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1969, page – 55.

সর্বেষাং গুণত্বাভিসম্বন্ধো দ্রব্যাশ্রিতত্বং নির্গুণত্বং নিষ্ক্রিয়ত্বম্’[১১৩]। মূল কথা হল সমবায়-সম্বন্ধে গুণত্ব জাতির আশ্রয়কেই গুণ বলা অধিক সঙ্গত। অন্নংভট্ট *দীপিকাতে* প্রথমে ‘দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ’ এভাবে গুণের লক্ষণ বললেও পরে লখুতা বশতঃ ‘গুণত্বজাতিমান্ গুণঃ’ - এভাবেই গুণত্ব জাতিকেই গুণের লক্ষণ বলেছেন। শিবাদিত্য তার *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘গুণস্তু গুণত্বজাতিযোগী, জাতিমত্ত্বে সতি অচলনাত্মকত্বে সতি সমবায়িকারণরহিতশ্চেতি’[১১৪]। এই গুণত্ব জাতিটি রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণে বিদ্যমান থেকে পদার্থান্তর তথা দ্রব্যাদি হতে গুণকে পৃথক করে। ‘গুণত্ব’ জাতির সিদ্ধি প্রসঙ্গে *মুক্তাবলীতে* বলা হয়েছে – ‘দ্রব্য-কর্ম্ম-ভিন্নে সামান্যবতি যা কারণতা, সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্না নিরবচ্ছিন্ন-কারণতায়া অসম্ভবাৎ’[১১৫] অর্থাৎ দ্রব্য ও কর্মভিন্ন জাতিবিশিষ্ট যে গুণ; সেই গুণে থাকে ‘একটি’, ‘দু’টি’ প্রভৃতি গুণব্যবহারের কারণতা। যেহেতু ‘একটি’, ‘দু’টি’ প্রভৃতি গুণব্যবহারের কারণ হয় গুণ। এখন কারণতা কখনও নিরবচ্ছিন্ন হয় না; তা কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যাকে অবচ্ছেদক ধর্ম বলা হয়। এস্থলে সেই অবচ্ছেদক ধর্মটি হবে গুণত্ব। এখানে উল্লেখ্য যে গুণে রূপত্বাদি কিংবা সত্তা প্রভৃতি ধর্ম থাকলেও এগুলিকে অবচ্ছেদক ধর্ম বলা যাবে না। কারণ, রূপত্বাদি ন্যূনদেশবৃত্তি ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত গুণে তা থাকে না। আবার সত্তা জাতিটি গুণ হতে অধিকদেশবৃত্তি হওয়ায় তথা দ্রব্যাদিতেও থাকায় তাকেও অবচ্ছেদক ধর্ম বলা যাবে না। তাই আচার্যগণ গুণত্বকে গুণের লক্ষণ বলেছেন।

বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ গুণের বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন – ‘রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ’[১১৬]। এখানে উল্লেখ্য যে, মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে সতের প্রকার গুণের উল্লেখ

---

[১১৩] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৬৭।

[১১৪] *ভট্টাচার্য, জয় (সম্পাদিত), শিবাদিত্য বিরচিত সপ্তপদার্থী, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৬০।*

[১১৫] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ৪৮৫-৪৮৭।

[১১৬] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৩০।

করেছেন, যথা – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন। যদিও অনেক আচার্য মনে করেন, মহর্ষি গুণবিভাগসূত্রে ‘চ’ এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই সতেরটি গুণ ছাড়াও যে কিছু গুণ বিদ্যমান তা বোঝাতে চেয়েছেন। তাই পরবর্তিকালে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – ‘চ শব্দ সমুচ্চিতাশ্চ গুরুত্ব-দ্রবত্বস্নেহসংস্কারাদৃষ্টাশব্দাঃ সপ্তৈবেত্যেবং চতুর্বিংশতি গুণাঃ’[১১৭]। কাজেই বৈশেষিকমতে গুণ চতুর্বিংশতি প্রকার, যথা – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট (ধর্ম ও অধর্ম) এবং শব্দ। বৈশেষিকশাস্ত্রে কাঠিন্য, মৃদুত্ব, শৌর্য, ঔদার্য, কারুণ্য, দাক্ষিণ্য প্রভৃতিকেও গুণ বলে স্বীকার করা হয়েছে; যদিও এগুলি বৈশেষিকোক্ত চতুর্বিংশতি গুণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় বৈশেষিকাচার্যগণ এগুলির পৃথক উদ্দেশ করেননি। মূল কথা হল, বৈশেষিকমতে গুণ হল চতুর্বিংশতি প্রকার। এখন বৈশেষিক-সম্মত চতুর্বিংশতি প্রকার গুণের সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে –

রূপঃ বৈশেষিক-সম্মত চতুর্বিংশতি প্রকার গুণের মধ্যে প্রথম গুণ হল রূপ। রূপের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – ‘তত্র রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যম্’[১১৮] অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণটি গৃহীত হয়, তা হল রূপ। কিন্তু এরূপ বলা হলে সংখ্যাদি গুণে প্রদত্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। যেহেতু সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণও চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। এজন্য ‘চক্ষুগ্রাহ্যত্ব’কে রূপের লক্ষণ না বলে ‘চক্ষুর্মাত্রগ্রাহ্যত্ব’কে রূপের লক্ষণ বলতে হবে। কিন্তু এভাবে রূপের লক্ষণ করা প্রদান করা হলেও রূপত্বে প্রদত্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। যেহেতু রূপত্ব জাতিটি চক্ষুর্মাত্রজন্য গৃহীত হয়। এজন্য ‘চক্ষুর্মাত্রজন্য গুণত্ব’কে রূপের লক্ষণ বলতে হবে। রূপত্ব চক্ষুর্মাত্রজন্য হলেও তা গুণ নয়; তা জাতি। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু এভাবে রূপের লক্ষণ দেওয়া হলেও তা যথাযথ নয়। কারণ প্রদত্ত

[১১৭] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা – ১১১।

[১১৮] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৯৫।

লক্ষণটি পরমাণু আদির রূপে অব্যাপ্তি হবে। যেহেতু পরমাণু অতীন্দ্রিয় সেহেতু পরমাণুর রূপকে আমরা চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করতে পারি না। এজন্য রূপের লক্ষণ বলতে হবে – 'চক্ষুর্মাত্রপ্রত্যক্ষযোগ্যজাতিমদ্‌গুণত্বম্' অর্থাৎ যে গুণটি চক্ষুপ্রত্যক্ষযোগ্য জাতি যে রূপত্ব তার আশ্রয় হয়, তা হল রূপ।

ক্ষিতি, অপ ও তেজ – এই তিনটি দ্রব্যেই রূপ থাকে; অন্যত্র থাকে না। তাই রূপকে একটি বিশেষ গুণ বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বৈশেষিকমতে চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে কিছু গুণ রয়েছে যা সকল দ্রব্যেই থাকে; তাদেরকে সাধারণ গুণ বলা হয়েছে, যেমন – সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব (নৈমিত্তিক), গুরুত্ব, সংস্কার (বেগ ও স্থিতিস্থাপক) প্রভৃতি হল সামান্য গুণ। আর বাকি গুণগুলিকে বৈশেষিকাচার্যগণ বিশেষ গুণ বলেছেন। যেহেতু এগুলি বিশেষ কিছু দ্রব্যে থাকে; আবার বিশেষ কিছু দ্রব্যে থাকে না। রূপও এরকমই একটি বিশেষ গুণ।

বৈশেষিকমতে রূপ সাত প্রকার, যথা – শুক্ল, পীত, রক্ত, হরিত (সবুজ), কপিশ ও চিত্র। পার্থিব দ্রব্যে এই সাত প্রকার রূপ থাকে। তবে জলে শুক্ল রূপ থাকলেও, তা হল অভাস্বরশুক্লরূপ। যে শুক্লরূপ অন্যের প্রকাশক হয় না, তাকে অভাস্বর শুক্লরূপ বলে। তেজেও শুক্লরূপ থাকে, তবে তা ভাস্বর শুক্লরূপ। কারণ তেজের শুক্লরূপ অন্যের প্রকাশক হয়ে থাকে। যদিও সুবর্ণ আদি তৈজস্ দ্রব্য হওয়ায় সুবর্ণেও শুক্লভাস্বর রূপ থাকে; তথাপি তা পার্থিব রূপের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে না। যাই হোক পৃথিবী, তেজ ও জল হল রূপের আশ্রয়। রূপ তার নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করেই থাকে, তাই রূপকে বৈশেষিকাচার্যগণ ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলেছেন। কিন্তু যে গুণগুলি তার আশ্রয় দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে থাকে না, তাদেরকে বৈশেষিকাচার্যগণ অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংযোগ একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। কারণ একটি বৃক্ষের শাখায় যখন কপি-সংযোগ থাকে তখন সেই বৃক্ষের গোড়াতে কিংবা মূলে কপি-সংযোগের অভাব থাকে। কিন্তু রূপ এরূপ অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ নয়। করন, রূপ যে আশ্রয়ে থাকে সেই আশ্রয় ব্যেপেই থাকে। তাই একই আশ্রয়ে একই কালে রূপ ও রূপাভাব থাকতে পারে না। তবে যে

ঘটটি এখন শুক্ল পরে তা পীত হতে পারে। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ রূপকে পাকজ বলেছেন। এই রূপ বৈশেষিকমতে নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ – নিত্য পরমাণুর যে রূপ তা হল নিত্য। আর অবশিষ্ট সমস্ত অনিত্য দ্রব্যে স্থিত রূপ নামক গুণটি অনিত্য।

বৈশেষিকাচার্যগণ রূপকে ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ হিসাবে স্বীকার করায়; তাঁদের মতে চিত্ররূপ হল অতিরিক্ত একপ্রকার রূপ। এখন প্রশ্ন হল চিত্ররূপ কী? বৈশেষিকমতে একটি বস্ত্র লাল, সাদা, সবুজ প্রভৃতি সূতা দ্বারা নির্মিত হতে পারে। আমরা জানি বস্ত্র একটি জন্য ভাব-পদার্থ। কাজেই বস্ত্রের উৎপত্তিতে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত – এই ত্রিবিধ কারণ অপেক্ষিত। বস্ত্রের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ হবে তন্তুসমূহ, অসমবায়িকারণ হবে তন্তু-সংযোগ; আর তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি হবে নিমিত্ত কারণ। এখন বস্ত্র উৎপন্ন হলে সেই বস্ত্রে রূপ উৎপন্ন হবে; সেই রূপের প্রতি সমবায়িকারণ হবে বস্ত্রটি, অসমবায়িকারণ হবে তন্তুরূপ। এখানে উল্লেখ্য যে তন্তুরূপ স্বাশ্রয়সমবেতত্ব সম্বন্ধে বস্ত্ররূপের অসমবায়িকারণ হয়ে থাকে। ‘স্ব’ মানে তন্তুরূপ; আর তার আশ্রয় হল তন্তু; সেই তন্তুতে বস্ত্র সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত। কাজেই স্ব-আশ্রয়সমবেতত্ব সম্বন্ধে বস্ত্রে সূতার রূপ থাকে। আর সেই বস্ত্রে বস্ত্ররূপ সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কাজেই বস্ত্ররূপের প্রতি তন্তুরূপ হবে অসমবায়িকারণ। এখন যে স্থলে শুক্ল, নীল, লাল, সবুজ প্রভৃতি সূতা হতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়; সেই স্থলে বস্ত্রের রূপ কি হবে নীল না লাল না সবুজ না শুক্ল? এস্থলে কোনও একটিকে বস্ত্ররূপের প্রতি কারণ বলা যাবে না; যেহেতু বস্ত্রে নানা বর্ণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। আবার সবগুলিকে বস্ত্রের রূপের প্রতি কারণ বলা যাবে না, যেহেতু রূপকে বৈশেষিকাচার্যগণ ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলে থাকেন। কাজেই একটি রূপ ব্যপ্ত হয়ে থাকলে অন্য রূপ থাকতে পারবে না। কারণ অন্যরূপ থাকলে সে স্থানে প্রথম রূপটির অভাব থাকবে। তাছাড়া নানা রঙের তন্তুর মধ্যে, ধরা যাক শুক্লরূপ যদি পটে শুক্লরূপ উৎপাদন করে তখন অন্য তন্তুর যে রূপ; ধরাযাক রক্তরূপ, তা বস্ত্রে শুক্লরূপ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা করবে। আবার একইরকমভাবে বস্ত্রের শুক্লরূপ অন্য রূপগুলির উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা করবে। ফলস্বরূপ বস্ত্রে সাদা, লাল প্রভৃতি কোনও রূপই উৎপন্ন হতে পারবে না। কিন্তু বস্ত্রে যদি কোনও

রূপ না থাকত তা হলে তা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারত না। কিন্তু বস্ত্রের প্রত্যক্ষ অনুভব আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। কাজেই মানতে হবে বস্ত্রে নিশ্চয়ই একটা রূপ রয়েছে, যে রূপটি নীল, পীতাদি রূপ হতে ভিন্ন। আর তাকেই বৈশেষিকাচার্যগণ চিত্ররূপ নামে অভিহিত করেছেন।

এখানে অনেকে আপত্তি করে বলতে পারেন, বস্ত্রাদি অবয়বীতে রূপ না থাকলেও দ্রব্যের অবয়বে যে রূপ থাকে তার দ্বারা বস্ত্রাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অবয়বের রূপ অবয়বী প্রত্যক্ষের কারণ বলা হলে ত্রসরেণু প্রত্যক্ষকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অভিপ্রায় এই যে, যে দ্রব্য আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তাতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় মহত্ব থাকতে হবে। পরমাণু কিংবা দ্ব্যণুকে রূপ থাকলেও তাতে মহত্ব না থাকায় পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতির প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। এখন আমরা যদি অবয়বীতে রূপ স্বীকার না করি; অবয়বী প্রত্যক্ষে অবয়বের রূপকে কারণ বলে থাকি, তা হলে প্রদত্ত স্থলে পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতিতে অনুদ্ভুত রূপ থাকায় এবং তা ত্রসরেণুড় রূপেরও কারণ হওয়ায় পরমাণু ইত্যাদির ন্যায় ত্রসরেণুও অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য হবে। কিন্তু সুস্থ চক্ষুর দ্বারা জানালার রন্ধ্রপথে কেন্দ্রীভূত সূর্যালোকে ভাসমান ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ আমাদের প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে। কাজেই অবয়বের রূপকে অবয়বী প্রত্যক্ষের কারণ বলা সঙ্গত হবে না। অবয়বীতে অবশ্যই রূপ স্বীকার করতে হবে। কাজেই নীল, পীতাদি তন্তু হতে উৎপন্ন বস্ত্রের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য অতিরিক্ত চিত্ররূপ অবশ্য স্বীকার্য। যদিও নব্য-আচার্যগণের অনেকেই চিত্ররূপকে অতিরিক্ত রূপ বলে স্বীকারই করেন না। এ বিষয়ে আলোচনা পরে করা হবে।

রসঃ বৈশেষিক-সম্মত দ্বিতীয় প্রকার গুণ হল রস। রসের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – ‘রসো রসনগ্রাহ্যঃ’[১১৯] অর্থাৎ যে গুণটি রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাকে বৈশেষিক-দর্শনে রস বলা হয়েছে। কিন্তু কেবল রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে রসের লক্ষণ বলা হলে রসত্ব জাতিতে প্রদত্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। এহেতু ‘রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি গুণত্বম্ রসত্বম্’ - এভাবে রসের লক্ষণ বলা হয়েছে। ‘গুণত্ব’ পদটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হওয়ায় রসত্বে অতিব্যাপ্তির

[১১৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ১৯৯।

সম্ভাবনা নিরাকৃত হয়ে যায়। যেহেতু রসত্ব গুণ নয়, তা একটি জাতি। কিন্তু রসের এরূপ লক্ষণ করা হলেও তা পরমাণু প্রভৃতিতে স্থিত রসে অব্যাপ্তি হবে। যেহেতু পরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় পরমাণুতে যে রস থাকে; তা রসনেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না। এজন্য রসের লক্ষণ বলা হয়েছে – 'রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবিভাজকধর্মবত্ব'। অভিপ্রায় এই যে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ হল রস, সেই রস নামক গুণের বিভাজক ধর্ম হল রসত্ব। আর ঐ রসত্ব পরমাণু প্রভৃতিতে স্থিত রসে বিদ্যমান থাকায় উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

বৈশেষিকমতে রস ছয় প্রকার, যথা – লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল ও মধুর। এই রস নামক গুণটি পৃথিবী ও জল -এই দু'টি দ্রব্যেই থাকে। তাই রূপের ন্যায় রসও একটি বিশেষ গুণ। এই ছয়টি রসই অবস্থাভেদে পৃথিবীতে থাকে। যদিও জলে কেবল মধুর রস থাকে। রস নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। জলীয় প্রভৃতি পরমাণুতে যে রস থাকে তা নিত্য। এছাড়া সমস্ত দ্রব্যে স্থিত 'রস' নামক গুণটি অনিত্য। বৈশেষিকমতে রসও একটি ব্যাপবৃত্তিগুণ। কারণ এটি তার আশ্রয় দ্রব্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

গন্ধঃ বৈশেষিক-সম্মত তৃতীয় প্রকারের গুণটি হল গন্ধ। গন্ধের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – 'গন্ধো ঘ্রাণগ্রাহ্যঃ'[১২০] অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণটি হল গন্ধ। প্রদত্ত লক্ষণে 'গুণ' শব্দটিকে প্রযুক্ত করা না হলে গন্ধত্বে অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। কারণ গন্ধত্বও ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু 'গুণ' শব্দটিকে লক্ষণান্তর্গত করায় এবং গন্ধত্ব গুণ না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু প্রশস্তপাদাচার্য যেভাবে গুণের লক্ষণ প্রদান করেছেন তা পরমাণুতে স্থিত গন্ধে অব্যাপ্তি হয়ে যায়। যেহেতু পরমাণুকে কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানা যায় না। আসলে প্রদত্ত স্থলে লক্ষণটির অর্থ করতে হবে 'ঘ্রাণগ্রাহ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব'। অভিপ্রায় এই যে, ঘ্রাণগ্রাহ্য হল গন্ধ; ঘ্রাণগ্রাহ্যতাবচ্ছেদক হবে গন্ধত্ব। আর সেই গন্ধত্ব

[১২০] ঐ, পৃষ্ঠা – ১৯৯।

জাতিটি গুণত্বের ব্যাপ্য হয়ে থাকে। ফলত গন্ধবত্ত্বই হল গন্ধের লক্ষণ। গন্ধের এরূপ লক্ষণটি কেবল গন্ধেই প্রযুক্ত হয়। পরমাণুগতগন্ধেও গন্ধত্ব থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই।

গন্ধ বৈশেষিকমতে দু'প্রকার – সুরভি (সুগন্ধ) এবং অসুরভি (দুর্গন্ধ)। গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে, তাই গন্ধ হল একটি বিশেষ গুণ। রূপাদির ন্যায় গন্ধও একটি ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ; তবে তা পাকজ। অর্থাৎ তেজ বিশেষের সংযোগে পৃথিবীতে পূর্বগন্ধ পরিবর্তিত হয়ে নতুন গন্ধের উৎপত্তি হয়। তাই গন্ধমাত্রকে বৈশেষিকাচার্যগণ অনিত্য বলেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কোনও বহিরিন্দ্রিয় দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধকে কিংবা গন্ধত্বকে কিংবা গন্ধাভাবকে জানতে পারলেও; গন্ধের অধিকরণকে জানতে পারে না।

স্পর্শঃ বৈশেষিক-সম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে চতুর্থ গুণ হল স্পর্শ। স্পর্শের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – 'স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ'[১২১] অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণকেই স্পর্শ বলা হয়েছে। এস্থলে 'ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব'কে স্পর্শের লক্ষণ বলা হলে সংখ্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু সংখ্যাদিও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এজন্য 'ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' না বলে 'ত্বগিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যত্ব'কে স্পর্শের লক্ষণ বলতে হবে। অর্থাৎ যে গুণটি কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, তাকেই স্পর্শ বলে। সুতরাং 'চক্ষুরিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বে সতি ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বে সতি গুণত্ব'ই হল স্পর্শের লক্ষণ। প্রদত্ত লক্ষণটিতে যদি 'গুণ' শব্দটিকে প্রযুক্ত না করা হত; তা হলে স্পর্শত্বে অতিব্যাপ্তি হত। এই অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত নয়; অথচ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে গুণ, তাকেই স্পর্শ বলা হয়েছে। কিন্তু স্পর্শের এরূপ লক্ষণটিও যথাযথ নয়। কারণ পরমাণু প্রভৃতিতে স্থিত স্পর্শে অব্যাপ্তি থেকেই যায়। যেহেতু পরমাণুস্পর্শটি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অগৃহীত হলেও ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অথচ তা একটি গুণ। তাই স্পর্শের লক্ষণ বলা হয়েছে – 'চক্ষুরিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবিভাজকজাতিমত্ত্ব' - এরূপ বললে স্পর্শত্ব জাতিটি যেমন

---

[১২১] ঐ, পৃষ্ঠা – ২০৪।

কার্যাত্মক পৃথিব্যাদি দ্রব্যগত স্পর্শে থাকে; তেমনই পরমাণুগতস্পর্শেও বিদ্যমান। ফলত লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত হয়ে যায়।

বৈশেষিকমতে রূপাদির ন্যায় স্পর্শও একটি বিশেষ গুণ। কারণ এটি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে বিদ্যমান। আকাশাদিতে স্পর্শ থাকে না। বৈশেষিকমতে স্পর্শ তিনপ্রকার, যথা – উষ্ণ, শীতল ও অনুষ্ণাশীত। এর মধ্যে তেজে উষ্ণ স্পর্শ থাকে, জলে শীতল স্পর্শ থাকে, আর পৃথিবী ও বায়ুতে অনুষ্ণাশীত স্পর্শ থাকে। যদিও পৃথিবীর যে অনুষ্ণাশীত স্পর্শ তা পাকজ। কিন্তু বায়ুর যে অনুষ্ণাশীত স্পর্শ তা পাকজ নয়। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ হওয়ায় তা অনিত্য; কিন্তু জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতির পরমাণুগত যে স্পর্শ তা নিত্য। আর দ্ব্যণুকাদি হতে শুরু করে স্থূল জল, স্থূল তেজ কিংবা স্থূল বায়ুর যে স্পর্শ তা অনিত্য।

সংখ্যাঃ বৈশেষিক-সম্মত পঞ্চম গুণ হল সংখ্যা। সংখ্যার লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদ বলেছেন –‘একাদিব্যবহারহেতুঃ সংখ্যা’[১২২] অর্থাৎ একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু হল যে গুণ তা সংখ্যা। তবে এখানে একত্বাদি ব্যবহারের কারণ বলতে অসাধারণ কারণকে বুঝতে হবে তা না হলে ঈশ্বর, অদৃষ্ট, কাল প্রভৃতি সাধারণ কারণে অতিব্যাপ্তি হবে। যদিও কোন কোন আচার্য্য লঘুতাবশত ‘সংখ্যাত্বজাতি’কেই সংখ্যার লক্ষণ বলেছেন। সংখ্যা সমস্ত দ্রব্যে থাকায় এটি হল একটি সামান্য গুণ। সংখ্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – ‘সা পুনরেকদ্রব্যা চ অনেকদ্রব্যা চ’[১২৩] অর্থাৎ তা একদ্রব্যা ও অনেকদ্রব্যা ভেদে দ্বিবিধ। একটি দ্রব্য যার সম্বন্ধীরূপে আশ্রয় হয় তা হল একদ্রব্যা, যেমন – একত্ব সংখ্যা, এই একত্ব সংখ্যা একটিমাত্র দ্রব্যে আশ্রিত। আর অনেকদ্রব্য যার সম্বন্ধীরূপে আশ্রয় হয়, তা হল অনেকদ্রব্যা, যেমন- দ্বিত্ব, ত্রিত্ব থেকে শুরু করে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা হল অনেকদ্রব্যা। এখানে উল্লেখ্য যে, একদ্রব্যা যে একত্ব সংখ্যা তা যখন নিত্যপরমাণু প্রভৃতিতে থাকে তখন তা নিত্য হয়, আবার তা যখন দ্ব্যণুক থেকে শুরু যেকোনও অনিত্য ঘট, পটাদি

---

[১২২] ঐ, পৃষ্ঠা – ২১৫।

[১২৩] ঐ, পৃষ্ঠা – ২১৫।

দ্রব্যে থাকে তখন তা অনিত্য হয়ে থাকে। তবে দ্বিত্বাদি সংখ্যা সবসময় অনিত্য হয়ে থাকে। এই দ্বিত্বাদি সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি[১২৪] বলা হয়েছে, কারণ এগুলি একটিমাত্র দ্রব্যে থাকে না, একাধিক দ্রব্যে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে[১২৫] বিদ্যমান থাকে।

পরিমাণঃ

বৈশেষিকস্বীকৃত ষষ্ঠ গুণটি হল পরিমাণ। পরিমাণও সংখ্যার ন্যায় একটি সামান্য গুণ। পরিমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'পরিমাণং মানব্যবহারকারণম্'[১২৬] অর্থাৎ যে গুণটি মাণ তথা পরিমাপ ব্যবহারের কারণ হয়, তা হল পরিমাণ। এখন আপত্তি হতে পারে, 'যা পরিমাপ ব্যবহারের কারণ হয়' এমন বলা হলে ঈশ্বর প্রভৃতি সাধারণ কারণমাত্রে প্রদত্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে, যেহেতু ঈশ্বর, অদৃষ্ট, কাল প্রভৃতি কার্যের প্রতি সাধারণ কারণ হয়ে থাকে। সেই কারণে 'যা পরিমাপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হয় তাকেই পরিমাণ বলতে হবে। যদিও অনেক আচার্য্য 'পরিমাণত্ব' জাতিকেই পরিমাণের লক্ষণ বলেছেন। বৈশেষিকমতে, পরিমাণ চারপ্রকার – 'তচ্চতুর্বির্ধম্ অণু মহদ্দীর্ঘংহ্রস্বংচেতি'[১২৭] অর্থাৎ পরিমাণ অণুত্ব, মহত্ত্ব, দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্বভেদে চার প্রকার, যেমন- পরমাণু, দ্ব্যণুক প্রভৃতির যে পরিমাণ তা হল অণুপরিমাণ। ত্র্যণুক হতে শুরু করে কাষ্ঠ প্রভৃতি দৃশ্যমান বস্তুমাত্রই মহৎত্ত্ব পরিমাণবিশিষ্ট। বংশ প্রভৃতিতে যে পরিমাণ তা হল দীর্ঘত্ব, আর শলাকাদিতে যে পরিমাণ তা হল হ্রস্বত্ব।

---

১২৪ 'একত্বানবচ্ছিন্নপর্যাপ্তিকত্বং ব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম্' অর্থাৎ যার অবস্থান নিয়ত একাধিক বস্তুকে অপেক্ষা করে, সেই ধর্মই ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম। দ্বিত্বাদি সংখ্যাকে বৈশেষিকাচার্যগণ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম বলেছেন, যেহেতু এগুলি দুই বা ততোধিক বস্তুতে থাকে।

১২৫ 'পর্যাপ্তিশ্চ অয়মেকো ইমৌ দ্বৌ ইত্যাদিপ্রতীতিসাক্ষিকস্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ' অর্থাৎ 'এটি এক', 'এটি এক' এভাবে একত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে অপেক্ষা করে যে দ্বিত্ব প্রভৃতি প্রতীতি হয়ে থাকে, সেই প্রতীতির বিষয় যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা তা পর্যাপ্তিসম্বন্ধেই একাধিক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে। এই পর্যাপ্তি সম্বন্ধ হল সর্বাংশিক, তা ঐকদেশিক নয়। অর্থাৎ 'দুই' এরূপ প্রতীতিতে দ্বিত্বাবচ্ছেদে দ্বিত্ব পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে, কিন্তু একত্বাবচ্ছেদে দ্বিত্ব পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে না।

১২৬ ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩৯।

১২৭ ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩৯-১৪০।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা তো ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময়ই ছটাক, পোয়া, সের, মান, গ্রাম, লিটার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে পরিমাণকে বোঝাই তা হলে এগুলি কি পরিমাণ নামক গুণের অন্তর্ভুক্ত হবে ? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণের মত অবলম্বন করে বলা যায় – এগুলিও এক এক ধরণে পরিমাণ নামক গুণ, তবে তা দীর্ঘাদি চতুর্বিধ পরিমাণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

এখন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, একই দ্রব্যে তো মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব থাকতে পারে, অনুরূপভাবে যা অণুপরিমাণবিশিষ্ট তাকেই হ্রস্ব বলা যেতে পারে, তা হলে এরূপ চতুর্বিধ বিভাগের প্রয়োজন কী? এর উত্তরে বলা যায়, মহৎ দ্রব্যে দীর্ঘত্ব পরিমাণ থাকতে পারে কিন্তু যখন অনেকগুলি মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে থেকে দীর্ঘত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যকে আনতে বলা হয় তখন তাদের মধ্যে থেকে কাকে আনা হবে? কেননা সবগুলিই তো মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট। কাজেই দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব এরূপ বিশিষ্ট ব্যবহারের অসাধারণ কারণরূপে দীর্ঘত্বাদি পরিমাণ অবশ্যস্বীকার্য। এখন আপত্তি হতে পারে, পরিমাণ তো ব্যাপ্যবৃত্তি, তা যে দ্রব্যে থাকে সেই দ্রব্যকে ব্যাপ্ত করে অবস্থান করে। তা হলে একই দ্রব্যকে কীভাবে 'মহৎপরিমাণবিশিষ্ট' এবং 'দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট' বলা হবে? এর উত্তরে বলা যায়- দুটি বিজাতীয় পরিমাণ কখনও একই দ্রব্যে বৃত্তি হতে পারে না কিন্তু সজাতীয় দুটি পরিমাণ একই দ্রব্যে বৃত্তি হতেই পারে।

যাইহোক বৈশেষিকমতে, পরিমাণ চারপ্রকার, যথা- অণুত্ব, মহত্ত্ব, দীর্ঘত্ব, হ্রস্বত্ব। এদের মধ্যে মহত্ত্ব পরিমাণ আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে যে মহত্ত্ব পরিমাণ থাকে তা নিত্য। তবে আকাশ পরমমহত্ত্বপরিমাণ বিশিষ্ট হওয়ায় তাকে বিভু বলা হয়েছে। আবার ত্রসরেণু হতে শুরু করে যাবৎ কার্যদ্রব্যে যে মহত্ত্ব পরিমাণ থাকে তা হল অনিত্য। অণুত্ব পরিমাণও, নিত্য অণুত্ব ও অনিত্য অণুত্বভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভূতের পরমাণুতে যে অণুত্ব পরিমাণ থাকে তা কিন্তু নিত্য। তবে প্রথম উৎপন্ন কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুকে যে অণুত্ব পরিমাণ থাকে তা কিন্তু অনিত্য। যেহেতু দ্ব্যণুক অনিত্য। আর হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণ সর্বত্রই অনিত্য হয়ে থাকে।

পৃথক্ত্বঃ

বৈশেষিকসম্মত সপ্তম গুণটি হল পৃথক্ত্ব। পৃথক্ত্ব এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'পৃথক্ত্বমপোদ্ধারব্যবহারকারণম্'[১২৮]। অভিপ্রায় এই যে, একটিকে অপেক্ষা করে অন্যটির নির্ধারণকে অপোদ্ধার বলা হয়। এখন 'এটি ওটি হতে পৃথক', 'এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হতে পৃথক' এরূপ যে অপদ্ধাররূপ ব্যবহার সেই ব্যবহারের অসাধারণ কারণ যে গুণ তাকেই পৃথক্ত্ব বলা হয়েছে। এই পৃথক্ত্ব নামক গুণটি সকল দ্রব্যে থাকায় এটিকে সামান্যগুণ বলা হয়েছে। এই পৃথক্ত্ব আবার একদ্রব্যক এবং অনেক দ্রব্যক ভেদে দ্বিবিধ। 'ঘট পট হতে পৃথক' কিংবা 'পট ঘট হতে পৃথক' এস্থলে ঘটে কিংবা পটে যে পৃথক্ত্ব তা 'একদ্রব্যক পৃথক্ত্ব'। কিন্তু যখন বলা হয় রাম, সীতা, মীরা....অনন্যা, দীপালি মধুর থেকে পৃথক – তখন রাম, সীতা কিংবা মীরাতে যে পৃথক্ত্ব তা অনেক দ্রব্যক পৃথক্ত্ব। এখন মনে হতে পারে, 'ঘট পট নয়' এস্থলে অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই তো ঘট যে পট হতে পৃথক তা বোঝা যায়, তা হলে তার জন্য পৃথক্ত্ব নামক অতিরিক্ত একটি গুণ স্বীকারের আবশ্যকতা কী? এর উত্তরে বলা যায়, 'ঘট পট নয়' আর 'ঘট পট হতে পৃথক' এই দুটি ব্যবহার এক নয়। এস্থলে একটি জ্ঞানের বিষয় নিষেধ মুখে আর অন্য জ্ঞানটির বিষয় বিধিমুখে। কাজেই প্রয়োগের ভেদবশতঃ অন্যোন্যাভাব ও পৃথক্ত্বকে ভিন্ন বলাই সঙ্গত।

সংযোগঃ

বৈশেষিকসম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে অষ্টম গুণ হল সংযোগ। এই সংযোগ বৈশেষিকমতে একটি সামান্য গুণ। যেহেতু এই গুণটি সকল দ্রব্যেই থাকে। প্রশস্তপাদাচার্য সংযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'সংযোগঃসংযুক্তপ্রত্যয়নিমিত্তম্'[১২৯] অর্থাৎ 'এই দ্রব্যের সঙ্গে এই দ্রব্যটি সংযুক্ত' এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হল সংযোগ। বৈশেষিকমতে

[১২৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৪৯।
[১২৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৫১।

'অপ্রাপ্তয়ো প্রাপ্তিঃ সংযোগ'[১৩০]। 'প্রাপ্তি' মানে সম্বন্ধ। যেটি যার সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল না তার সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা হল সংযোগ। যেমন – বৃক্ষের সঙ্গে পক্ষীর কোন সম্বন্ধ নেই, কিন্তু যখনই পক্ষীটি উড়ে এসে গাছে বসল তখন তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হল। এই সাদি ও সান্ত সম্বন্ধই হল সংযোগ। বৈশেষিকমতে সংযোগ তিন প্রকার – অন্যতর কর্মজ, উভয় কর্মজ এবং সংযোগজ। একটি বাজপাখি উড়ে এসে গাছের ডালে বসল – এস্থলে বাজপাখিটির সঙ্গে গাছের ডালের যে সংযোগ তা হল অন্যতরকর্মজ সংযোগ। কারণ প্রদত্ত ক্ষেত্রে বাজপাখিটির 'উড়ে আসা'রূপ ক্রিয়ার জন্যই এই সংযোগটি উৎপন্ন হয়েছে। অন্যতরের কর্মজন্য এই সংযোগটি উৎপন্ন হওয়ায় এই প্রকার সংযোগকে অন্যতরকর্মজ সংযোগ বলা হয়। উভয় কর্মজ সংযোগের উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দুজন পালোয়ান দুই দিক থেকে দৌড়ে এসে যুদ্ধ শুরু করলে তাদের যে সংযোগ, তা উভয় কর্মজ সংযোগ। আর আঙ্গুলের সাথে কলমের সংযোগবশতঃ শরীরের সাথে কলমের যে সংযোগ তা হল সংযোগজ সংযোগের দৃষ্টান্ত। ন্যায়-বৈশেষিকমতে এই সংযোগ হল একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। কারণ দুটি সংযোগীর সমস্ত অংশ জুড়ে সংযোগ থাকে না, একটা অংশে সংযোগ থাকলেও অন্য অংশে সংযোগের অভাব থাকে। তাই তাঁরা সংযোগকে অনিত্য বলেন। যদিও ভাট্টমীমাংসক দুটি বিভু দ্রব্যের সংযোগকে নিত্য বলেছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকমতে, সংযোগ কখনও নিত্য হতে পারেনা, যেহেতু তা উৎপন্ন।

বিভাগঃ বৈশেষিক সম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে নবম প্রকার গুণ হল বিভাগ। বিভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেছেন – 'বিভাগো বিভক্তপ্রত্যয়নিমিত্তম্'[১৩১] অর্থাৎ 'এই দুটি দ্রব্য বিভক্ত' কিংবা 'এই দ্রব্যটি ঐ দ্রব্য হতে বিভক্ত' - এ প্রকার যে প্রতীতি আমাদের হয় তার অসাধারণ কারণ হল বিভাগ। অভিপ্রায় এই যে, 'এই দ্রব্য হতে এই দ্রব্য বিভক্ত' এরূপ যে ব্যবহার তার কারণ হয় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয় হয় যে গুণ পদার্থটি সেটি হল বিভাগ। বৈশেষিকমতে, বিভাগও একটি সামান্যগুণ যেহেতু

---

[১৩০] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৫১।
[১৩১] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৬৫।

বৈশেষিকসম্মত নয়প্রকার দ্রব্যেই বিভাগ বিদ্যমান। বিভাগ তিনপ্রকার - অন্যতরকর্মজ, উভয়কর্মজ এবং বিভাগজ। যে দুটি দ্রব্যের পরস্পর বিভাগ হয় সেই দুটি দ্রব্যের কোন একটি দ্রব্যের ক্রিয়া হতে বিভাগ উৎপন্ন হলে সেই বিভাগ হবে অন্যতরকর্মজ, যেহেতু অন্যতরের বা একতরের ক্রিয়ার ফলেই বিভাগটি উৎপন্ন হয়েছে। আর বিভজ্যমান দুটি দ্রব্যের ক্রিয়া বা কর্ম হতে বিভাগ উৎপন্ন হলে তা হবে উভয়কর্মজ। যেমন - পরস্পর সংযুক্ত মল্লদ্বয় যখন প্রথমে সংযুক্ত থেকে পরে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয় তখন তাদের মধ্যে যে বিভাগ জন্মে, তা উভয়কর্মজ। আর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন যে বিভাগ হয়, তা বিভাগজ বিভাগ। প্রথমে হাত দিয়ে গাছকে স্পর্শ করে হাত যখন সরিয়ে নেওয়া হয় তখন হাত ও গাছের পরস্পর বিভাগ হতে শরীর এবং গাছের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভাগ জন্মায় তা হল বিভাগজ বিভাগ।

পরত্বাপরত্বঃ বৈশেষিক সম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে দশম এবং একাদশ গুণ হল যথাক্রমে পরত্ব এবং অপরত্ব। প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হয়েছে – ‘পরত্বমপরত্বং চ পরাপরাভিধানপ্রত্যয়নিমিত্তম্’[১৩২]। অভিপ্রায় এই যে, ‘এই স্থান অপেক্ষা এই স্থান পর’ অর্থাৎ দূর এবং ‘এই ব্যক্তি অপেক্ষা এই ব্যক্তি পর’ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ - এরূপ পরত্ব ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হল পরত্ব নামক গুণ। এই পরত্ব দৈশিক ও কালিক ভেদে দ্বিবিধ। দৈশিক পরত্ব হল দূরত্ব এবং কালিক পরত্ব হল জ্যেষ্ঠত্ব। অনুরূপভাবে ‘এই স্থান অপেক্ষা এই স্থান অপর’ অর্থাৎ নিকট এবং ‘এই ব্যক্তি অপেক্ষা এই ব্যক্তি অপর অর্থাৎ কনিষ্ঠ’ - এরূপ অপরত্ব ব্যবহারের অসাধারণ কারণ হল অপরত্ব নামক গুণ। এই অপরত্বও পরত্বের ন্যায় কালিক ও দৈশিকভেদে দ্বিবিধ। দৈশিক অপরত্ব হল নিকটত্ব, আর কালিক অপরত্ব হল কনিষ্ঠত্ব।

বুদ্ধিঃ বৈশেষিক মতে বুদ্ধি হল আত্মার এক বিশেষ গুণ। জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, প্রত্যয়, উপলব্ধি, চৈতন্য প্রভৃতি হল বুদ্ধিরই নামান্তর। বুদ্ধি নামক গুণ কেবলমাত্র জীবাত্মাতেই সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারাই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, আহার, বিহার

---

[১৩২] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৮২।

প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হয়। বৈশেষিক মতে, জ্ঞান একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। কারণ কেবলমাত্র শরীরাবচ্ছেদে আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঘটাদ্যবচ্ছেদে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

সুখঃ বৈশেষিকসম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে ত্রয়োদশ গুণ হল সুখ। সুখের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হয়েছে – 'অনুগ্রহলক্ষণং সুখম্'[১৩৩] অর্থাৎ যে পদার্থের জ্ঞান হলে প্রাণীগণের অনুকূল বোধ হয় তা হল সুখ। সাধু, অসাধু, ধনী, দরিদ্র, রোগী-ভোগী, সকল জীবই সুখকে অনুকূল বেদনীয় অর্থাৎ অনুকূল জ্ঞানের বিষয় মনে করে। সুখ জীবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। জ্ঞান যেমন একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ, সুখও তেমনই অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ।

দুঃখঃ দুঃখ সুখের ঠিক বিপরীত গুণ। যা সকলের প্রতিকূল বলে বোধ হয়, তা হল দুঃখ। দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেছেন – 'উপঘাতলক্ষণং দুঃখম্'[১৩৪]। এটিও আত্মার একটি বিশেষ গুণ। কেবল শরীরাবচ্ছেদে আত্মায় দুঃখ উৎপন্ন হয় বলে একে অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলা হয়েছে।

ইচ্ছাঃ বৈশেষিকসম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে পঞ্চদশ গুণ হল ইচ্ছা। লালসা, কামনা, স্পৃহা, অভিলাষ প্রভৃতি ইচ্ছারই নামান্তর। ইচ্ছা জ্ঞানাদির ন্যায় জীবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। ইচ্ছা দুই প্রকার - ফলবিষয়ক এবং উপায়বিষয়ক ইচ্ছা। সুখ এবং দুঃখাভাব - এই দু'টি ফল। 'আমার সুখ হোক' কিংবা 'আমার দুঃখাভাব হোক' এই আকারে যে ইচ্ছা তা ফলবিষয়ক ইচ্ছা। আর সুখ এবং দুঃখাভাব প্রাপ্তির উপায় হিসাবে যা কিছু কামনা করা হয় তা হল উপায়বিষয়ক ইচ্ছা।

দ্বেষঃ বৈশেষিকসম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে ষোড়শ গুণ হল দ্বেষ। দ্বেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য্য বলেছেন – 'প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষঃ'[১৩৫] অর্থাৎ যে গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হলে লোকে নিজেকে প্রজ্বলিতের মত মনে করে সেই গুণ পদার্থটিই হল দ্বেষ। এই দ্বেষ

---

[১৩৩] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩১।

[১৩৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩১।

[১৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩২।

জীবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। কারণ দ্বেষ সমবায় সম্বন্ধে কেবল জীবাত্মাতেই উৎপন্ন হয় এবং এটি উৎপত্তি-বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য হয়ে থাকে।

প্রযত্নঃ বৈশেষিকমতে উৎসাহের অপর নাম হল প্রযত্ন। কৃতি, উৎসাহ, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রযত্নেরই নামান্তর। চেষ্টা বা ক্রিয়া হল প্রযত্নের বিষয়। এটিও আত্মার একটি বিশেষ গুণ। এই প্রযত্ন নামক গুণ সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতেই থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় প্রযত্নও নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য, এক এবং সমগ্র জগদ্‌বিষয়ক। অপরদিকে জীবাত্মার প্রযত্ন উৎপত্তি-বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য, বহু এবং যৎকিঞ্চিৎ বস্তু-বিষয়ক হয়ে থাকে।

গুরুত্বঃ বৈশেষিকমতে 'আদ্যপতনাসমবায়িকারণং গুরুত্বম্' অর্থাৎ যে গুণ আদ্যপতনের অসমবায়ি কারণ হয়, সেই গুণ হল গুরুত্ব। কোন বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে তখন অধোদেশের সঙ্গে সেই বস্তুর সংযোগ হয়, সেই সংযোগের জনক যে মূর্তদ্রব্যস্থ ক্রিয়াবিশেষ তা হল পতন। পাকা আম যখন গাছ হতে নীচে পড়ে, তখন আমের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ হয়, সেই সংযোগের জনক আমের ক্রিয়াবিশেষ হল পতন। শাখা হতে আমের বিভাগের জনক যে প্রথম ক্রিয়া, সেই প্রথম ক্রিয়া হতে আমের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ হওয়া পর্যন্ত যতসংখ্যক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ক্রিয়াগুলি অধঃসংযোগের অনুকূল হওয়ায় 'পতন' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। প্রথম পতনের অর্থাৎ প্রাথমিক পতন ক্রিয়ার অসমবায়িকারণ হল আমের গুরুত্ব। এই গুরুত্ব নামক গুণটি সকল জলীয় ও পার্থিব বস্তুতে থাকে।

দ্রবত্বঃ 'আদ্যস্যন্দনাসমবায়িকারণং দ্রব্যম্' অর্থাৎ আদ্য বা প্রথম ক্ষরণের অসমবায়িকারণ হয় যে গুণ পদার্থটি তা হল দ্রবত্ব। পর্বতাদির উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত জল প্রভৃতির নিম্নদেশের সঙ্গে যে সংযোগ হয়, সেই সংযোগজনক জলাদির ক্রিয়াবিশেষ হল স্যন্দন, প্রবহণ বা ক্ষরণ। অভিপ্রায় এই যে, কোন তরল বস্তু যখন একস্থান হতে অন্যস্থানে বয়ে যায় অর্থাৎ প্রবাহিত হয়, তখন প্রথম স্থান হতে ক্ষরিত হয়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছাতে ঐ

তরল পদার্থে অনেক স্যন্দনক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ঐ সমস্ত স্যন্দনক্রিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ক্রিয়ার অসমবায়ি কারণ হয় যে গুণ পদার্থটি তা হল দ্রবত্ব বা তরলতা।

স্নেহঃ 'চূর্ণাদিপিণ্ডীভাবহেতুর্গুণঃ স্নেহঃ' অর্থাৎ যে গুণের সাহায্যে আটা, ময়দা প্রভৃতি চূর্ণীভূতদ্রব্য সংযুক্ত হয়ে পিণ্ডাকার প্রাপ্ত হয়, সেই গুণই হল স্নেহ। স্নেহ হল জলের বিশেষ গুণ। স্নেহ নামক গুণটি নিত্য জলীয় পরমাণুতে নিত্য, আবার কার্যজলে তা অনিত্য হয়ে থাকে।

সংস্কারঃ সংস্কারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'আত্মবিশেষগুণবৃত্তি-মূর্তদ্রব্যমাত্রবৃত্তি-বৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমান্ সংস্কারঃ' অর্থাৎ আত্মার বিশেষ গুণে বিদ্যমান এবং মূর্তদ্রব্যে-বিদ্যমান-গুণে বিদ্যমান যে গুণত্বজাতির ব্যাপ্য সংস্কারত্ব জাতি, সেই জাতির দ্বারা যুক্ত গুণই হল সংস্কার। বৈশেষিক মতে এই সংস্কার বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকভেদে ত্রিবিধ।

অদৃষ্টঃ অদৃষ্ট হল শাস্ত্র-বিহিত ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম হতে উৎপন্ন স্বর্গ-নরকাদির হেতু আত্মনিষ্ঠ গুণবিশেষ। ধর্ম ও অধর্ম এই উভয়কে 'অদৃষ্ট' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান হতে উৎপন্ন আত্মার গুণবিশেষই হল ধর্ম। অপরদিকে বেদনিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠান হতে উৎপন্ন আত্মার গুণবিশেষ হল অধর্ম।

শব্দঃ বৈশেষিকসম্মত চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে একটি অন্যতম গুণ হল শব্দ। শব্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্যগণ বলেছেন – 'শোত্রগ্রাহ্যো গুণঃ শব্দঃ'[১৩৬] অর্থাৎ যে গুণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, তা হল শব্দ। শব্দ আকাশ নামক দ্রব্যের একটি বিশেষ গুণ। কারণ তা কেবলমাত্র আকাশেই আশ্রিত। শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কাজেই আকাশ হল শব্দের সমবায়িকারণ। বৈশেষিক মতে শব্দ তিন প্রকার – সংযোগজন্য, বিভাগজন্য এবং শব্দজন্য। ভেরীর সঙ্গে দণ্ডের সংযোগ থেকে ভেরীদেশাবচ্ছিন্ন আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা সংযোগজন্য শব্দ। আবার বাঁশ ফাটালে বাঁশের দু'টি অংশের যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগজন্য যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা বিভাগজ শব্দ। আর ভেরীদেশ থেকে কিংবা

[১৩৬] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৬৯।

বংশদেশ থেকে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তিস্থল হতে আরম্ভ করে শোত্রদেশ পর্যন্ত কদম্বমুকুলন্যায়ে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তা শব্দজন্য শব্দ।

কর্ম

বৈশেষিকসম্মত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে তৃতীয় পদার্থ হল **কর্ম**। কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্'[১৩৭] অর্থাৎ যা একৈক, তথা যা এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না, নির্গুণ এবং সংযোগ-বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ হয় তা হল কর্ম। 'যা এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না' এটুকুকে যদি দ্রব্যের লক্ষণ বলা হত তা হলে আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে উক্ত কর্মের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কারণ আকাশাদি নিত্যদ্রব্য কোথাও বৃত্তি হয় না। এই হেতু কর্মের লক্ষণে 'নির্গুণ' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আকাশাদি এককালে একাধিক পদার্থে বৃত্তি না হলেও তা নির্গুণ নয়, কারণ শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু উক্ত লক্ষণটিও যথাযথ নয়; কারণ রূপ, রসাদি গুণও এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না এবং গুণস্বরূপ হওয়ায় তা নির্গুণ। কাজেই লক্ষণ লক্ষ্যের অধিকদেশবৃত্তি হয়ে পড়ছে, অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, যা একৈক দ্রব্যমাত্রবৃত্তি, নির্গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয়; তা হল কর্ম। রূপ, রসাদি সংযোগাদির কারণ না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু কর্ম সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ হয়ে থাকে। তবে লক্ষণে যদি 'অনপেক্ষ' পদটি সন্নিবিষ্ট না হত, তা হলে অদৃষ্টে অতিব্যাপ্তি হত। কারণ অদৃষ্ট সকল জন্য বস্তুরই কারণ হয়, কাজেই তা সংযোগ ও বিভাগেরও কারণ হয়ে থাকে। তবে তা সংযোগ, বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয় না; অদৃষ্ট স্বোত্তরকালোৎপন্ন কর্মাদিকে অপেক্ষা করেই সংযোগাদির কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং যা একৈক, নির্গুণ এবং সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ তাকেই বৈশেষিক দর্শনে কর্ম বলা হয়েছে।

[১৩৭] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৫২।

মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি'[১৩৮] অর্থাৎ বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার, যথা - উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ (অবক্ষেপণ), আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

উৎক্ষেপণঃ 'ঊর্ধ্বদেশসংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম উৎক্ষেপণম্' অর্থাৎ যে কর্মটি ঊর্ধ্বদেশসংযোগের অসমবায়িকারণ হয়, তা হল **উৎক্ষেপণ**। একটি পাথরের টুকরোকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল, এর ফলে পাথরে একটি ক্রিয়া উৎপন্ন হবে, যার জন্য পাথরের টুকরোটির সাথে তার ঊর্ধ্বদেশের সংযোগ ঘটবে। এস্থলে পাথরের টুকরোটির সাথে তার ঊর্ধ্বদেশের সংযোগ –এর প্রতি সমবায়িকারণ হবে পাথরের টুকরোটি এবং তার ঊর্ধ্বদেশ। আর অসমবায়িকারণ হবে যে ক্রিয়া বা কর্মটি তাকে উৎক্ষেপণ বলা হয়েছে।

অপক্ষেপণ (অবক্ষেপণঃ) 'অধঃসংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম অপক্ষেপণম্' অর্থাৎ মূর্ত-দ্রব্যের অধোদেশসংযোগের অসমবায়িকারণ যে কর্ম তা হল **অপক্ষেপণ**। ধরাযাক, পাথরের টুকরোটিকে কেউ উপর থেকে নিচে ফেললো, এর ফলে পাথরের টুকরোটিতে একটি ক্রিয়া উৎপন্ন হবে, যার ফলে পাথরের টুকরোটির সাথে তার পূর্বদেশের বিভাগ উৎপন্ন হবে এবং পরক্ষণে ঐ কর্মজন্য পূর্বদেশসংযোগ বিনষ্ট হবে এবং তার পরক্ষণে অধোদেশ-সংযোগ উৎপন্ন হবে। যে ক্রিয়াটির জন্য বস্তুটিতে অধোদেশসংযোগ উৎপন্ন হল তাকে অপক্ষেপণ বলা হয়।

আকুঞ্চনঃ 'অভিমুখদেশসংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম আকুঞ্চনম্' অর্থাৎ মূর্তদ্রব্যের অভিমুখদেশের সঙ্গে যে সংযোগ, সেই সংযোগের অসমবায়িকারণ যে কর্ম তাকে **আকুঞ্চন** বলে। মূলকথা হল যে কর্মটির জন্য শরীর সন্নিকৃষ্ট দেশসংযোগ উৎপন্ন হয়, তাকে আকুঞ্চন বলা হয়েছে। ধরাযাক, কিছু তুলাকে মুষ্ঠীবদ্ধ করা হল। তখন তুলাগুলির অবয়ব সন্নিকৃষ্ট দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবে। যে ক্রিয়ার জন্য তুলাটির স্ব-অবয়বসন্নিকৃষ্ট দেশসংযোগ উৎপন্ন হল তাকে আকুঞ্চন বলা হয়েছে। বস্তুর বক্রতা সম্পাদক ক্রিয়া হল আকুঞ্চন।

---

[১৩৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৩।

প্রসারণঃ 'তির্যক্‌সংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম প্রসারণম্‌' অর্থাৎ মূর্তদ্রব্যের তির্যক্‌ দেশের সঙ্গে যে সংযোগ, তার অসমবায়িকারণ হয় যে ক্রিয়াটি তা হল **প্রসারণ**। যে ক্রিয়াটির জন্য মূর্তদ্রব্যের শরীর বিপ্রকৃষ্ট দেশসংযোগ উৎপন্ন হয় তাকে প্রসারণ বলা হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আকুঞ্চনের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া হল প্রসারণ।

গমনঃ 'অনিয়তোত্তরদেশসংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম গমনম্‌' অর্থাৎ মূর্তদ্রব্যের অনিয়ত দেশের সঙ্গে যে সংযোগ, সেই সংযোগের হেতু হয় যে কর্ম তা হল **গমন**। ভ্রমণ (কুম্ভকারের চক্রের যে ঘূর্ণন ইত্যাদি), রেচন (অন্তঃস্থিত তরল বস্তুর বহির্নিঃসরণ), স্যন্দন (তরল দ্রব্যের প্রবহন), ঊর্ধ্বজ্বলন (উপরের দিকে শিখা বিস্তার করা), তির্যক্‌ গমন (ভূতলে সর্পাদির গতি প্রভৃতি), প্রবেশন (প্রবেশ করা), নিষ্ক্রমণ (প্রস্থান করা) প্রভৃতি গমন ক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আশঙ্কা হতে পারে উৎক্ষেপণাদি স্থলে যেমন 'ঊর্ধ্বং গচ্ছতি', 'অধো গচ্ছতি' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়ে থাকে, তদনুরূপ 'ইদং কর্ম', 'ইদং কর্ম' এরূপ প্রত্যয়ও হয়ে থাকে। কাজেই গমনত্ব ও কর্মত্ব পরস্পর ভিন্ন নয়, তারা ঘট ও কলসাদির ন্যায় অভিন্ন। কাজেই গমন নামক অতিরিক্ত একটি ক্রিয়া স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। সুতরাং ক্রিয়া হল চার প্রকার। এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় গমনকে পৃথক ক্রিয়া হিসাবে স্বীকার না করা হলে ভ্রমনাদি ক্রিয়ার কর্মত্বই সিদ্ধ হবে না। যেহেতু উৎক্ষেপণাদি স্থলে 'উৎক্ষিপতি' ইত্যাদি প্রতীতি হলেও ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি ক্রিয়া স্থলে এইরূপ প্রতীতি হয় না। কাজেই এগুলি উৎক্ষেপণ আদি চারটি ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া গমন ক্রিয়া না থাকলে উৎক্ষেপণাদি চারটি বিশেষ ক্রিয়াই সামান্য-বিশেষ ক্রিয়াতে পর্যবসিত হত এবং এই চারটি ক্রিয়া ছাড়া আর কোন বিশেষ-ক্রিয়া থাকত না। কিন্তু ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি বিশেষ-ক্রিয়া আমাদের সকলের অনুভবসিদ্ধ। কাজেই কর্মত্ব ও গমনত্বের অভিন্ন প্রতীতি হলেও ভ্রমণ, রেচন আদিকে কর্মের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গমন ক্রিয়াটি সামান্য হলেও এখানে বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে কর্মত্ব ও গমনত্ব জাতি দু'টি কিন্তু এক নয়। গমনত্ব কর্মত্বের ব্যাপ্য জাতিবিশেষ। ভ্রমণাদিতে গমনত্ব থাকলেও উৎক্ষেপণাদিতে

বস্তুত গমনত্ব জাতি থাকে না। উৎক্ষেপণাদি স্থলে গমন-ক্রিয়ার যে প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, তা ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। সুতরাং বৈশেষিক মতে ক্রিয়া বা কর্ম পাঁচপ্রকার, যথা – উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

'ন্যায়ভূষণ'-প্রণেতা ভাসর্বজ্ঞ কিন্তু সংযোগ ও বিভাগ অতিরিক্ত কর্মকে পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে আমরা বস্তুকে সংযুক্ত কিংবা বিভক্ত হতে দেখতে পাই কিন্তু এর অতিরিক্তভাবে কর্মকে তো দেখা যায় না। এর উত্তরে '*মিতভাষিণী*' টীকাতে মাধব সরস্বতী বলেছেন – 'ন হি অয়ং স্থাণোরপরাধো যদ্যেনমন্ধো ন পশ্যতি। চলতি ইতি এবমাকারেণ সংযোগাদিবিলক্ষণস্য প্রত্যয়স্য সর্বজনীনত্বাৎ'[১৩৯]। মূল কথা হল, অন্ধ যদি সম্মুখস্থ স্থাণুকে দেখতে না পায়, তবে সেটা যেমন স্থাণুর অপরাধ নয়, তেমনই 'চলতি' ইত্যাকারে কর্ম সর্বজনসিদ্ধ হওয়ায় উপর্যুক্ত আপত্তিটিও সঙ্গত হয় না। তাছাড়া কর্ম হতেই সংযোগ ও বিভাগ উৎপন্ন হয়। ফলত সংযোগ ও বিভাগের কারণ হল কর্ম। এখন কারণ না থাকলে কার্য ঘটতে পারে না। সুতরাং সংযোগ ও বিভাগের কারণ হিসাবে কর্ম স্বীকৃত। তাছাড়া কর্ম যদি সংযোগ ও বিভাগমাত্র হত, তা হলে আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীতে মানুষের কর্ম প্রত্যক্ষ হত না। যেহেতু অপ্রত্যক্ষ আকাশের সঙ্গে পক্ষীর সংযোগ-বিভাগ মানুষের প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। এখন সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ হিসাবে কর্ম স্বীকৃত না হলে সংযোগ ও বিভাগের কারণরূপে অন্য কোন পদার্থের কল্পনা করতে হয় – কিন্তু তা প্রমাণসিদ্ধ নয়। সুতরাং সংযোগ ও বিভাগের কারণরূপে কর্ম নামক পদার্থটিকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

প্রাভাকর-মীমাংসক সম্প্রদায় কর্মকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করলেও তাঁদের মতে কর্মের প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না, আমরা সংযোগ ও বিভাগের দ্বারা কর্মকে অনুমান করি। কিন্তু এই মত যথাযথ নয়। কারণ সংযোগ-বিভাগের দ্বারা কর্ম অনুমেয় হলে নদীর জলের মধ্যে স্থির স্থাণুতে প্রবাহের সংযোগ-বিভাগের দ্বারা ঐ স্থির স্থাণুতে কর্মের অনুমিতি

[১৩৯] Tailanga, Ramasastri (ed.), Sivaditya's *Saptapadarthi* with The Mitabhashini of Madhava Sarasvati, Vol- Vi, Benares, E. J. Lazarus & Co., 1893, page – 12.

হবে, যা সঙ্গত হবে না। তাই বৈশেষিক মতে অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যে কর্ম অনুমেয় হলেও প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে কর্মকে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি।

সামান্য

বৈশেষিকসম্মত সপ্তবিধ পদার্থের মধ্যে চতুর্থ পদার্থ হল **সামান্য**। 'সমানানাং ভাবঃ সামান্যম্' – এরূপ অর্থে 'সমান' শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ' প্রত্যয়যোগে 'সামান্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল সাধারণধর্ম। এই সাধারণধর্ম জাতি ও উপাধিভেদে দ্বিবিধ। নিত্য এবং অনেকসমবেত ধর্ম হল জাতি। আর জাতি হতে ভিন্ন সমস্ত ধর্মই হল 'উপাধি'। যেমন- মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি হল জাতি। কিন্তু আকাশত্ব, সমবায়ত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি হল উপাধি। জাতি হলে তা অবশ্যই সামান্য হবে, কিন্তু সামান্য হলে তা জাতি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে বৈশেষিকদর্শনে সামান্য ও জাতি এই শব্দদু'টিকে অভিন্নার্থক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সামান্য বা জাতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – 'নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতঞ্চ' অর্থাৎ যা নিত্য, এক এবং অনেকবৃত্তি-ধর্ম তা হল সামান্য। বৈশেষিকদর্শনে সামান্যকে নিত্য বলা হয়েছে অর্থাৎ তার উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। সামান্যের যদি উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তা হলে সামান্যের যতসংখ্যক আশ্রয় ততসংখ্যক সামান্য স্বীকার করতে হবে। ফলত মহাগৌরব হবে। অভিপ্রায় এই যে, পৃথিবীর যাবৎ ঘটে আশ্রিত 'ঘটত্ব' জাতির যদি উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তা হলে প্রতিটি ঘটব্যক্তির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটব্যক্তিতে আশ্রিত জাতিটিরও উৎপত্তি হয় - একথা স্বীকার করতে হবে। এখন পৃথিবীতে ঘট অসংখ্য হওয়ায় অসংখ্য-জাতি কল্পনা করতে হবে। ফলত মহাগৌরব ঘটবে। শুধু তাই নয়, ঘটত্ব জাতির যদি উৎপত্তি স্বীকার করা হয়; তা হলে প্রশ্ন হবে, ঘটত্ব জাতিটির উৎপত্তির কারণ ঘটোৎপাদক-সামগ্রী হবে, না তা হতে ভিন্ন কোন সামগ্রী হবে? যদি ঘটোৎপাদক-সামগ্রী হতে ঘটত্বের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তা হলে ঘট ও ঘটত্বের মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। কাজেই ঘট ও ঘটত্বকে অভিন্ন বলতে হবে। কিন্তু ঘট ও ঘটত্ব এক নয়। আবার ঘটোৎপাদক ভিন্ন সামগ্রী হতে ঘটত্বের উৎপত্তি স্বীকার

করলে ঘটত্বকে ঘটের ধর্ম বলা যাবে না। কাজেই স্বীকার করতে হয়, ঘটত্বের উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। সামান্যের আশ্রয় বিনষ্ট হলেও সামান্য বিনষ্ট হয় না। প্রলয়কালে ঘটাদি বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হলেও ঘটত্ব জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তা কালকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। কাল হল জগতের আধার, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রলয়কালে কালে থাকে। প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে ঘট-পটাদি বস্তুর যখন উৎপত্তি হয় তখন তারা স্ব স্ব জাতির সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। কাজেই বৈশেষিকমতে সামান্য বা জাতি নিত্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, সামান্যের লক্ষণের অন্তর্গত 'এক' পদটি সামান্যের লক্ষণ বোধক নয়। পরন্তু প্রতিটি ঘটব্যক্তিতে ঘটত্ব-সামান্যটি যে এক তা বোঝানোর জন্যই 'একম্' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামান্যের লক্ষণ হল – 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্' অর্থাৎ যা নিত্য তথা উৎপত্তি-বিনাশরহিত এবং অনেক ব্যক্তিতে সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত, তা হল সামান্য বা জাতি। এখন সামান্যের লক্ষণের অন্তর্গত 'নিত্যত্বে সতি' অর্থাৎ 'নিত্যত্ব সমানাধিকরণ' এই বিশেষণটিকে যদি লক্ষণে প্রযুক্ত না করা হয় এবং কেবল 'অনেক সমবেতত্ব' কে সামান্যের লক্ষণ বলা হয়, তা হলে সংযোগাদিতে সামান্যের প্রদত্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি গুণগুলি দ্বিষ্ঠ হওয়ায় অনেক সমবেত। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'নিত্যত্বে সতি' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সংযোগাদি অনেক সমবেত হলেও নিত্য নয়। কাজেই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। এখন লক্ষণে যদি 'অনেক' পদটিকে সন্নিবিষ্ট না হয় এবং 'নিত্যত্বে সতি সমবেতত্ব' এটুকুই লক্ষণ হত, তা হলে আকাশের পরিমাণে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত, যেহেতু আকাশের পরিমাণ নিত্য এবং তা আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য উক্ত লক্ষণে 'অনেক' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আকাশ-পরিমাণ একমাত্র আকাশে বৃত্তি হওয়ায় তাতে 'অনেকসমবেতত্ব' না থাকায় অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এখন যদি 'নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেকানুগতত্ব' কে সামান্যের লক্ষণ বলা হয় অর্থাৎ যে কোন সম্বন্ধে অনেকদ্রব্যে বৃত্তি – এমন বলা হয়, তা হলে অত্যন্তাভাবে সামান্যের উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ অত্যন্তাভাবও নিত্য এবং অনেকানুগত। তাই 'অনেকসমবেতত্ব' পদটিকে সামান্যের লক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং যা নিত্য

হবে এবং অনেকসমবেত হবে তা হল সামান্য। অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেক দ্রব্যে থাকলেও তা সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না, স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। কাজেই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। অতএব 'নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্ব' হল সামান্যের লক্ষণ।

এখন মনে হতে পারে, বৈশেষিকসম্মত 'সামান্য' নামক পদার্থটি স্বীকারের আবশ্যকতা কি? এর উত্তরে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনে 'এটি ঘট', 'এটি ঘট', 'এটিও ঘট' - এরূপ নানা অনুগত প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে। এই অনুগত প্রতীতির কারণ হিসাবে সামান্য পদার্থটিকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অভিপ্রায় হল, এই জগতে আমরা অসংখ্য মানুষ দেখি, যাদের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ শীর্ণকায়, আবার কেউ স্থূলকায়, কেউ সুশ্রী, কেউ সুচঞ্চল আবার কেউ স্থবির - এতদ্‌সত্ত্বেও সকলকে আমরা মানুষ বলে অভিহিত করে থাকি। এর কারণ হল এদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এমন একটা ধর্ম রয়েছে যা সমস্ত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, যার জন্য সবাইকে আমরা 'মানুষ' শব্দের দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এই ধর্মটিই হল মনুষ্যত্ব; যাকে বৈশেষিকদর্শনে সামান্য বলা হয়েছে। একইভাবে বৃক্ষত্ব, ঘটত্ব, পশুত্ব প্রভৃতিও বৈশেষিকমতে সামান্য বা জাতি।

বৈশেষিকমতে, সামান্য বা জাতি দুই প্রকার, যথা - পর সামান্য ও অপর সামান্য। মহর্ষি কণাদ *বৈশেষিক সূত্রে* বলেছেন - 'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্'[১৪০]। মূলকথা হল, সামান্য বা জাতি দ্বিবিধ - পরা জাতি আর অপরা জাতি। যে জাতিটি অধিকদেশবৃত্তি হয় তা হল **পরা জাতি** এবং তদপেক্ষা স্বল্পদেশবৃত্তি জাতি হল **অপরা জাতি**। যেমন - সত্তা জাতিটি হল পরা জাতি যেহেতু তা দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে থাকে। কিন্তু ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি হল অপরা জাতি। কারণ এগুলি তদপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, যেহেতু এগুলি কেবলমাত্র ঘট, পট প্রভৃতিতে থাকে। তবে জগদীশ তর্কালঙ্কার, কৌণ্ডভট্ট প্রমুখ আচার্য পরা ও অপরা জাতির মধ্যবর্তী পরাপর নামে তৃতীয় আর একপ্রকার জাতি স্বীকার করেছেন। শিবাদিত্য তাঁর সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলেছেন – 'সামান্যং পরম্ অপরং পরাপরং চেতি

---

১৪০ ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৭৮।

ত্রিবিধম্’[১৪১] অর্থাৎ সামান্য বা জাতি তিনপ্রকার - পরা জাতি, অপরা জাতি ও পরাপরা জাতি। যে জাতিটি সমস্ত জাতির কেবল ব্যাপক, কারও ব্যাপ্য নয়; সেরূপ জাতিটি হল পরা জাতি, যেমন - সত্তা জাতি। আর যে জাতিটি সমস্ত জাতির কেবল ব্যাপ্য, কারও ব্যাপক নয়; সেই জাতি হল অপরা জাতি, যেমন - ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদি জাতি। আর যে জাতি কোনও কোনও জাতির ব্যাপক, আবার কোন কোন জাতির ব্যাপ্য হয়, তা হল পরাপর জাতি; যেমন - পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি ঘটত্বাদি জাতি অপেক্ষা ব্যাপক, আবার সত্তা জাতি অপেক্ষা ব্যাপ্য; তাই এটিকে অনেক আচার্য পরাপরা জাতি নামে অভিহিত করেছেন।

বৈশেষিকমতে সত্তা জাতিটি সর্বদা অনুবৃত্তি-জ্ঞানের হেতু হয়। তাই সত্তা কেবল-সামান্য, কিন্তু অপর জাতিগুলি তথা ঘটত্ব, পটত্ব পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি যেমন অনুবৃত্তি-জ্ঞানের হেতু হয়, তেমনি ব্যবৃত্তি-জ্ঞানেরও হেতু হয়। তাই এই সমস্ত জাতিগুলিকে সামান্য-বিশেষ বলা হয়েছে। যেমন - ঘটত্ব জাতিটি যাবৎ ঘট ব্যক্তিতে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান থেকে ‘ইদং ঘটঃ’, ‘ইদং ঘটঃ’ এরূপ অনুগত প্রতীতির জনক হয়, আবার তা যাবৎ ঘট বস্তুকে পট প্রভৃতি বস্তু হতে ব্যবৃত্তও করে। তাই ‘ঘটত্ব’ হল সামান্য-বিশেষ।

এখন আশঙ্কা হতে পারে, বৈশেষিকমতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম – এই তিনটি পদার্থে ‘দ্রব্যং সৎ’, ‘গুণঃ সন্’, ‘কর্মঃ সৎ’ - এভাবে ‘সৎ’, ‘সৎ’ এরূপ অনুগত প্রতীতি আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। আমরা জানি অনুগত প্রতীতি অনুগত বিষয় ছাড়া সম্ভব নয়, আর উক্তরূপ অনুগত প্রতীতির বিষয় দ্রব্য, গুণ কিংবা কর্ম হতে পারে না। যেহেতু এরা পরস্পর বিলক্ষণ। তাই পরিশেষে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে অনুগত সত্তা নামক একটি জাতি অবশ্য স্বীকার্য। এইজন্য বৈশেষিকাচার্যগণ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম – এই তিনটি পদার্থকে সত্তার আশ্রয় বলেছেন। কিন্তু এখানে মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে দ্রব্যাদিতে যেমন আমাদের সৎ-প্রতীতি হয়ে থাকে, তেমনই সামান্যাদিতেও ‘সামান্যং সৎ’, ‘বিশেষঃ সন্’, ‘সমবায়ঃ

[১৪১] Tailanga, Ramasastri (ed.), Sivaditya’s *Saptapadarthi* with The Mitabhashini of Madhava Sarasvati, Vol- Vi, Benares, E. J. Lazarus & Co., 1893, page – 16.

সন্' - এরূপ সৎ-প্রতীতি হয়ে থাকে। তাহলে দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থকেই কেন আচার্যগণ সত্তার আশ্রয় বলা হয়েছে? সামান্যাদি কেন সত্তার আশ্রয় হয় না? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে বলা যায়, সত্তা জাতিটি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু তা সামান্যাদিতে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না, বরং স্বসমবায়িসমবেতত্ব নামক পরম্পরা সম্বন্ধে সত্তা সামান্যাদিতে থাকে। 'স্ব' পদে সত্তাকে ধরা হলে, সমবায়-সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয় হয় দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম অর্থাৎ 'স্বসমবায়ি' হল দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম, আর যাতে সামান্যাদি সমবেত। ফলত সত্তা সামান্যাদিতে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। তাই সামান্যাদিতেও 'সামান্যং সৎ', 'বিশেষঃ সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি হয়। কিন্তু সমবায়-সম্বন্ধে সত্তা জাতির আশ্রয় কেবল দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটি পদার্থই হয়ে থাকে। তাই দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম – এই তিনটি পদার্থকেই সত্তার আশ্রয় বলা হয়েছে।

এখন আশঙ্কা হতে পারে, অনুগত প্রতীতির দ্বারা যদি জাতি সিদ্ধ হয়, তা হলে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ - এই পাঁচটি ভূতদ্রব্যে 'অয়ং ভূতঃ', 'অয়ং ভূতঃ' - এরূপ অনুগত প্রতীতির হেতু ভূতত্বকে জাতি বলতে হবে। একইভাবে পৃথিবী, বায়ু, তেজ, জল ও মন - এই পাঁচটি দ্রব্যে 'অয়ং মূর্তঃ', 'অয়ং মূর্তঃ' - এরূপ অনুগত প্রতীতির হেতু মূর্তত্বকে জাতি বলা হোক। কিন্তু বৈশেষিক আচার্যগণ ভূতত্ব ও মূর্তত্বকে জাতি বলেন না। এর উত্তরে বলা যায়, অনুগত প্রতীতির দ্বারা ভূতত্ব কিংবা মূর্তত্ব সিদ্ধ হলেও তাঁদেরকে জাতি বলা যায় না, এরা হল জাতির বাধক। আচার্য উদয়ন তাঁর কিরণাবলী গ্রন্থে জাতিবাধকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন –

'ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।

রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ'[১৪২]।

[১৪২] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী*, দ্বিতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ১৩৮।

অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ- এই পাঁচটি হল জাতির বাধক, আর তুল্যত্ব হল জাতিভেদের বাধক।

ব্যক্তির অভেদঃ কোন ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি যদি এক হয়, তা হলে সেই ধর্মটিকে জাতি বলা যায় না। যেমন - আকাশত্ব, কালত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি জাতি নয়। কারণ আকাশত্ব, কালত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে যদি জাতিরূপে স্বীকার করা হয়, তা হলে ঐ জাতির আশ্রয় আকাশাদির ভেদ অবশ্যস্বীকার্য। যেহেতু অনুগত প্রতীতির দ্বারা জাতি সিদ্ধ হয়। ব্যক্তির ভেদ না থাকলে অনুগত প্রতীতি হয় না। আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয় আকাশাদি এক হওয়ায় অর্থাৎ দ্বিতীয় আকাশ বা দ্বিতীয় কাল না থাকায় ব্যক্তির ভেদ নেই। তাই আকাশত্ব, কালত্ব, দিক্ত্ব প্রভৃতিকে জাতি বলা যায় না। এখানে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আকাশত্ব প্রভৃতি তো জাতির লক্ষণের লক্ষ্যই নয়। যেহেতু আকাশ প্রভৃতির কোন ভেদ নেই। তা হলে লক্ষণের দ্বারাই যেখানে আকাশত্ব প্রভৃতি জাতি নয় – এটা সিদ্ধ হয়ে যায়, সেখানে জাতিবাধক হিসাবে পৃথক উল্লেখের কারণ কি? এর উত্তরে বলা যায়, আকাশত্ব প্রভৃতিকে অনেক সময় আমাদের জাতি বলে মনে হতে পারে, যেহেতু আকাশরূপ ধর্মীর শেষে 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত রয়েছে এবং মনে হতে পারে, এটি জাতি লক্ষণের লক্ষ্য, তাই লক্ষ্যে লক্ষণ প্রযুক্ত না হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকতে পারে। আকাশ যে জাতির লক্ষণের লক্ষ্য নয়, তা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য জাতিবাধকের মধ্যে ব্যক্তিরঅভেদরূপে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, ন্যায় বৈশেষিকমতে, আকাশত্ব প্রভৃতি একমাত্রবৃত্তি ধর্মগুলি নিজ আশ্রয়ে ভেদের সঙ্গে সমানাধিকরণ না হওয়ায় জাতি হিসাবে বিবেচ্য নয়।

তুল্যত্বঃ তুল্যত্ব হল তুল্যাশ্রয়ত্ব বা তুল্যবৃত্তিত্ব। যদি দুটি ধর্ম এমন হয় যে তারা তুল্যব্যক্তিতে থাকে, অন্যভাবে বলা যায়, যে ধর্মদ্বয়ের আশ্রয় ন্যূনও নয়, অতিরিক্তও নয় – এমন ধর্মদ্বয় হল তুল্যব্যক্তিবৃত্তি। যেমন – ঘটত্ব ও কলসত্ব। ঘটত্ব যেখানে থাকে কলসত্বও সেখানে থাকে, তাই এই দুটি ধর্ম হল তুল্যব্যক্তিবৃত্তি। আবার কলসত্বের আশ্রয়ব্যক্তি ঘটত্বের আশ্রয়ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূনও নয়, অতিরিক্তও নয়। কাজেই ঘটত্ব ও কলসত্বের তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব ধর্মটি হল জাতিভেদের বাধক, জাতির বাধক নয়। অভিপ্রায় এই যে,

সংস্থান বা বিলক্ষণ অবয়ব সংযোগই জাতির ব্যঞ্জক হয়। এখন ঘটত্ব ও কলসত্বকে যদি দু'টি জাতি বলে স্বীকার করা হয়, তা হলে এই জাতিদ্বয়ের ব্যঞ্জক সংস্থানেরও ভেদ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ঘট ও কলস এক ও অভিন্ন হওয়ায় ব্যঞ্জক সংস্থানের ভেদ থাকে না। তাই ঘটত্ব ও কলসত্বকে ভিন্ন দু'টি জাতি বলা যায় না। সুতরাং তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব জাতিভেদের বাধক।

সঙ্করঃ যে দুটি ধর্ম পরস্পর একই অধিকরণে বর্তমান থেকে একে অপরের অভাবের অধিকরণেও বর্তমান থাকে, তা হলে সেই দুটি ধর্মকে জাতি বলা যাবে না। যেমনঃ ভূতত্ব ও মূর্তত্ব। 'ভূতত্ব' ধর্মটি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ - এই পাঁচটি ভূতদ্রব্যে বিদ্যমান। আর 'মূর্তত্ব' ধর্মটি পৃথিবী, তেজ, জল, তেজ, বায়ু ও মন - এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্যে বিদ্যমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'ভূতত্ব' নামক ধর্মটি মূর্তত্বের অধিকরণ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে যেমন থাকে, তেমনই মূর্তত্বের অভাবের অধিকরণ আকাশেও থাকে। আবার 'মূর্তত্ব' নামক ধর্মটি ভূতত্বের অধিকরণ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে যেমন থাকে, তদনুরূপ ভূতত্বের অভাবের অধিকরণ মনেও থাকে। কাজেই 'ভূতত্ব' ও 'মূর্তত্ব' - এই দুটির কোনটিকেই জাতি বলা যাবে না। তারা হল জাতির বাধক।

তবে কোন জাতি যদি পূর্ব হতে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তা হলে অপরটিকে আর জাতি বলা যায় না। যেমন - 'ইন্দ্রিয়ত্ব' ও 'পৃথিবীত্ব' এই দুটি ধর্ম একে অন্যের অভাবের অধিকরণে থাকে আবার সমানাধিকরণেও থাকে। যেমন - 'ইন্দ্রিয়ত্ব' চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বকে থাকে, আর 'পৃথিবীত্ব' থাকে ঘট, পট, প্রভৃতি বস্তু ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ত্বের অধিকরণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যেমন পৃথিবীত্ব থাকে, তদনুরূপ ইন্দ্রিয়ত্বের অভাবের অধিকরণ ঘট, পট প্রভৃতিতেও পৃথিবীত্ব থাকে। আবার পৃথিবীত্বের অধিকরণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যেমন ইন্দ্রিয়ত্ব থাকে, তদনুরূপ পৃথিবীত্বের অভাবের অধিকরণ চক্ষু, কর্ণ, রসনা, ত্বক প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়ত্ব থাকে। কাজেই উক্ত ধর্ম দুটি পরস্পরের সমানাধিকরণে বর্তমান থেকে একের অভাবের অধিকরণে অন্যটি থাকায় প্রদত্ত স্থলে সাঙ্কর্য দোষ ঘটেছে। তবে

গন্ধ নামক কার্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, তাকে জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয়, তা জাতিবাধক।

যদিও রঘুনাথ শিরোমণি 'ভূতত্ব' ও 'মূর্তত্ব' কে জাতিবাধক বলেন না। কারণ তাঁর মতে, মন ও আকাশ - এই দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হিসাবে স্বীকৃত নয়। ফলত 'ভূতত্ব' ও 'মূর্তত্ব' পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ হয় না। কাজেই এস্থলে সাঙ্কর্য্য দোষ হয় না।

অনবস্থাঃ অপ্রামাণিক আনন্ত্যের আপত্তির নাম অনবস্থা। এই অনবস্থা জাতির জাতিমতত্ত্বে বাধক। সমস্ত জাতিতে যদি পৃথক্ একটি জাতি স্বীকার করা হয় তা হলে অনবস্থা অনিবার্য। তবে একথা ঠিক যে, ঘটত্ব প্রভৃতি সমস্ত জাতিতে অন্য একটি জাতি স্বীকার করলে সে জাতি সংখ্যায় এক হওয়ায় তাতে আর অন্য কোন জাতি থাকতে পারে না বলে অনবস্থার সম্ভাবনা থাকে না, তথাপি সমস্ত জাতিনিষ্ঠ সেই জাতি এবং ঘটত্বাদি – এই উভয় জাতিতে আর একটি জাতি অনায়াসে স্বীকার করা যেতে পারে। পুনরায় ঐ তিনটি জাতিতে তথা ঘটত্বাদি সমস্ত জাতিতে বিদ্যমান একটি জাতি, ঘটত্ব জাতি এবং এই উভয়ে বিদ্যমান আর একটি জাতি – এই তিনটিতে আর একটি জাতি থাকতে পারে। এইভাবে ঐ চারটি জাতিতে আর একটি জাতি – এরূপে জাতি কল্পনার শেষ না থাকায় অনবস্থা দোষ অনিবার্য। তাই জাতিতে জাতি স্বীকার করা হয় না।

এখানে উল্লেখ্য যে অনবস্থামাত্রই দোষের হয় না। বীজ হতে অঙ্কুর, আবার অঙ্কুর হতে বীজের উৎপত্তি – এরূপ কার্যকারণধারার শেষ না থাকলেও এরূপ অনিবস্থা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় দোষের হয় না। কাজেই প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থা দোষের হয় না, কেবল অপ্রামাণিক অনবস্থাই দোষের হয়ে থাকে।

রূপহানিঃ 'রূপহানি' শব্দের অর্থ হল স্বরূপহানি। এই রূপহানি বিশেষ পদার্থে বিশেষত্বজাতি-স্বীকারে বাধক হয়। আমরা জানি দুটি সমানগুণধর্মবিশিষ্ট নিত্য-দ্রব্যের মধ্যে ভেদ নির্ধারণের জন্য বিশেষ পদার্থটি স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষরূপ পদার্থে কোন 'বিশেষত্ব' জাতি স্বীকৃত নয়। কারণ বিশেষত্বধর্মকে জাতিরূপে স্বীকার করলে বিশেষ বিশেষত্বরূপেই ভেদের অনুমাপক হবে। ফলে তার স্বতোব্যাবর্তকত্বরূপটি আর থাকবে না। কারণ, নিয়ম হল,

সামান্যের আশ্রয় সামান্যরূপেই ভেদের সাধক হয়। বিশেষ বিশেষত্ববিশিষ্ট হলে বিশেষান্তর হতে বিশেষের ভেদ বা ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হতে পারে না বলে সেই বিশেষ আর নিত্য দ্রব্যের ভেদের অনুমাপক হয় না। কারণ নিয়ম হল অব্যাবৃত্ত ধর্ম ব্যাবর্তক বা ভেদক হতে পারে না। ধর্মান্তরের দ্বারা বিশেষে বিশেষান্তর ভেদ সিদ্ধ হয় – এরূপ স্বীকার করলে সেই ধর্মান্তরের দ্বারাই পরমাণু প্রভৃতির ভেদ সিদ্ধ হতে পারে বলে অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকবে না। এই জন্য বিশেষকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলতে হয়। কিন্তু বিশেষত্ব জাতি বা সামান্য হলে বিশেষ জাতিমান হওয়ায় জাতিমদ্‌ভিন্ন সমবেতত্বরূপ বিশেষস্বরূপের হানি হয়। এই স্বরূপহানি বশতঃ অর্থাৎ বিশেষের স্বতব্যাবর্তকত্ব ও স্বতোব্যাবৃত্তরূপের হানিবশতঃ বিশেষত্বকে জাতি বলা যায় না।

অসম্বন্ধঃ 'অসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ হল সম্বন্ধের অভাব অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধের অভাব। এই অসম্বন্ধ সমবায় ও অভাবের জাতিমত্ত্বে বাধক। সম্বন্ধ হল সপ্রতিযোগিক পদার্থ। সুতরাং সম্বন্ধের একটি অনুযোগী ও একটি প্রতিযোগী থাকে। যে যে সম্বন্ধে থাকে, সে হয় সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং যাতে থাকে, সে হয় সেই সম্বন্ধের অনুযোগী। যেমন – 'রূপবান্ ঘটঃ' এস্থলে রূপ সমবায়-সম্বন্ধে ঘটে থাকায় সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় রূপ এবং অনুযোগী হয় ঘট। অনুরূপভাবে সমবায়ে ও অভাবে জাতি স্বীকার করলে সেই জাতি সমবায়ে এবং অভাবে অবশ্যই সমবায়-সম্বন্ধে থাকবে, যেহেতু জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ সমবায়। কিন্তু অনুযোগী সমবায় বা অভাবে সেই জাতি সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ সমবায়ের অনুযোগী বা প্রতিযোগী নয়, সেই পদার্থে কোন জাতি থাকে না। সমবায় ও অভাব পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে কেউ থাকে না, ফলে সমবায় ও অভাব পদার্থ সমবায়ের অনুযোগী হয় না। অনুরূপভাবে সমবায় ও অভাব পদার্থ সমবায়সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। ফলে সমবায় ও অভাব সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগীও হয় না। এভাবে অনুযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সমবায় ও অভাবপদার্থে সমবায় না থাকায় সমবায়ত্ব এবং অভাবত্বকে জাতি বলা যায় না।

বৌদ্ধসম্প্রদায় ব্যক্তি হতে ভিন্ন সামান্য নামক কোন পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, ‘এটি ঘট’, ‘এটি ঘট’ এরূপ যে অনুগত প্রতীতি, তার বিষয় ঘটত্বজাতিরূপ সামান্য নয়। অতদ্ব্যাবৃত্তির দ্বারাই আমাদের অনুগত প্রতীতির উপপত্তি হয়ে যায়। অভিপ্রায় এই যে, ঘট হতে ভিন্ন পটাদি যত পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থ হল ‘অতৎ’। ঘটে এই ‘অতৎ’ এর ভেদ অর্থাৎ যা ঘট হতে ভিন্ন তার ভেদ ঘটে রয়েছে। ঘট হতে ভিন্ন সমস্ত পদার্থের ঘটনিষ্ঠ যে ভেদ তা হল অতদব্যাবৃত্তি, এই অতদব্যাবৃত্তির দ্বারাই ঘটকে অন্য পদার্থ হতে ভিন্ন করে ‘এটি ঘট’, ‘এটি ঘট’ এরূপ প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে। কাজেই এর জন্য সামান্য নামক কোন পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নেই।

এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ বলেছেন, অনেক ব্যক্তিতে অনুগত এক ধর্মের প্রামাণিকতা যদি স্বীকার না করা হয়, তা হলে বিভিন্নকালিক বিসদৃশ বস্তুতে যে একাকার বুদ্ধি হয়, তা নিরালম্বন হয়ে যাবে। একাকার বুদ্ধির সঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করা যাবেনা। তাই অনেকবৃত্তি, এক, নিত্যধর্মরূপ সামান্যকে অবশ্যই কল্পনা করতে হবে।

এখন মনে হতে পারে, নৈয়ায়িকগণ যাকে সামান্য বলেছেন তাকেই তো বৌদ্ধগণ অপোহ অর্থাৎ অতদব্যাবৃত্তি বলেছেন। উভয়ের দ্বারাই তো আমাদের অনুগত প্রতীতি জন্মায়। এই উভয় কি এক ? এর উত্তরে বলা যায়- নৈয়ায়িকগণ সামান্যকে অন্য পদার্থ হতে ভিন্ন নিত্য-ভাব-পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ যাকে অতদব্যাবৃত্তি বলেছেন তা ভাবস্বরূপ নয়, অভাবস্বরূপ। ন্যায়-বৈশেষিকগণ যাকে অন্যোন্যাভাব বলেছেন বৌদ্ধগণ তাকেই ‘অপোহ’ বলেছেন। কাজেই অনুগত প্রতীতির ব্যাখ্যার জন্য অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত ‘সামান্য’ নামক পদার্থটিকে স্বীকার করতে হবে।

বিশেষ

বৈশেষিক-সম্মত পঞ্চম পদার্থ হল **বিশেষ**। ‘বিশেষ’ নামক পদার্থটি বৈশেষিকদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আচার্য্যগণ মনে করেন যে, ‘বিশেষ’ নামক পদার্থটিকে স্বীকার করার জন্যই কণাদদৃষ্ট এই শাস্ত্রের নাম ‘বৈশেষিক-দর্শন’ হয়েছে। শাস্ত্রে সাধারণত ‘বিশেষয়তি

ইতরেভ্যঃ ব্যাবর্তয়তি ইতি বিশেষঃ' অর্থাৎ যা এক বস্তু হতে অপর বস্তুকে ব্যাবৃত্ত করে এমন ভেদকধর্ম অর্থে 'বিশেষ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বৈশেষিক-সম্মত পঞ্চম পদার্থ যে বিশেষ; তা এমন সাধারণ ভেদকধর্ম নয়। অভিপ্রায় এই যে, ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম ঘট প্রভৃতিকে পটাদি হতে ব্যাবৃত্ত করে। কাজেই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্মও ভেদকধর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের বিশেষ বলা যায় না। কারণ বিশেষ হল এমন ভেদকধর্ম যা কখনও অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয় না। ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম ঘটাদি বস্তুতে বিদ্যমান থেকে ঘট প্রভৃতি বস্তুকে পটাদি হতে যেমন ব্যাবৃত্ত করে, তেমনি তা সমস্ত ঘটে বিদ্যমান থেকে 'অয়ং ঘটঃ', 'অয়ং ঘটঃ' - এরূপ অনুগতাকার প্রতীতিরও হেতু হয়ে থাকে। কিন্তু বৈশেষিক-সম্মত বিশেষ নামক পদার্থটি কেবল ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিরই জনক হয়ে থাকে।

মহর্ষি কণাদ বিশেষের আলোচনা প্রসঙ্গে *বৈশেষিকসূত্রে* বিশেষকে 'অন্ত্যবিশেষ' বলেছেন। মহর্ষি কণাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রশস্তপাদাচার্যও বিশেষের লক্ষণ প্রদান করেছেন এভাবে - 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যা বিশেষাঃ'[১৪৩]। অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ নামক ভেদকধর্মটি নিত্যদ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, নিত্যদ্রব্য ভিন্নে থাকে না। 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ' এই পদটির দ্বারা যদি 'বিশেষ নিত্যদ্রব্যে থাকে' এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় তা হলে গুণ, কর্ম, সামান্য প্রভৃতিতে বিশেষের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ গুণাদিও নিত্যদ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। তাই এস্থলে 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' বলতে 'নিত্যদ্রব্যেতরাবৃত্তিত্বে সতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্ব' কে বুঝতে হবে। তা হলে আর গুণাদিতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকবে না। কারণ গুণ প্রভৃতি যেমন নিত্যদ্রব্যে থাকে, তেমনই অনিত্য দ্রব্যেও বিদ্যমান। কাজেই বলতে হবে যা নিত্যদ্রব্যভিন্নে থাকে না, অথচ নিত্যদ্রব্যেই থাকে তাহল বিশেষ। কিন্তু এরূপ বললেও আত্মত্ব, মনস্ত্ব জাতিতে উক্ত বিশেষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থেকেই যায়। কারণ আত্মত্ব ও মনস্ত্ব জাতি দুটি নিত্যদ্রব্য তথা নিত্য-আত্মা ও নিত্য-মনে যথাক্রমে

---

[১৪৩] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা – ২৩০।

থাকে, নিত্যদ্রব্যভিন্ন অন্যত্র থাকে না। একইভাবে ঈশ্বরের-জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলিও কেবল নিত্য-পরমাত্মাতে থাকে অর্থাৎ নিত্যদ্রব্যেই থাকে, নিত্যদ্রব্যভিন্নে থাকে না। ফলত অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রশস্তপাদাচার্য্য 'অন্ত্যাঃ' এই পদের দ্বারাই বিশেষের লক্ষণ প্রদান করেছেন। আর বিশেষ কোথায় থাকে, তা বোঝানোর জন্যই 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ' এই অংশটি লক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'অন্তে বিশেষাণাং ব্যাবর্তকানাম্ অবসানে বর্তন্তে ইতি অন্ত্যাঃ' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ হল 'স্বতোব্যাবৃত্তঃ'। অর্থাৎ যা নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থেকে নিজ আশ্রয় নিত্যদ্রব্যটিকে সজাতীয় অন্য নিত্য দ্রব্য হতে পৃথক করে এবং অন্য নিত্য দ্রব্যে বিদ্যমান বিশেষ থেকেও নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে। তাই বিশেষ হল স্বতোব্যাবৃত্তবিশেষ। এই স্বতোব্যাবৃত্তত্বকেই বিশেষের লক্ষণ বলা হয়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে, বিশেষ নিত্য দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ায় বিশেষও নিত্য। আর নিত্যদ্রব্য অসংখ্য হওয়ায় বিশেষও অসংখ্য। এঁদের মতে, নিত্য দ্রব্যগুলির মধ্যে আকাশ, দিক, কাল সংখ্যায় একটি হওয়ায় এদের প্রত্যেকটিতে একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়। কিন্তু পরমাণু, মন, আত্মা একাধিক হওয়ায় প্রত্যেকটিতে একটি করে একাধিক বিশেষ স্বীকার করতে হবে। তবে একটি নিত্য দ্রব্যে একাধিক বিশেষ স্বীকার করা যায় না। কারণ একটি বিশেষের দ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি নির্বাহ হয়ে যাওয়ায় একটি নিত্য দ্রব্যে অন্য বিশেষ স্বীকার ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এই অভিপ্রায়েই ন্যায়কন্দলীকার বলেছেন - 'একেনৈব বিশেষেণ স্বাশ্রয়স্য ব্যাবৃত্তিসিদ্ধেরনেকবিশেষকল্পনাবৈয়র্থ্যাৎ'[১৪৪]। আবার একটি বিশেষ অনেক দ্রব্যে থাকে - এমনটাও বলা সঙ্গত হবে না। কারণ একটি বিশেষ অনেক দ্রব্যে অনুগত হলে সেই বিশেষটি সামান্যস্বরূপ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈশেষিকসম্মত বিশেষ পদার্থটি সামান্যস্বরূপ নয়। তা নিত্য দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান, কিন্তু অনেকানুগত নয়। তাই আচার্য্য উদয়ন কিরণাবলীতে বলেছেন - 'অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তিবুদ্ধেরেব হেতুত্বাদ্ বিশেষা এব বিশেষা

---

[১৪৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৪৭।

নান্যত্রান্তর্ভূতা'[১৪৫] অর্থাৎ বিশেষ নামক পদার্থটি অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির হেতু হয়, অনুগত বুদ্ধির হেতু হয় না।

এখন প্রশ্ন হল, বিশেষ নামক স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকারের যুক্তি কি? আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ঘট-পটাদি বস্তু যে ভিন্ন তা আমরা বুঝতে পারি, কারণ ঘটত্ব নামক ধর্মটি ঘটেই থাকে, পটে থাকে না; আবার পটত্ব নামক ধর্মটি পটেই থাকে, তা ঘটে থাকে না। কাজেই এস্থলে ঘট, পটাদি বস্তুর ভেদকধর্ম ঘটত্ব, পটত্বাদি জাতিসমূহ। অনুরূপভাবে দুটি ঘট যে ভিন্ন তার হেতু হল, একটি ঘটের যা অবয়ব তা অন্য-ঘটটির অবয়ব হয় না। কাজেই অবয়বের-ভেদ হল প্রদত্তস্থলে ঘট দু'টির ভেদের অনুমাপক। কাজেই যাবতীয় অনিত্য বস্তুসমূহের ভেদ তাদের জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু একটা ঘটকে বিভক্ত করতে করতে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে যে অবিভাজ্য নিরবয়ব পরমাণুসমূহ পাওয়া যায়, তাদের পরস্পরের ভেদের অনুমাপক কে হবে? পরমাণু নিরবয়ব, তাই অবয়বের ভেদ দ্বারা পরমাণুসমূহের ভেদ নিরূপিত হতে পারে না। যদিও একটি পার্থিব পরমাণু ও একটি জলীয় পরমাণুর যে ভেদ, তা তাদের গুণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় দুটি পার্থিব কিংবা দুটি জলীয় কিংবা দুটি তৈজস পরমাণুর যে ভেদ তা কীভাবে নির্ধারিত হবে? সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় দুটি পরমাণুর ভেদ তাদের গুণ, জাতি, প্রভৃতির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে না। কারণ সজাতীয় নানা পরমাণুগত জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত পরমাণুতে সাধারণ হওয়ায়, ঐগুলি সজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের ভেদের নিরূপক হতে পারে না। কিন্তু দুটি পার্থিব পরমাণু, কিংবা দুটি জলীয় পরমাণু যে পরস্পর হতে পৃথক - এ বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করবেন। শুধু তাই নয়, আমাদের মত সসীম-জীবের পক্ষে অতীন্দ্রিয়-পরমাণুসমূহের ভেদ-প্রত্যক্ষ সম্ভব না হলেও, যিনি যোগিপুরুষ তিনি তাঁর যোগজ শক্তির দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহের ভেদ-প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এখন প্রত্যক্ষলব্ধ সজাতীয় পরমাণুসমূহের ভেদের

---

[১৪৫] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ২৪১।

অনুমাপক-ধর্ম কে হবে? সেই ভেদকধর্ম কোন দ্রব্য হতে পারে না। কারণ নিত্যদ্রব্যের কোন অবয়ব-দ্রব্য নেই। গুণও এস্থলে ভেদকধর্ম হতে পারবে না। যেহেতু গুণ বিজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হতে পারে, কিন্তু সজাতীয়-নিত্য-পরমাণুসমূহের ভেদ গুণের দ্বারা নিরূপিত হতে পারবে না। কর্মও সজাতীয়-নিত্য-পরমাণুসমূহের ভেদক হতে পারে না। কারণ নিত্য-পরমাণুতে কর্ম থাকে না। সামান্য বা জাতিকেও এস্থলে ভেদক বলা যাবে না। কারণ জাতি বিজাতীয়-পরমাণুসমূহের ভেদক হলেও সজাতীয়-পরমাণুসমূহের ভেদক হতে পারে না। সমবায় কিংবা অভাবকেও এস্থলে ভেদকধর্ম বলা যাবে না। কারণ সমবায় সকল পরমাণুর সাধারণধর্ম হয়ে থাকে। আর অভাবকেও এস্থলে ব্যাবর্তকধর্ম বলা যাবে না, কারণ অভাব কখনও ভাব-পদার্থের ভেদকধর্ম হতে পারে না; সেক্ষেত্রে ব্যভিচার ঘটবে। কাজেই দুটি সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয়-নিত্য-পরমাণুর ভেদসাধকরূপে দ্রব্যাদি অতিরিক্ত একটি পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আর তাকেই বৈশেষিকাচার্য্যগণ 'বিশেষ' নামে অভিহিত করেছেন। এস্থলে এমন বলা সঙ্গত হবে না, যে যোগজ ধর্মের দ্বারা যোগিপুরুষ অতীন্দ্রিয় নিত্য পরমাণুসমূহের ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন, সেই যোগজধর্মটাই এস্থলে ব্যাবর্তকধর্ম হোক। এর উত্তরে বলা যায়, বিশেষ স্বীকার করার পূর্বে পরমাণু প্রভৃতিতে কোন ভেদকধর্ম না থাকায় পরমাণু প্রভৃতি পরস্পর ভেদরহিত হয়। আর ভেদরহিত বস্তুতে যোগজ-ধর্মের দ্বারা ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হলে, যোগিগণের সেই ভেদজ্ঞান অবশ্যই মিথ্যা হবে। সুতরাং যোগজ-ধর্ম নয়, বিশেষই পরমাণু প্রভৃতিতে ভেদজ্ঞান জন্মাতে সক্ষম।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বৈশেষিকমতে সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় পরমাণুসমূহের পারস্পরিক ভেদের জন্য বিশেষ নামক অতিরিক্ত একটি পদার্থ অবশ্যস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, বৈশেষিকমতে সংসারে আবদ্ধ অমুক্ত আত্মাসমূহের পরস্পরের ভেদ তাদের ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলির দ্বারা নির্ধারিত হলেও মুক্ত যে আত্মাসমূহ, তাদের পরস্পরের ভেদ-নিরূপণের নিমিত্ত 'বিশেষ' নামক পদার্থটিকে স্বীকার করতে হবে। কারণ মুক্ত আত্মাগুলিতে সমান গুণ, ধর্ম বিদ্যমান। একইভাবে ন্যায় বৈশেষে সম্মত মন অসংখ্য হলেও সমানগুণধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় মনসমূহের পরস্পরের ভেদ নিরূপনের জন্য

'বিশেষ' নামক পদার্থকে স্বীকার করা হয়েছে। বৈশেষিকমতে নিত্য-দ্রব্যসমূহ তথা পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, দিক, কাল আত্মা এবং মন এই দ্রব্যগুলি হল বিশেষের আশ্রয়। এখন আপত্তি হতে পারে আকাশ, দিক ও কাল সংখ্যায় এক। তাদের কোন সজাতীয় দ্রব্য নেই, তথাপি বৈশাষিকচার্যগণ কেন আকাশাদিতে বিশেষ স্বীকার করেছেন? এর উত্তরে বলা যায় কাল ও দিক সংখ্যায় এক, তাছাড়া কাল ও দিকে কোন বিশেষ গুণ নেই। সত্তা, দ্রব্যত্ব এই দুটি জাতি এবং সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি সামান্যগুণ তুল্যভাবে কাল ও দিকে বিদ্যমান। তা হলে কাল ও দিকের ভেদসিদ্ধ হবে কীভাবে? সত্তাদি জাতি কিংবা সংখ্যা প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা কাল ও দিকের ভেদ সিদ্ধ হতে পারে না। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ কাল ও দিকের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত কাল ও দিকে দুটি বিশেষ স্বীকার করেছেন। পুনরায় আপত্তি হতে পারে, শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ। কাজেই শব্দ নামক বিশেষ গুণটির দ্বারাই তো আকাশ যে অন্যান্য দ্রব্য হতে পৃথক তা নির্ধারিত হয়ে যায়। তার জন্য অতিরিক্ত বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? এর উত্তরে বলা যায়, অন্যান্য দ্রব্য হতে আকাশকে পৃথক করার জন্য বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা না থাকলেও শব্দ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে বিশেষ পদার্থটিকে স্বীকার করতে হয়। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ হল আকাশের গুণ। আকাশে শব্দ সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কাজেই আকাশ হল শব্দের সমবায়িকারণ। ফলত আকাশে রয়েছে শব্দের সমবায়িকারণতা। এখন নিয়ম আছে, সমবায়িকারণতা কিঞ্চিৎ ধর্মাবচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কাজেই আকাশে রয়েছে যে শব্দ-সমবায়ীকারণতা তা কিঞ্চিৎ ধর্মাবচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু শব্দ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্মটি কে হবে? আকাশ এক হওয়ায় আকাশে আকাশত্ব জাতি স্বীকৃত হয়নি। তাছাড়া আকাশে রয়েছে যে একত্ব সংখ্যা, পরমমহত্ত্বপরিমাণ এবং একপৃথক্ত্ব - এই তিনটি গুণ আকাশে বিদ্যমান থাকলেও এই তিনটি গুণের মধ্যে কে শব্দ-সমবায়িকারণতার-অবচ্ছেদক হবে সেই বিষয়ে বিনিগমনা না থাকায় তিনটিকে অবচ্ছেদক বলতে হবে, কিন্তু তাতে গৌরব দোষ অনিবার্য। তাই লাঘববশত শব্দ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক রূপে আকাশে বিশেষ পদার্থটি স্বীকৃত হয়েছে।

বৈশেষিকমতে যোগিগগণ যোগজশক্তি বলে প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে বিশেষ প্রত্যক্ষ করে থাকেন, কিন্তু আমাদের মত অসীম জীব প্রত্যক্ষের দ্বারা বিশেষকে জানতে সক্ষম হয় না। তাই তারা দুটি দ্রব্যের ভেদসিদ্ধির নিয়ামকরূপে কিংবা শব্দ-সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে বিশেষ পদার্থটিকে অনুমান করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, দুটি নিত্য দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধির নিয়ামক রূপে যদি বিশেষ পদার্থটি স্বীকৃত হয়, তা হলে দুটি নিত্য দ্রব্যে স্থিত দুটি বিশেষের ভেদসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য একটি ব্যাবর্তকধর্ম স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৈশেষিকমতে প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষের মধ্যে ভেদ সাধনের জন্য ভেদক হিসাবে অন্য বিশেষের কল্পনা করা যায় না, কারণ সে ক্ষেত্রে অনবস্থা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অভিপ্রায় এই যে, দুটি নিত্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষের ভেদ নির্বাহের জন্য যদি অন্য একটি ভেদকধর্ম স্বীকার করা হয়, আবার ঐ ভেদকধর্মটির সাথে অন্য ভেদক ধর্মের ভেদ নির্বাহের জন্য অন্য আরেকটি ভেদকধর্ম স্বীকার করা হয়, তা হলে এভাবে চলতে থাকলে অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। ফলত অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। তাই বৈশেষিকমতে বিশেষ হলো স্বতঃব্যাবর্তকধর্ম, তা যেমন নিত্য দ্রব্যে বৃত্তি হয়ে অন্যান্য নিত্য দ্রব্য হতে তার আশ্রয় দ্রব্যটিকে ব্যাবৃত্ত করে, তদনুরূপ অন্য নিত্য-দ্রব্যসমূহে স্থিত বিশেষ হতেও নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে। তাই প্রশস্তপাদাচার্য প্রমুখ বিশেষকে ‘অন্ত্যবিশেষ’ বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে দুটি সজাতীয় পরমাণুর মধ্যে ভেদ সাধক রূপে যদি দুটি পরমাণুতে দুটি বিশেষ স্বীকার করা হয়ে থাকে, তা হলে দুটি নিত্য পরমাণুতে স্থিত দুটি বিশেষের ভেদসাধকরূপে কেন অন্য আরেকটি বিশেষ স্বীকৃত হবে না? অনবস্থা ভয়ে যদি বিশেষসমূহকে স্বতঃব্যবর্তক বলা হয়, তা হলে পরমাণুসমূহকে স্বতঃব্যাবর্তক বললেই হয়। তাহলে বিশেষ স্বীকারের আর আবশক্যতা থাকে না। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করেছেন - অপ্রকাশস্বরূপ ঘট-পটাদির প্রকাশের নিমিত্ত প্রদীপের প্রয়োজন হয়ে থাকে, কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ প্রদীপ নিজেকে প্রকাশিত করতে কি অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে? অনুরূপভাবে অবিশেষস্বরূপ-পরমাণু প্রভৃতি সজাতীয় নিত্য-দ্রব্যসমূহের পরস্পরের ভেদসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ নামক পদার্থান্তরের

আবশ্যকতা থাকলেও, বিশেষ নামক পদার্থটি স্বয়ং বিশেষস্বরূপ হওয়ায়, তাদের পরস্পরের ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত বিশেষান্তরের স্বীকৃতি অনাবশ্যক। গঙ্গাজল অশুদ্ধ অপরাপর বস্তুকে শুদ্ধ করে কিন্তু শুদ্ধস্বভাব গঙ্গাজলকে শুদ্ধ করার জন্য অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। তা স্বতঃই শুদ্ধ স্বভাব হয়ে থাকে। কাজেই দুটি বিশেষের মধ্যে ভেদ সিদ্ধির জন্য বিশেষান্তর অপেক্ষিত নয়, তা নিজেই নিজের ব্যবর্তক অর্থাৎ অন্য বিশেষ হতে তা নিজেই নিজেকে ব্যাবৃত্ত করে, তার জন্য অন্য বিশেষ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এখন এমন বলা সঙ্গত হবে না যে, দুটি সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় নিত্যপরমাণুর মধ্যে ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ স্বীকার না করে পরমাণু সমূহকে স্বতঃব্যবর্তক বলা যেতে পারে – এমনটা বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকমতে জাতিমান-পদার্থ কখনও ব্যাবর্তক-স্বভাববিশিষ্ট হতে পারে না। নিত্যদ্রব্যগুলি সত্তা এবং দ্রব্যত্ব-জাতির আশ্রয় হওয়ায়, এগুলি ব্যাবর্তক স্বভাববিশিষ্ট নয়। কিন্তু বিশেষ নামক পদার্থটি জাতিমান নয়, তাই তা স্বতঃব্যাবর্তক হতে পারে।

বৈশেষিকমতে বিশেষে কোনরূপ জাতি স্বীকৃত নয়। তা হলে আপত্তি হতে পারে, প্রতিটি 'গো' ব্যাক্তিতে যেমন 'এটি গরু', 'এটি গরু' এরূপ অনুগত ব্যবহার হয়ে থাকে, তদনুরূপ প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষে 'এটি বিশেষ', 'এটি বিশেষ' এরূপ অনুগত প্রতীতি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের না হলেও, যোগিগণের হয়ে থাকে। কাজেই উক্ত অনুগত প্রতীতির হেতুরূপে বিশেষ-এ 'বিশেষত্ব' জাতি স্বীকার করা হোক। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন, প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষে 'এটি বিশেষ', 'এটি বিশেষ' এরূপ যে অনুগত প্রতীতি যোগিগণের হয়ে থাকে, তা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তার জন্য বিশেষত্বকে জাতি বলা ঠিক হবে না। প্রদত্ত স্থলে উপাধিবশত উক্তরূপ অনুগত প্রতীতি হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষের অনুগত-প্রতীতির হেতুরূপে যদি বিশেষত্বকে জাতি বলা হয়, তা হলে বিশেষের যে স্বতঃব্যাবর্তকত্বস্বরূপ তার হানি ঘটবে। কারণ জাতিমান পদার্থ কখনও স্বতঃব্যাবর্তক হতে পারে না। কারণ যে দ্রব্যটি জাতিমান হয়, জাতির দ্বারাই তা অন্যান্য দ্রব্য হতে বাবৃত্ত হয়। ফলত তা আর স্বতঃব্যাবর্তক হতে পারে না। তাই বৈশেষিকমতে বিশেষে কোন রূপ জাতি স্বীকৃত নয়। এই হেতু প্রকাশকার

বিশেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'নিঃসামান্যতে সতি একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্বম্'[১৪৬] অর্থাৎ যা নিঃসামান্য হয়ে থাকে এবং একটি মাত্র দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়, তা হল বিশেষ। শিবাদিত্য মিশ্র তাঁর '*সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে একই বক্তব্য ব্যক্ত করতে বলেছেন – 'বিশেষস্তু সামান্যরহিত একব্যক্তিবৃত্তিঃ'[১৪৭] অর্থাৎ বিশেষ হল সামান্যরহিত অর্থাৎ জাতির অনধিকরণ এবং একব্যক্তিবৃত্তি পদার্থ।

এখানেও অনেকেই আপত্তি করে বলতে পারেন - বৈশেষিকচার্যগণ যে চব্বিশ-প্রকার গুণ স্বীকার করেছেন তার মধ্যে একটি হলো পৃথক্ত্ব। এই পৃথক্ত্বের দ্বারাই তো দুটি নিত্য দ্রব্যের ভেদ নির্ধারিত হতে পারে। তাছাড়া অন্যোন্যাভাবের দ্বারাও তো 'এই নিত্যপরমাণুটি ঐ পরমাণু নয়' - এরূপ প্রতীতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুটি স্বজাতীয় নিত্য দ্রব্যের ভেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ নামক স্বতন্ত্র একটি পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? এর উত্তরে বলা যায় বৈধর্ম সিদ্ধ না হলে দুটি পদার্থের অনোন্যাভাব কিংবা পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ দুটি পদার্থ যে ভিন্ন এমন জ্ঞান না থাকলে 'এটি ওটি নয়', কিংবা 'সেটি ওটি হতে পৃথক' এমন প্রতীতি হতে পারে না। এখন দুটি সজাতীয় নিত্য দ্রব্য যে পৃথক, তা সিদ্ধ করতে হলে বিশেষ নামে পদার্থকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

যদিও নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিক-স্বীকৃত বিশেষ নামক পদার্থটিকে স্বীকারই করেন না। প্রাচীন আচার্যগণের মতে যদিও নিত্যদ্রব্যগত বিশেষ আমাদের মত সসীম জীবের প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, তথাপি যোগিগণ নিত্য পরমাণু আকাশ প্রভৃতির ন্যায় তদ্গত বিশেষ পদার্থকেও প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কাজেই যা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তার অপলাপ সম্ভব নয়। রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীন আচার্যগণের এরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছেন - যোগীর প্রত্যক্ষ যদি বিশেষের সাধন হয়, তা হলে শপথপূর্বক যোগীগণকে জিজ্ঞাসা করা হোক তাঁরা আদৌ দ্রব্য ইত্যাদি পাঁচটি ভাবপদার্থ অতিরিক্ত বিশেষ নামক

---

[১৪৬] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৪৩।

[১৪৭] ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৬৪।

পদার্থটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা – 'এবং তর্হি ত এব সশপথং পৃচ্ছ্যন্তাং কিমেতেঽতিরিক্তং বিশেষমীক্ষন্তে ন বেতি'[১৪৮]।

সমবায়

বৈশেষিকসম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষষ্ঠ পদার্থ হল **সমবায়**। সমবায় হল একপ্রকার সম্বন্ধবিশেষ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দু'টি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল সমবায়। অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান, জাতি-ব্যক্তি এবং বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য - এই পদার্থযুগলগুলিকে বৈশেষিকদর্শনে অযুতসিদ্ধ বলা হয়েছে। যে দু'টি পদার্থের মধ্যে একটি অবিনশ্যদ্ অবস্থায় অর্থাৎ নিজের বিনাশকারণের অসন্নিধানকালে অপরাশ্রিত হয়েই থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না, সেই অবস্থায় সেই দু'টি পদার্থকে অযুতসিদ্ধ বলা হয়। মূলকথা হল, যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটির বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত একটি অপরটিকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। যেমন, দ্রব্য ও গুণ, বস্ত্র ও তার রূপ। বস্ত্রে রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কাজেই বস্ত্র হলো আধার, আর রূপ হলো আধেয়। বস্ত্র রূপকে ছাড়া থাকতে পারলেও রূপ বস্ত্রকে ছেড়ে কখনও থাকতে পারে না। বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত বস্ত্রের-রূপ বস্ত্রকে আশ্রয় করেই থাকে। তাই বস্ত্র ও তার রূপ - এই দুটি পদার্থ হল অযুতসিদ্ধ। উদয়নাচার্য বলেছেন – 'অযুতাঃ প্রাপ্তাশ্চ সিদ্ধা ইতি অযুতসিদ্ধাঃ'[১৪৯]। অভিপ্রায় এই যে, যারা অযুত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়েই সিদ্ধ তারা হল অযুতসিদ্ধ। অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় প্রাপ্ত হয়েই থাকে, অপ্রাপ্ত হয়ে থাকে না। আর আধার আধেয় ভাবাপন্ন এরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে আচার্যগণ সমবায় বলেছেন।

---

[১৪৮] ভট্টাচার্য, মধুসূদন (অনুদিত), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্*, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা – ২০।

[১৪৯] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ২৪৯।

মহর্ষি কণাদ সমবায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে *বৈশেষিকসূত্রে* বলেছেন, 'ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ'[১৫০] অর্থাৎ কার্য ও কারণ এর মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এরূপ জ্ঞানে যে সম্বন্ধ বিষয় হয় তা হল সমবায়। যদিও শঙ্কর মিশ্র তাঁর *উপস্কার টীকাতে* বলেছেন মহর্ষি প্রদত্ত লক্ষণে 'কার্যকারণয়োঃ' পদটি উপলক্ষণ – 'কার্য্যকারণয়োরিত্যুপলক্ষণম্, অকার্য্যকারণয়োরিত্যপি দ্রষ্টব্যং'[১৫১]। ফলত তা কার্যকারণকে বুঝিয়ে তদতিরিক্ত অকার্য ও অকারণকেও বোঝায়। তা না হলে অনিত্যদ্রব্য-অনিত্যগুণ, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, অবয়ব -অবয়বী - এদের মধ্যে কার্যকারণভাব থাকলেও দ্রব্য-জাতি, গুণ-জাতি, কর্ম-জাতি, নিত্যদ্রব্য-নিত্যগুণ, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ - এই সকল পদার্থযুগলের মধ্যে কার্যকারণ ভাব নেই কিন্তু এদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত। মূলকথা হল, দুটি অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ দুটি পদার্থের মধ্যে একটি যদি অন্যটিকে ছেড়ে না থাকতে পারে, এমন দুটি পদার্থের মধ্যেকার সম্বন্ধ হল সমবায়। যেমন- অবয়ব-অবয়বী, অবয়বী কখনও তার অবয়বকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই এই দু'য়ের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত।

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ সমবায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অযুতসিদ্ধানামাধার্যধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ-প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ'[১৫২] অর্থাৎ আধার-আধেয় স্বরূপ অযুতসিদ্ধ-পদার্থগুলির 'ইহপ্রত্যয়' তথা 'এই আধারে এই আধেয় আছে' - এই প্রকার জ্ঞানের কারণীভূত যে সম্বন্ধ তা হল সমবায়। ন্যায়কন্দলীকার প্রশস্তপাদাচার্যপ্রদত্ত সমবায় লক্ষণের প্রতিটি পদ-ব্যাবৃত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, ভাষ্যকার প্রদত্ত লক্ষণের অন্তর্গত 'অযুতসিদ্ধানাম্' এই পদটিকে যদি লক্ষণের সন্নিবিষ্ট না করা হতো এবং আধারে-আধেয়ভূত যে সম্বন্ধ 'ইহ-প্রত্যয় হেতু' হয় তাকে সমবায় বলা হত; তা হলে 'এই হাঁড়িতে আম আছে' এরূপ জ্ঞানের বিষয় যে হাঁড়ি ও আমের সংযোগ, তাতে প্রদত্ত সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কারণ এস্থলে হাঁড়ি হল আধার, আম হল আধেয় এবং 'এই হাঁড়িতে আম আছে' এরূপ প্রত্যয়ের হেতু

---

[১৫০] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৩৯৫।

[১৫১] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৯৫।

[১৫২] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা – ২৫২।

হল সংযোগ। কাজেই অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই সমবায়ের লক্ষণে 'অযুতসিদ্ধানাম্' এই পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হাঁড়ি ও আমের সংযোগ আধার-আধেয়ভূত 'ইহ প্রত্যয় হেতু' হলেও তারা অযুক্তসিদ্ধ পদার্থ নয়। কারণ হাঁড়ি এবং আম পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করে ভিন্ন আশ্রয়েও অবস্থান করতে পারে। তাই এরা হলো যুতসিদ্ধ পদার্থ। আর এরূপ যুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সমবায় হতে পারে না। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। এখন যদি কেবল অযুতসিদ্ধের সমবন্ধকেই সমবায় বলা হয় অর্থাৎ 'আধার-আধেয়ভূতানাম' এই অংশটুকু লক্ষণে প্রযুক্ত না হয় তা হলে সুখ বা দুঃখ এবং ধর্ম বা ধর্মের মধ্যে যে কার্য-কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, তাতে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। তাৎপর্য এই যে সুখের কারণ হলো ধর্ম, আর দুঃখের কারণ হলো অধর্ম। এই সুখ বা দুঃখ আত্মাতে থাকে, আবার সুখ বা দুঃখের কারণ যে ধর্ম এবং অধর্ম তাও আত্মাতে আশ্রিত। ফলত সুখ এবং সুখের কারণ ধর্ম, আর দুঃখ এবং দুঃখের কারণ অধর্ম, পরস্পর পরস্পরের ভিন্ন আশ্রয়ে থাকে না। ফলত তারা অযুতসিদ্ধ পদার্থ হল। আর তাদের মধ্যে যে কার্য-কারণভাবসম্বন্ধ, তা অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধ হল। ফলত অতিব্যাপ্তি অবশম্ভাবী। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সমবায়ের লক্ষণে 'আধার্যাধারভূতানাম্' অংশটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুখ এবং তার কারণ ধর্ম, এবং দুঃখ এবং তার কারণ যে অধর্ম, তারা পরস্পর পরস্পরের ভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিত না হলেও তারা আধার আধেয়স্বরূপ নয়। সুখ কিংবা দুঃখ, ধর্ম কিংবা অধর্মের আধার নয়। আবার ধর্ম কিংবা অধর্ম, সুখ কিংবা দুঃখের আধার হয় না। ফলত অতিবব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এখন যদি লক্ষণে 'ইহ প্রত্যয়হেতুঃ' অর্থাৎ 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এই অংশটুকু লক্ষণে সন্নিবিষ্ট না হত এবং 'আধার্যাধারভূতানাম্ অযুতসিদ্ধানাং সম্বন্ধঃ' অর্থাৎ আধার-আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধদ্বয়ের সম্বন্ধকেই সমবায় বলা হতো, তা হলে আকাশ এবং আকাশশব্দের মধ্যে যে বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধ, তাতে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। কারণ আকাশ নিত্যদ্রব্য তাই তার কোন আশ্রয় নেই, আর শব্দ মাত্রই আকাশ রূপ আধারে আশ্রিত। ফলত আকাশ ও আকাশশব্দ পরস্পর ভিন্ন আশ্রয়ে থাকে না, ফলত তারা আধার-আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ

দুটি পদার্থ। কাজেই এস্থলে এদের মধ্যেকার বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধকে সমবায় বলতে হবে। ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'ইহ প্রত্যয়হেতুঃ' এই অংশটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কারণ আকাশ ও আকাশশব্দের মধ্যে বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধ। আকাশশব্দটি হল বাচক আর আকাশ তার বাচ্য। কিন্তু এই বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধ থেকে 'এই আকাশে এই আকাশশব্দ আছে' এরূপ জ্ঞান কারও হয় না; অর্থাৎ এখানে 'ইহ' তথা 'আকাশে আকাশশব্দ আছে' এরূপ জ্ঞান আমাদের হয় না। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয়। একইভাবে লক্ষণে যদি 'সম্বন্ধ' এই শব্দটি কে প্রযুক্ত করা না হয়, তা হলে 'তন্তুতে পট' এরূপ জ্ঞানের হেতু যে তন্তু এবং পট তাতে প্রদত্ত সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। কারণ 'এইখানে এটি' এরূপ জ্ঞানের হেতু যেমন সম্বন্ধটি হয়, তদনুরূপ সম্বন্ধীদ্বয়ের অন্যতরও হেতু হয়। ফলত সম্বন্ধিদ্বয়ে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। এই হেতু লক্ষণে 'সম্বন্ধ' পদটিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং প্রশস্তপাদাচার্যেরমতে আধার-আধেয়ভাবভূত দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে 'এটিতে এটি আছে' এরূপ প্রত্যয়ের হেতু যে সম্বন্ধ তাকেই সমবায় বলা হয়েছে। আচার্য উদয়ন সমবায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'নিত্যপ্রাপ্তিঃ সমবায়ঃ'[১৫৩]। অর্থাৎ যে সম্বন্ধটি আধার-আধেয়ভাবের নিয়ামক এবং নিত্য তাকেই সমবায় বলা হয়েছে। নিত্য বলাতে সমবায় যে সংযোগ হতে ভিন্ন তা বোঝা যায়। যেমন – বৃক্ষে কপি-সংযোগ। এস্থলে বৃক্ষ হল আধার আর কপি তথা বানর হল আধেয়। আর এদের সম্বন্ধ হল সংযোগ। কাজেই প্রাপ্তি-সম্বন্ধকে সমবায় বললে সংযোগে অতিব্যাপ্তি হবে। কিন্তু নিত্য বলাতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূরীভূত হয়। সংযোগসম্বন্ধ ক্ষেত্র-বিশেষে আধার-আধেয়ভাবাপন্ন হলেও তা নিত্য নয়। আবার প্রাপ্তি অর্থাৎ আধার-আধেয়ভাবের নিয়ামক বলাতে পদ ও পদার্থের মধ্যে যে বাচ্য-বাচকভাবসম্বন্ধ, তা হতে সমবায় যে পৃথক তা বোঝা যায়। কারণ পদ-পদার্থের সম্বন্ধ

[১৫৩] শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ২৪৯।

ঈশ্বরেচ্ছাস্বরূপ হওয়ায় নিত্য, কিন্তু আধার-আধেয়ভাবের নিয়ামক না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

বৈশাষিক মতে সমবায় নিত্য এবং এক। তাঁরা মনে করেন 'ইহ তন্তুষু পটঃ', 'ইহ ঘটে রূপম্' প্রভৃতি প্রতীতিস্থলে 'এই আধারে এই আধেয়' এরূপ সার্বকালিক প্রত্যয় আমাদের সর্বত্রই হয়ে থাকে। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে সমবায় নিত্য। কারণ সমবায় নিত্য না হলে এরূপ সর্বকালিক প্রত্যয় সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, সমবায় যদি অনিত্য হত অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল তথা কার্য হত, তা হলে তার একটা সমবায়িকারণ অবশ্যই স্বীকার করতে হত। যেহেতু ভাবকার্য মাত্রেরই উৎপত্তিতে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত - এই ত্রিবিধ কারণ অপেক্ষিত হয়। কিন্তু সমবায়ের সমবায়িকারণ কি হবে? সমবায়ের কোন সম্বন্ধী এই সমবায়িকারণ হতে পারবে না। যেহেতু কার্য তার সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়। কিন্তু সমবায় তার সম্বন্ধী তথা অনুযোগী কিংবা প্রতিযোগীতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ ঘটবে। ধরা যাক, তন্তুতে পটের যে সমবায় তা যদি প্রতিযোগী তন্তুতে কিংবা অনুযোগী পটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তা হলে ওই সমবায়টি তার প্রতিযোগী কিংবা অনুযোগীতে, আবার অন্য আরেকটি সমবায় সম্বন্ধে থাকবে, এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সমবায়ের কোন সমবায়ি কারণ হয় না। ফলত স্বীকার করতে হয় তা অনিত্য নয়। তাছাড়া গুণে যে গুণত্বজাতি কিংবা কর্মে যে কর্মত্বজাতি বিদ্যমান তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হল সমবায়। এস্থলে সমবায়ের কোন সমবায়িকারণ হয় না, তা পরিস্কৃত। কারণ আমরা জানি দ্রব্য ছাড়া অন্য কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না, কিন্তু সমবায়ের আশ্রয় যেমন দ্রব্য হয় তেমনি গুণ, কর্ম প্রভৃতিও হয়ে থাকে। কাজেই গুণ এবং গুণত্ব, কিংবা কর্ম এবং কর্মত্ব এদের মধ্যে যে সমবায়, তার কোন সমবায়িকারণ হতে পারে না। আর সমবায়িকারণ না থাকলে কোন পদার্থকে উৎপন্ন কিংবা বিনষ্ট এমনও বলা সঙ্গত হবে না। কাজেই সমবায়

হলো নিত্যসম্বন্ধ। মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে- 'সমবায়ত্বং নিত্য-সম্বন্ধত্বম্'[১৫৪]। এখন মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে, সমবায় যদি তার অনুযোগী ও প্রতিযোগীতে সমবায়সম্বন্ধে না থাকে, তা হলে কি সম্বন্ধে থাকবে? এর উত্তরে আচার্যগণ বলেন স্বরূপসম্বন্ধে সমবায় তার সম্বন্ধীতে বিদ্যমান থাকে। কারণ সমবায় যে সম্বন্ধে তার সম্বন্ধীতে থাকে তা সংযোগ হতে পারবে না, যেহেতু সংযোগ একটি গুণপদার্থ। তাই তা কেবলমাত্র দ্রব্যেই আশ্রিত থাকে। কিন্তু সমবায় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষে থাকে। তাছাড়া গুণ প্রভৃতি নির্গুণ হয়ে থাকে কাজেই সমবায় গুণ প্রভৃতিতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না। সমবায় তার সম্বন্ধীতে সমবায়সম্বন্ধেও থাকতে পারে না। কারণ সমবায় হল এক। আমরা জানি যখন কোন বস্তু কোন আশ্রয়ে থাকে, তখন সেটি তা হতে ভিন্ন কোন সম্বন্ধে থাকে। যেমন- 'গোয়ালে গরু যখন থাকে, তখন গরুটি তা হতে ভিন্ন সংযোগ সম্বন্ধেই গোয়ালেই থাকে। কাজেই সমবায় যদি তার সমন্ধী তথা অনুযোগী এবং প্রতিযোগিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, তা হলে তা নিশ্চয়ই তা হতে ভিন্ন কোন সমবায়সম্বন্ধে থাকবে - এমনটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৈশেষিকমতে সমবায় হল এক। কাজেই এটা প্রমাণিত হয় যে, সমবায় তার সম্বন্ধীতে সমবায় সম্বন্ধেও থাকতে পারবে না। আবার সমবায় তার প্রতিযোগী অ অনুযোগী হতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায়, তা তাদাত্ম্যসম্বন্ধেও থাকতে পারবে না। আর কালিক সম্বন্ধে সমস্ত বস্তু কালে থাকে। তাই কালিক সম্বন্ধেও সমবায় তার সম্বন্ধীতে থাকতে পারে না। কাজেই স্বীকার করতে হয়, সমবায় তার নিজ স্বরূপেই সম্বন্ধীতে থাকে।

প্রাভাকরগণ নিত্য ও অনিত্য ভেদে সমবায়কে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের মতে নিত্য পদার্থদ্বয়ের তথা নিত্যদ্রব্য-নিত্যগুণ প্রভৃতির মধ্যে যে সমবায়সম্বন্ধ, তা নিত্য। আর অনিত্য পদার্থদ্বয় কিংবা নিত্যানিত্য পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে সমবায় তা অনিত্য। কিন্তু বৈশেষিকমতে সমবায়সম্বন্ধ সর্বত্রই এক, সম্বন্ধীভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন হয় না। তাঁদের যুক্তি হল 'ইহ তন্তুষু পটঃ', 'ইহ কপালে ঘটঃ', - এইভাবে সর্বত্রই 'এই আধারে এই আধেয়'

[১৫৪] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা - ৬৯।

এরূপ প্রতীতির বিষয় হওয়ায় সমবায়ের একত্বই সিদ্ধ হয়। মূল কথা হল সমবায় সম্বন্ধ সর্বত্র একই রকমের প্রতীতি উৎপন্ন করে। সত্তা জাতি যেভাবে এক হয়েও 'দ্রব্যং সৎ' 'গুণঃ সন্', 'কর্মঃ সৎ' এভাবে সৎ-বুদ্ধির প্রবর্তক হয়, তেমনি 'সমবেতং দ্রব্যং', 'সমবেতো গুণঃ', 'সমবেতং কর্মঃ' এভাবে অনুগত সমবেত বুদ্ধির প্রবর্তক হওয়ায় সমবায় এক। তাই তাঁদের মতে অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-ক্রিয়া, ব্যক্তি-জাতি, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ - এই সমস্ত অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগলের মধ্যে সমবায়রূপ যে সম্বন্ধ তা মূলত এক ও অভিন্ন। এখানে আপত্তি হতে পারে সমবায় যদি এক ও অভিন্ন হয়, তা হলে দ্রব্যে যে দ্রব্যত্ব-সমবায় আর গুণে যে গুণত্ব-সমবায় তা এক হয়ে যাবে। ফলস্বরূপ দ্রব্যে গুণত্ব-সমবায় কিংবা দ্রব্যে কর্মত্ব-সমবায়ের আপত্তি হবে। পট-সমবায় ও ঘট-সমবায় এক হলে তন্তুতে পটের-সমবায় থাকায় স্বীকার করতে হবে তাতে ঘট-সমবায়ও রয়েছে। আবার স্পর্শ-সমবায় ও রূপ-সমবায় এক হলে, বায়ুতে স্পর্শ-সমবায় থাকায় তাতে রূপ-সমবায়ও থাকবে – একথা স্বীকার করতে হবে। ফলত 'বায়ুঃ রূপবান্' এরূপ জ্ঞানের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা জানি বায়ুতে রূপ থাকে না। এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায়, সমবায় প্রকৃতপক্ষে এক, তা ভিন্ন ভিন্ন নয়। তবে তা যখন বায়ুতে স্পর্শকে সম্বদ্ধ করে স্পর্শ-প্রতীতির হেতু হয়, তখন তা স্পর্শ-সমবায় নামে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বায়ুতে রূপকে সম্বদ্ধ করে না বলে রূপ-সমবায় নামে ব্যবহৃত হয় না। বায়ুতে রূপ প্রতীতির হেতুও হয় না। রূপ-সমবায়ই রূপ প্রতীতির হেতু। তাই 'বায়ুঃ রূপবান্' এরূপ যথার্থ প্রতীতি হয় না। তদনুরূপ একই সমবায় যখন দ্রব্যে দ্রব্যত্বকে সম্বদ্ধ করে, তখন তা হবে দ্রব্যত্ব-সমবায়। আবার তা যখন গুণে গুণত্বকে সম্বদ্ধ করে, তখন তা গুণত্ব-সমবায় নামে ব্যবহৃত হয়। মূল কথা হল, এক সমবায় যেখানে যাকে সম্বদ্ধ করে, সেখানে তৎ-সমবায় নামে অভিহিত হয়। বস্তুত তা ভিন্ন ভিন্ন নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে বৈশেষিক-সম্মত ষষ্ঠ-পদার্থ সমবায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? যদিও ন্যায় ও বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন, তথাপি এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন প্রত্যক্ষ যোগ্য বস্তুতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

'পটসমবায়বান্ তন্তুঃ' প্রভৃতি স্থলে পট ও তন্তু চক্ষুর্গ্রাহ্য হওয়ায়, তাঁরা মনে করেন এস্থলে বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারাই সমবায়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। তবে বৈশেষিকাচার্যগণ উক্ত ন্যায়মত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে সমবায় যেহেতু এক, সেহেতু সমবায় প্রত্যক্ষে সমবায় সম্বন্ধের যাবতীয় আশ্রয়ের অর্থাৎ অনুযোগী ও প্রতিযোগী সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত হয়। কিন্তু সমবায়ের অনেক অনুযোগী ও প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ হওয়ায় তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। ফলত অতীন্দ্রিয়-পদার্থসমূহে স্থিত সমবায়ের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। যদিও এই প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণ সহমত পোষণ করে থাকেন। তাঁরাও স্বীকার করেন, যেখানে সমবায়ের সম্বন্ধী অর্থাৎ অনুযোগী ও প্রতিযোগী পদার্থ অতীন্দ্রিয়; সেখানে সমবায়কে আমরা অনুমানের মাধ্যমেই জানতে পারি। যেমন – পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি দ্রব্য অতীন্দ্রিয়। তাই এস্থলে পরমাণু প্রভৃতিতে স্থিত সমবায়ও অতীন্দ্রিয় হবে। কাজেই তা প্রত্যক্ষগম্য হবে না, তা অনুমেয়ই হবে। প্রদত্ত স্থলে অনুমানের আকারটি হবে – 'গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডীপুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ'। প্রদত্ত অনুমানের পক্ষ হল গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধি, সাধ্য হল বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধবিষয়ত্ব, আর হেতু হল বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব, দৃষ্টান্ত হিসেবে দন্ডীপুরুষ - এরূপ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষবুদ্ধিকে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্ট বুদ্ধি মাত্রই বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে। যেমন দন্ডীপুরুষ - এটি একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি। এরূপ জ্ঞানে পুরুষ বিশেষ্য রূপে, দন্ড তার বিশেষণ রূপে এবং তাদের মধ্যেকার সংযোগ সম্বন্ধও বিষয় হয়। দন্ড ও পুরুষের মধ্যেকার সংযোগ সম্বন্ধটি যদি জ্ঞানের বিষয় না হতো, তা হলে 'দন্ডীপুরুষ' - এমন বুদ্ধি কখনও হতো না। দণ্ড আর পুরুষ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অসম্বন্ধ অবস্থায় থাকতো, তা হলে সেই পুরুষকেও দণ্ডবান্ পুরুষ বলা যেত না। কাজেই স্বীকার করতে হয় বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাদের সম্বন্ধও বিষয় হয়।

এখন 'গুণবান্', 'ক্রিয়াবান্' প্রভৃতিও বিশিষ্টবুদ্ধি। কাজেই এরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধও বিষয় হবে, আর সেই সম্বন্ধটি হল সমবায়। কারণ গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি তাদের আধার-দ্রব্যকে ছেড়ে কখনও থাকতে পারে না। কাজেই এমন

যুতসিদ্ধ-পদার্থের মধ্যেকার সম্বন্ধ কখনও সংযোগ হতে পারে না। আবার দ্রব্য ও গুণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন বলে, তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধও সম্ভব নয়। দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির কালিক সম্বন্ধও সম্ভব নয়। আবার অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকে স্বরূপও বলা যাবে না। কারণ স্বরূপ হল সম্বন্ধিদ্বয়ের স্বরূপ। কিন্তু প্রদত্তস্থলে সম্বন্ধ অসংখ্য হওয়ায় অসংখ্য স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। ফলত গৌরব দোষ দেখা দেবে। কাজেই স্বীকার করতে হয় যে, 'গুণবান্ দ্রব্যঃ' কিংবা 'ক্রিয়াবান্ দ্রব্যঃ' প্রভৃতি বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয়রূপে যে সম্বন্ধটি সিদ্ধ হয় তাহল সমবায়। এই সমবায় নিত্য এবং এক। ব্যক্তির অভেদ বশত সমবায়ে সমবায়ত্ব জাতি স্বীকৃত নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, জন্যভাব-পদার্থের উৎপত্তিতে কার্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধরূপেও সমবায়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। নিয়ম আছে – 'যত্র সমবায়েন কার্যং তত্র তাদাত্ম্যেন দ্রব্যম্' অর্থাৎ যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেখানে দ্রব্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণ হয়। যেমন- কপালে ঘটরূপ কার্য সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, আর ওই কপালে কপালরূপ-দ্রব্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থেকে কারণ হয়। কাজেই প্রদত্ত স্থলে কারণতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হল তাদাত্ম্য, আর কার্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হল সমবায়। কাজেই সমবায় অবশ্যস্বীকার্য।

বৈশেষিকমতে সমবায়কে দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই তাকে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। সমবায়কে দ্রব্য বলা যায় না কারণ দ্রব্য ভাবকার্য-মাত্রেরই সমবায়িকারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সমবায়ে কিছু সমবায় সম্বন্ধে না থাকায় তাকে দ্রব্য বলা যায় না। সংযোগাদির ন্যায় তাকে গুণ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গুণ কেবল দ্রব্যে আশ্রিত কিন্তু সমবায় দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সমবায় ও বিশেষে থাকে। এই একই যুক্তিতে সমবায়কে কর্মেরও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কারণ কর্ম দ্রব্যে আশ্রিত কিন্তু সমবায় দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতিতেও থাকে। তা সামান্য বা জাতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ জাতি তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু সমবায় তারা আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। তা যে বিশেষের অন্তর্ভুক্ত এমনও বলা সঙ্গত হবে না। কারণ বিশেষ প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে একটি

করে থাকে। আর নিত্য দ্রব্য অসংখ্য হওয়ায় বিশেষ অসংখ্য। কিন্তু বৈশেষিকমতে সমবায় এক। কাজেই তা বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নয়। তা আবার অভাবেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। কারণ সমবায় 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এইরূপ ভাবরূপে প্রতীত হয়। কাজেই দ্রব্যাদি অতিরিক্ত সমবায়কে পৃথক পদার্থান্তর হিসাবে অবশ্য স্বীকার করতে হবে। তবে বৈশেষিকমতে সমবায় বিশেষের ন্যায় জাতিহীন পদার্থ। কারণ সমবায় যেমন কোন কিছুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তদনুরূপ সমবায়ও কোন কিছুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। তবে বিশেষ কেবল নিত্য পদার্থেই থাকে কিন্তু সমবায় দুটি নিত্য পদার্থ কিংবা দুটি অনিত্য পদার্থ পদার্থ, এমনকি নিত্য অনিত্য দুটি সম্বন্ধীর মধ্যেও সমবায় সম্বন্ধ থাকতে পারে। যদিও বৈশেষিকমতে, এই সমবায় নিত্য এবং এক। সম্বন্ধীভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন হয় না।

নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতে সমবায় এক নয়। তা প্রতিযোগীভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাঁর যুক্তি হল, সমবায় যদি এক হয়, তাহলে পৃথিবীগত গন্ধ-সমবায় ও জলগত স্নেহ-সমবায় এক হওয়ায়, জলে গন্ধের যথার্থ প্রতীতির আপত্তি হবে। কারণ নিয়ম আছে, সম্বন্ধের সত্তাই সম্বন্ধীর অর্থাৎ প্রতিযোগীর সত্তার নিয়ামক হয়। অর্থাৎ যার সম্বন্ধ যেখানে থাকে, সেখানে তাকেও থাকতে হবে। স্নেহ-সমবায় ও গন্ধ-সমবায় এক হওয়ায় আর জলে স্নেহ-সমবায় থাকায় স্বীকার করতে হবে জলে গন্ধ-সমবায়ও আছে। ফলত 'জলং গন্ধবৎ' – এরূপ প্রতীতির আপত্তি হবে। এখন যদি প্রাচীনগণ বলেন, গন্ধপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় গন্ধসত্তার নিয়ামক। জলে এরূপ বিশিষ্ট-সমবায় না থাকায় গন্ধও থাকবে না। রঘুনাথ মনে করেন, প্রাচীনগণের এরূপ অভিমত সঙ্গত নয়। কারণ 'বিশিষ্টঃ শুদ্ধান্নাতিরিচ্যতে' এই নিয়ম অনুসারে গন্ধপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট-সমবায় শুদ্ধ-সমবায় হতে ভিন্ন না হওয়ায় জলে সমবায় থাকায় গন্ধপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ও থাকে – এমনটা স্বীকার করতে হবে। ফলে 'জলং গন্ধবৎ' এরূপ যথার্থ প্রতীতির আপত্তি বারণ করা যায় না। এর উত্তরে যদি প্রবীণগণ বলেন বিশিষ্ট-সমবায় শুদ্ধ-সমবায় হতে অনতিরিক্ত হলেও গন্ধপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ের অধিকরণতা বিলক্ষণ। এই বিলক্ষণ অধিকরণতা পৃথিবীতে থাকলেও জলাদিতে থাকে না।

ফলত জলে গন্ধের যথার্থ প্রতীতির আপত্তি হবে না। প্রাচীনগণের এরূপ অভিমতের প্রত্যুত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন – এস্থলে বিলক্ষণ নানা অধিকরণতা কল্পনা করা অপেক্ষা সমবায়কে নানা বলে স্বীকার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

অভাব

বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের সর্বশেষ পদার্থ হল **অভাব**। 'ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম্' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাকে অভাব বলা হয়েছে। তাই মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে- 'অভাবত্বং দ্রব্যাদি ষট্কান্যোন্যাভাববত্ত্বম্'[১৫৫] অর্থাৎ দ্রব্যাদি ষড়-ভাব পদার্থের ভেদ যাতে রয়েছে, তা হল অভাব নামক পদার্থ। অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্য নামক পদার্থে গুণাদি পদার্থের ভেদ থাকলেও দ্রব্যের ভেদ থাকে না। অনুরূপভাবে গুণে দ্রব্যাদির ভেদ থাকলেও গুণের ভেদ থাকে না। কিন্তু অভাব নামক পদার্থে দ্রব্যাদি ষড়-ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাব তথা ভেদ বিদ্যমান। কাজেই 'ষড়-ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাববত্ত্ব'ই হল অভাবের লক্ষণ। কিন্তু এভাবে অভাবের লক্ষণ অভাবের সাহায্যে দেওয়া হলে, তা আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। ভাব পদার্থের ভেদ যাতে রয়েছে তা হল অভাব, আবার অভাব পদার্থের ভেদ যাতে রয়েছে তা হল ভাব পদার্থ। এভাবে লক্ষণ প্রদান করা হলেও তা যথাযথ হয় না। কারণ অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ দেখা দেয়। তাই বলা হয়েছে – 'নিষেধাভিলাপ-প্রত্যয়গম্যত্বম্ অভাবত্বম্' অর্থাৎ নিষেধবাচক 'নঞ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে জ্ঞানকে বোঝানো হয় সেই জ্ঞানের বিষয় হল অভাব। এভাবে অভাব পদার্থের বর্ণনা করলে আর অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 'ঘটোবিনশ্যতি', 'ঘটোভবিষ্যতি' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করেও অভাবকে বোঝানো হয়ে থাকে। 'ঘটোভবিষ্যতি' এরূপ বাক্যদ্বারা বর্তমানে যে ঘট নেই, তার প্রাগভাব রয়েছে তা বোঝানো হয়ে থাকে। আবার 'ঘটোবিনশ্যতি' এরূপ বাক্যদ্বারা বর্তমানে ঘট নেই, তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে তা বোঝানো হয়ে থাকে। বৈশেষিকমতে কোন কিছুর থাকাকে আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি কোন কিছু না

[১৫৫] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ৭৮।

থাকাকেও প্রত্যক্ষ করে থাকি, যেমন- 'এই ঘরে ঘট আছে' এরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের যেমন হয়, তদনুরূপ 'এই ঘরে পট নেই' এরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানও আমাদের হয়ে থাকে। এই নিষেধ মূলক প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়রূপে অভাব নামক পদার্থটি অবশ্যস্বীকার্য। শিবাদিত্য মিশ্র তার '*সপ্তপদার্থী*' গ্রন্থে অভাব পদার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - 'প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানাভাবঃ'[১৫৬] অর্থাৎ যে পদার্থের জ্ঞান তার প্রতিযোগী পদার্থের অধীন তাকেই অভাব বলা হয়।

যদিও প্রাভাকর সম্প্রদায় অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকারই করেন না। তাঁদের যুক্তি হল, যে অধিকরণে অভাবের বোধ হয়, অভাব সেই অধিকরণ হতে অতিরিক্ত কিছু নয়। যেমন 'ভূতলে ঘটাভাব' স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভূতলেরই সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। সেস্থলে ভূতল অতিরিক্ত কোন কিছুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না। কাজেই স্বীকার করতে হয় ভূতলে ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ। তাছাড়া যে অধিকরণে অভাবের জ্ঞান হয়, তা সর্বজনস্বীকৃত। এমন কেউ নেই যে ভূতল আদি অধিকরণকে স্বীকার করেন না। কাজেই তা অতিরিক্ত অভাব নামক পদার্থ কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন - অভাব যদি অধিকরণস্বরূপ হয়, তা হলে ভূতলে ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ হবে, টেবিলে ঘটাভাব টেবিলস্বরূপ হবে। এইভাবে নানা অধিকরণ স্থিত একই অভাব নানা অধিকরণস্বরূপ - এমন স্বীকার করতে হবে। এইভাবে এক অভাবের ব্যাখ্যার জন্য অনন্ত অধিকরণ কল্পনা করতে হবে। তদপেক্ষা অভাব নামক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করলে লাঘব হয়। কাজেই ন্যায় বৈশেষিকমতে, অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত। এখন পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলতে পারেন, অভাবের অধিকরণ কল্পনা নতুন নয়, তা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। কাজেই গৌরবের আশঙ্কা অমূলক। এর উত্তরে ন্যায় বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন, অভাবকে যদি অধিকরণস্বরূপ বলা হয়, তা হলে আধার-আধেয়ভাবের ব্যাখ্যা

[১৫৬] ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০, পৃষ্ঠা - ৬৬।

দেওয়া যাবে না। অভিপ্রায় এই যে, 'ভূতলে ঘটাভাব' - এস্থলে ভূতল হল আধার এবং ঘতাভাব হল আধেয়। এখন ঘটাভাব যদি ভূতলস্বরূপ হত, তা হলে 'ভূতলে ঘটাভাব' - এরূপ আধার আধেয়ভাবে অভাবের প্রতীতি হত না। কারণ অভিন্ন বস্তুতে কখনও আধার-আধেয়ভাবের বোধ হয় না। কাজেই ভূতল অতিরিক্ত ঘটাভাবরূপ স্বতন্ত্র অভাব পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য। মুক্তাবলীতে বলা হয়েছে – 'অনন্তাধিকরণাত্মকত্ব-কল্পনাপেক্ষয়াঽতিরিক্ত-কল্পনায়া এব লঘীয়স্ত্বাৎ। এবঞ্চাধারাধেয়ভাবোঽপ্যুপদ্যতে'[১৫৭]। তাছাড়া অভাবকে যদি অধিকরণস্বরূপ বলা হয় তা হলে যে পদার্থ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেই পদার্থের অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয় - এই সর্বজনস্বীকৃত নিয়মটির অপলাপ ঘটবে। গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কাজেই গন্ধাভাবও ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে – এটা সর্বজনস্বীকৃত। এখন 'জলে গন্ধ নেই' এস্থলে গন্ধাভাব যদি জলস্বরূপ হয়, তা হলে গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় জলও ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সুতরাং অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলা যাবে না। শুধু তাই নয়, অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপ হত, তা হলে ঘটের প্রাগভাব এবং ধ্বংসাভাব কপালস্বরূপ – এমনটা স্বীকার করতে হত। যেহেতু প্রাগাভাব এবং ধ্বংসাভাব-এর অধিকরণ হয় প্রতিযোগীর অধিকরণ। কাজেই ঘট-প্রাগভাব বা ঘট-ধ্বংসাভাবের অধিকরণ হবে তাদের প্রতিযোগী ঘট-এর অধিকরণ তথা কপালদ্বয়। আর এই কপালদ্বয় ঘটের বিদ্যমানকালেও থাকে। এমতাবস্থায় অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপ হয়, তা হলে ঘটের বিদ্যমানকালেও কপালদ্বয় বিদ্যমান থাকায় 'ঘটো ভবিষ্যতি' কিংবা 'ঘটো ধ্বস্তঃ' - এরূপ অভাব-বিষয়ক প্রতীতির আপত্তি হবে। তাই ন্যায়বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন, অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলা যায় না।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে *ভাষাপরিচ্ছেদে* বলা হয়েছে, 'অভাবস্তু দ্বিধা - সংসর্গান্যোন্যাভাব-ভেদতঃ'[১৫৮] অর্থাৎ অভাব দুই-প্রকার সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার – প্রাগাভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যদিও প্রাচীন

---

[১৫৭] ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩, পৃষ্ঠা – ৮৪-৮৫।
[১৫৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৮।

নৈয়ায়িকগণ সংসর্গাভাবকে চারভাগে বিভক্ত করেন, যথা - প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং উৎপত্তি-বিনাশশালী সাময়িকাভাব। তবে নব্যগণ সাময়িকাভাব স্বীকার করেননি। তাঁরা সমবায়িকাভাবকে অত্যন্তাভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই তাঁদেরমতে অভাব চার প্রকার – প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব অত্যন্তাভাব এবং অন্যোনাভাব।

ন্যায় বৈশেষিকমতে যে অভাব নিজ প্রতিযোগীর সংসর্গেরর-বিরোধী হয়, তাকে সংসর্গাভাব বলা হয়। এই সংসর্গাভাব যেখানে থাকে, সেখানে ওই অভাবের প্রতিযোগীর সংসর্গ থাকে না। কপালে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে, তখন ওই কপালে ঘটপ্রাগভাবের-প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না, কারণ তখনও ওই কপালে ঘট উৎপন্ন হয়নি। এভাবে কপালে ঘট প্রাগভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওই প্রাগভাবের অধিকরণ তথা কপালে ঘটের সংসর্গ থাকবে না। একইভাবে কপাল ধ্বংস হলে ঘটও ধ্বংস হয়। তখন ঐ ঘট-ধ্বংসের অধিকরণ তথা কপালে ঘটের সংসর্গ থাকে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয়। অত্যন্তভাবও নিজ প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয়ে থাকে। যেখানে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে, যেমন - তন্তু; যেহেতু তন্তুতে ঘট কখনও থাকে না। কাজেই তন্তুতে ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। কিন্তু অন্যোনাভাব নিজ অধিকরণে নিজ প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয় না। কাজেই যেখানে অন্যোনাভাব থাকে, সেখানে অন্যোনাভাবের প্রতিযোগীর সংসর্গ থাকতেও পারে। যেমন - ঘটে পটের অভাব - এস্থলে পটাভাবের প্রতিযোগী পটের সংসর্গ ঘটে থাকলেও ‘ঘট পট নয়’ - এরূপ প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে। মূল কথা হল, ন্যায় বৈশেষিকমতে অভাব দুই প্রকার - সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। আর এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার, যথা- প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাবঃ কোন ভাবকার্যের উৎপত্তির পূর্বে তার সমবায়ী কারণে ওই কার্যটির যে অভাব তা হল প্রাগভাব। যেমন - ঘট উৎপত্তির পূর্বে ঘটের সমবায়ীকারণ কপালে ঐ ঘটের যে অভাব তা হল প্রাগভাব। ‘ভবিষ্যতি’ অর্থাৎ হবে - এরূপ প্রতীতির জনক যে অভাব তা হল প্রাগভাব। প্রাগভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – ‘অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ’ অর্থাৎ

যে অভাবের আদি নেই কিন্তু অন্ত আছে, তা হল প্রাগভাব। প্রাগভাবকে যদি কেবল অনাদি বলা হত তা হলে আকাশ, আত্মা প্রভৃতি অনাদি পদার্থে অভাবের উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। যেহেতু আকাশাদির উৎপত্তি নেই। আবার যদি কেবল ‘সান্তঃ’ বলা হত তা হলে ঘট-পটাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। যেহেতু ঘট-পটাদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখানে আপত্তি হতে পারে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণু নিত্য অর্থাৎ তার আদিও নেই অন্তও নেই। তাই পরমাণুর গুণসমূহও অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু পার্থিব পরমাণু অনাদি ও অনন্ত হলেও, পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ অনাদি হলেও সান্তঃ। কারণ বৈশেষিকমতে পার্থিব পরমাণুতে পাক উৎপন্ন হলে পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া সংসার অনাদি হওয়ায় তার কারণ মিথ্যাজ্ঞানও অনাদি। কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞান হলে পর সেই অনাদি মিথ্যাজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ এবং জীবের মিথ্যাজ্ঞান ও তজ্জন্য সংস্কার অনাদি ও সান্তঃ। কাজেই প্রদত্ত স্থলে প্রাগভাবের লক্ষণ প্রযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলত অতিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এখন কেউ বলতে পারেন, ‘অনাদিত্বে সতি সান্তত্বং প্রাগভাবত্বম্’ এভাবে প্রাগভাবের লক্ষণ না বলে ‘অনাদিত্বে সতি সান্তত্বে সতি অভাবত্বম্’ এভাবে যদি প্রাগভাবের লক্ষণ বলা হয়, তা হলে আর উক্ত স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ পার্থিব পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ কিংবা জীবের মিথ্যাজ্ঞান এবং তজ্জন্য সংস্কার প্রভৃতি অনাদি ও সান্তঃ হলেও তা অভাব নয়। কাজেই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয়। কিন্তু আমরা যদি লক্ষণটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারব, যদি প্রাগাভাবের লক্ষণে ‘অভাব’ শব্দটি সন্নিবিষ্ট হয় তা হলে ‘অনাদি’ শব্দটিকে লক্ষণে প্রযুক্ত করার প্রয়োজন থাকে না। তাই নব্য আচার্য্যগণ প্রাগভাবের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে – ‘বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বম্’[১৫৯] অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে তা হল প্রাগভাব।

প্রাগভাব নিজ প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, যেমন - ঘটের প্রাগভাব ঘট উৎপত্তির পূর্বকাল পর্যন্ত ঘটরূপ প্রতিযোগী সমবায়িকারণ কপালে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে।

---

[১৫৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ৮১।

ঘট উৎপন্ন হওয়া মাত্রই ঘটপ্রাগভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। এখন আপত্তি হতে পারে যদি প্রাগভাব তার প্রতিযোগীর সমবায়িকারণে আশ্রিত হয়, তা হলে তাকে অনাদি কিভাবে বলা যাবে? যেখানে অভাবের প্রতিযোগীর সমবায়িকারণটি অনাদি, সেখানে অভাবটিকে অনাদি বলা যেতে পারে, যেমন - দ্ব্যণুকের সমবায়িকারণ পরমাণু অনাদি। কাজেই পরমাণুতে দ্ব্যণুকের যে প্রাগভাব তা অনাদি হতে পারে। কিন্তু এইমাত্র যে পটটি তন্তুবায়কর্তৃক উৎপন্ন হল, সেই পটের সমবায়িকারণ যে তন্তু তা তো অনাদি নয়। কারণ এমন হতে পারে ওই তন্তুগুলি বেশ কয়েকদিন পূর্বে তৈরি হয়েছে। এখন পট উৎপত্তির পূর্বে ওই তন্তুতে ওই পটের যে প্রাগভাব তাকে কীভাবে অনাদি বলা যাবে? এর উত্তরে বলা যায়, সাদি অধিকরণে স্থিত প্রাগভাবও অনাদি হতে পারে। কারণ পটরূপ কার্যের সমবায়িকারণ যে তন্তুসমূহ; তার উৎপত্তির পূর্বে পটপ্রাগভাবটি কালকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। কারণ কাল হল জগতের আধারস্বরূপ। কালে জগতের সব কিছুই কালিক সম্বন্ধে থাকে। কাজেই প্রাগভাব হল অনাদি; অর্থাৎ তার উৎপত্তি কবে হয়েছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আগামীকাল যে ঘটটি উৎপন্ন হবে, সেই ঘটটির যে অভাব তা আজ যেমন আছে, তেমনি লক্ষাধিক বছর পূর্বেও কালকে আশ্রয় করেছিল। ঠিক কবে থেকে এই প্রাগভাব শুরু হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাগভাব কে অনাদি বলা হয়েছে। কিন্তু তা বিনাশী। যেহেতু তত্তৎ দ্রব্য, গুণ, ও কর্মরূপ কার্য উৎপন্ন হলে তত্তৎ কার্যের প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। তত্তৎ কার্যোৎপত্তির কারণসামগ্রীই তত্তৎ কার্যের প্রাগভাবের নাশক। যেমন – ঘটোৎপত্তির কারণসামগ্রীই ঘটোৎপত্তিক্ষণে ঘটরূপ কার্যের প্রাগভাবের নাশক হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে প্রাগভাবের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ কি? এর উত্তরে আচার্যগণ বলেছেন – উৎপদ্যমান-পদার্থের উৎপত্তির অন্যতম-কারণরূপে প্রাগভাব অবশ্যস্বীকার্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাব-কার্যের উৎপত্তির প্রতি কিছু সাধারণ-কারণ থাকে আর কিছু অসাধারণ-কারণ থাকে। যেমন – পটরূপ কার্যের উৎপত্তির প্রতি ঈশ্বর, ঈশ্বরের-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-কৃতি, কাল, দিক, প্রাগভাব, অদৃষ্ট এবং প্রতিবন্ধকাভাব – এই নয়টি সাধারণ-কারণ এবং তন্তু, তন্তু-সংযোগ, তন্তুবায়, বয়নযন্ত্র, তুরী, বেমা প্রভৃতি অসাধারণকারণসমূহ অপেক্ষিত

হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পটরূপ কার্যোৎপত্তির প্রতি যে নয়টি সাধারণ-কারণ অপেক্ষিত তার মধ্যে একটি হল পট-প্রাগভাব। আর আমরা জানি, যে সমস্ত কারণের সমবধানে কার্যের উৎপত্তি হয়, তাদের কোন একটির অভাবেই কার্যোৎপত্তি ব্যাহত হয়। কাজেই পটরূপ কার্যোৎপত্তির পূর্বে পটপ্রাগভাবরূপ সাধারণ-কারণটি স্বীকৃত না হলে পটের উৎপত্তিই হবে না। সুতরাং প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যটি উৎপন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ কার্যের প্রাগভাবটি বিদ্যমান থাকে; কার্য উৎপন্ন হলেই প্রাগভাবটি বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রাগভাবকে কার্যের অন্যতম একটি কারণরূপে স্বীকার করতে হয়। এখন কার্য-উৎপত্তির প্রতি প্রাগভাবকে যদি অন্যতম একটি কারণরূপে স্বীকার না করা হয়, তাহলে পটাদি কার্যের উৎপত্তিক্ষণে সেই পটের অন্য সমস্ত কারণ-সামগ্রী উপস্থিত থাকায়; যেহেতু অন্যান্য কারণ-সামগ্রীর সঙ্গে পটের বিরোধ নেই, সেহেতু উৎপন্ন সেই পটের পুনরায় উৎপত্তির আপত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে উৎপন্ন পটের পুনরুৎপত্তি হয় না। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুর পুনরুৎপত্তির আপত্তি বারণের জন্য প্রাগভাব নামক একটি অভাব অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কার্যমাত্রের প্রতি এই প্রাগভাব কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং কোন কার্যবস্তুর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাগভাবটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায়, সেই কার্যের অন্যান্য কারণসমূহ উৎপত্তিক্ষণে উপস্থিত থাকলেও, কার্য উৎপত্তির জন্য অপেক্ষিত সমস্ত কারণ বিদ্যমান না থাকায়, সেই বস্তুর পুনরুৎপত্তি হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রাগভাব অনাদি হলেও তা অবিনাশী নয়, কারণ প্রাগভাবের বিনাশ স্বীকার না করা হলে তা নিত্য পদার্থের ন্যায় সবসময় থাকবে। ফলত পটের উৎপত্তির পরেও সেই পটের প্রাগভাবরূপ কারণটি বিদ্যমান থাকায় সেই পটের পুনরায় উৎপত্তির আপত্তি হবে। তাই প্রাগভাবকে বিনাশী বলা হয়েছে। পট উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই পটের প্রাগভাবের বিনাশ ঘটে। তাই পটোৎপত্তির পর পটপ্রাগভাবরূপ কারণের বিনাশে সামগ্রীর অভাববশতঃ উৎপন্ন কার্যের পুনরুৎপত্তি বারিত হয়। সুতরাং প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য।

শুধু তাই নয়, সৎকার্যবাদ খণ্ডন করে ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত জগৎব্যাখ্যার মূল ভিত্তিস্বরূপ আরম্ভবাদ স্থাপনের নিমিত্তও প্রাগভাব অবশ্য স্বীকার্য। সৎকার্যবাদিগণ মনে করেন, উৎপত্তির

পূর্বে কার্য নিজ উপাদান-কারণে অব্যক্তরূপে অবস্থান করে। কাজেই কার্য কারণ হতে অত্যন্ত ভিন্ন নয়। অভিপ্রায় এই যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের উপাদান কারণে কার্যের অভাব স্বীকার করা যাবে না, কেন না যে অধিকরণে যে কার্যের অভাব থাকে, সেখানেই যদি তার উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে বালুকা থেকেও তেলের উৎপত্তির আপত্তি হবে। কিন্তু বালুকা হতে তেল উৎপন্ন হয় না, তিল হতেই তেল উৎপন্ন হয়। এর কারণ হল বালুকাতে তেলের অভাব থাকে, কিন্তু তিলে তেলের অভাব থাকে না। বালুকার ন্যায় যদি তিলে তেলের অভাব থাকত, তাহলে তিল হতে কখনও তেলের উৎপত্তি হত না। কিন্তু বাস্তবে তিল হতেই তেল উৎপন্ন হতে দেখা যায়, বালুকা হতে নয়। কাজেই স্বীকার করতে হবে তেলের উপাদান কারণ তিলে তেল অব্যক্তভাবে থাকে, তাই তিল হতেই তেল উৎপন্ন হয়। কাজেই সাংখ্যমতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে সৎ, তাই সাংখ্যাচার্যগণকে সৎকার্যবাদী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সৎকার্যবাদীগণের এরূপ আপত্তির উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন – তিলে ও বালুকাতে তুল্যভাবে তেলের অভাব আছে। তবে উভয় অভাব এক প্রকার নয়। সৎকার্যবাদীগণ তিলে তেলের অভাব ও বালুকাতে তেলের অভাব – এই উভয় অভাবের বৈলক্ষণ্য অনুধাবন করতে পারেননি; তাই তিল ও বালুকা – এই উভয়ের মধ্যে বালুকা হতে তৈলোৎপত্তির আপত্তির বারণের জন্য তিলে তেলের অব্যক্ত সত্তা স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় অভাব বিলক্ষণ – তৈলোৎপত্তির পূর্বে তিলে তেলের যে অভাব, তা হল তেলের প্রাগভাব; আর বালুকাতে তেলের যে অভাব তা হল তেলের অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে অধিকরণে কার্যের প্রাগভাব থাকে, সেই অধিকরণেই কার্যটি উৎপন্ন হয়; তাই তিলে তেল উৎপন্ন হয়। আর বালুকাতে তেলের অত্যন্তাভাব থাকায় অর্থাৎ প্রাগভাব না থাকায় বালুকা হতে তেলের উৎপত্তি হয় না।

এখন সৎকার্যবাদীগণ পুনরায় আপত্তি করে বলতে পারেন, উৎপত্তির পূর্বে তেলের অভাব তিলে যেমন আছে, তেমনি বালুকাতেও আছে। ঐ অভাবের কোন মূর্তি অর্থাৎ আকার বা গুণ না থাকায় কার উপর ভিত্তি করে বলা যাবে – তিলে তেলের অভাব হল

প্রাগভাব আর বালুকাতে তেলের অভাব হল অত্যন্তাভাব? এর উত্তরে আচার্যগণ বলেছেন – একথা ঠিক যে তিল এবং বালুকাতে যে তৈলাভাব তা পরস্পর বিলক্ষণ হলেও বৈলক্ষণ্য বোধক কোন আকৃতি বা গুণ নেই। তথাপি প্রতিটি অভাবের নিজস্ব একটি স্বরূপ থাকে। এই স্বরূপের ভেদবশতঃ প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব পরস্পর ভিন্ন হয়। সুতরাং তিলে তেলের যে অভাব আর বালুকাতে তেলের যে অভাব তা এক নয়।

ধ্বংসাভাবঃ মুদ্গার প্রভৃতির আঘাতে যখন ঘট ধ্বংস হয়, তখন ঐ ঘটের সমবায়িকারণ কপালে ঐ ঘটের যে অভাব তাকে **ধ্বংসাভাব** বলা হয়। ধ্বংসাভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসাভাবঃ' অর্থাৎ যে অভাবের আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই, সেই অভাবকে ধ্বংসাভাব বা প্রধ্বংসাভাব বলে। মূল কথা হল, মুদ্গার প্রহারে ঘট ধ্বংস হলে, ঐ ঘটের সমবায়িকারণ কপালের টুকরোকে দেখে 'অত্র ঘটো ধ্বস্তঃ'; 'অত্র ঘটো বিনষ্টঃ' – এরূপ যে প্রত্যক্ষ-প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতির বিষয়রূপে ধ্বংসাভাব অবশ্য স্বীকৃত।

ন্যায়-বৈশেষিকমতে, ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে। ঘট যে ক্ষণে আঘাতের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই ক্ষণ হতেই ঘটের ধ্বংস শুরু হয় অর্থাৎ সেই ক্ষণ হল ধ্বংসের উৎপত্তিক্ষণ। তবে ধ্বংসাভাব অবিনাশী। কারণ ধ্বংসাভাব যদি বিনাশী হত তা হলে ঘট-পটাদি পদার্থের ধ্বংসের ন্যায় ধ্বংসেরও অন্য কোন ধ্বংস স্বীকার করতে হত। আর ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার করা মানে ধ্বংসের প্রতিযোগীর পুনরাবির্ভাব স্বীকার করা। কিন্তু যা একবার ধ্বংস হয়ে যায়, তার আর পুনরাবির্ভাব হয় না। কারণ ঘটধ্বংসকে ধ্বংস করতে পারে একমাত্র ঘটধ্বংসের প্রতিযোগী অর্থাৎ ঘটটি। কিন্তু যে কারণ-সামগ্রী সমবহিত হওয়ার ফলে ঘট উৎপন্ন হয়েছিল, সেই ঘট একবার ধ্বস্তঃ হলে, পুনরায় ঐ ঘটের কারণসামগ্রীর অন্তর্গত কপাল, কপালদ্বয়-সংযোগ প্রভৃতি পুনর্বার সন্নিহিত হতে পারে না বলে উৎপন্ন ঘটের পুনরাবির্ভাব বা পুনরুৎপত্তি সম্ভব নয়। কাজেই ঘটরূপ প্রতিযোগীর অভাবে ঘট-ধ্বংসাভাবের আর ধ্বংস স্বীকার করা হয় না। তাই আচার্যগণ ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বলেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন মূলত মোক্ষানুসারী; মোক্ষপ্রাপ্তিই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর মোক্ষ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-ধ্বংসকেই মোক্ষ বলা হয়েছে। কাজেই মোক্ষ বা অপবর্গের স্বরূপ নির্বাচন করতে হলে ধ্বংসাভাবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

অত্যন্তাভাবঃ যে অভাব ত্রৈকালিক অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - তিনকালেই থাকে, সেই সংসর্গাভাবই হল **অত্যন্তাভাব**। যেমন 'বায়ুতে রূপাভাব'। বায়ুতে রূপ কখনও থাকে না অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিনকালে বায়ুতে রূপের অভাব থাকে। এরূপ ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই হল অত্যন্তাভাব। 'অন্তম্ অভাবম্ অতীতঃ স চাসৌ অভাবঃ – অভাবকে অতিক্রম করে যে অভাব অর্থাৎ যে অভাবের কখনও অভাব বা বিনাশ হয় না। তা-ই হল অত্যন্তাভাব। অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই, তাই অত্যন্তাভাবকে নিত্য বলা হয়েছে – 'নিত্যসংসর্গাভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্'[১৬০]। অন্যোন্যাভাবেরও উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই অর্থাৎ তাও নিত্য হয়ে থাকে; তাই বলা হয়েছে – 'উৎপত্তিশূন্যত্বে সতি বিনাশশূন্যত্বে সতি অন্যোন্যাভাবভিন্নত্বে চ অভাবত্বম্ অত্যন্তাভাবত্বম্' অর্থাৎ যে অভাবটির উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই এবং যেটি অন্যোন্যাভাব ভিন্ন, তা হল অত্যন্তাভাব।

প্রাচীন আচার্যগণ চতুর্থ আর একপ্রকার সংসর্গাভাব স্বীকার করেছেন, যার নাম হল সাময়িকাভাব। সাময়িকাভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন – 'উৎপত্তিবিনাশবান্ অভাবঃ সাময়িকাভাবঃ'। এই অভাবটি সময়বিশেষে থাকে আবার সময়বিশেষে থাকে না বলে, এই সংসর্গাভাবকে সাময়িকাভাব বলা হয়েছে। যেমন – ভূতলে সংযোগসম্বন্ধে বিদ্যমান ঘটকে যদি অন্যত্র অপসারিত করা হয়, তা হলে সেখানে ঘটাভাব জন্মায়। পুনরায় ঘটকে যদি সেখানে আনা হয়, তাহলে ঐ ঘটাভাবটি বিনষ্ট হয়। এভাবে ঘটের অপসারণ ও আনয়নের দ্বারা অভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ সংঘটিত হওয়ায়, ঐ অভাবটিকে উৎপাদ-বিনাশশালী চতুর্থ প্রকারের সংসর্গাভাব বলা হয়েছে। প্রাগভাবের উৎপত্তি নেই কিন্তু বিনাশ আছে; ধ্বংসাভাবের

---

[১৬০] ঐ, পৃষ্ঠা – ৮১।

উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নেই; অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই। আর সাময়িকাভাবের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। তাই এটি চতুর্থ প্রকারের সংসর্গাভাব। যদিও নবীন আচার্যগণ এই চতুর্থ প্রকারের সংসর্গাভাবকে স্বীকার করেননি। কারণ তাঁদের মতে বারবার ঘটের আনয়ন ও অপসারণের দ্বারা অসংখ্য অভাব ও তার উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করতে হবে। ফলত মহাগৌরব হবে। তাই তাঁরা সাময়িকাভাবকে অত্যন্তাভাবেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অন্যোন্যাভাবঃ 'অন্যোন্য' শব্দের অর্থ পরস্পর। পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব অর্থাৎ ভেদ, অন্যোন্যপ্রতিযোগিক অন্যোন্যানুযোগিক যে অভাব, তা হল **অন্যোন্যাভাব**। যেমন – 'ঘটঃ পটো ন', 'পটঃ ঘটো ন' – এরূপ অভাব হল অন্যোন্যাভাব। যেহেতু 'ঘটঃ পটো ন' এস্থলে ঘট হল অনুযোগী আর পট হল প্রতিযোগী; আবার 'পটঃ ঘটো ন' এস্থলে পট হয় অনুযোগী আর ঘট হয় প্রতিযোগী। অর্থাৎ এরা একে অন্যের অনুযোগীও হতে পারে, আবার প্রতিযোগীও হতে পারে। কিন্তু সংসর্গাভাব কখনও এমন অন্যোন্যপ্রতিযোগিক এবং অন্যোন্যানুযোগিক হয় না। যেমন – 'বায়ুতে রূপের অভাব' – এস্থলে প্রতিযোগী হয় রূপ আর অনুযোগী হয় বায়ু। এর বিপরীত হয় না অর্থাৎ রূপ অনুযোগী এবং বায়ু প্রতিযোগী - এমনটা হয় না।

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবত্বম্'[১৬১] অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়; অন্যভাবে বলা যায়, যে অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হল তাদাত্ম্য, তাকে অন্যোন্যাভাব বলা হয়। অন্যোন্যাভাব নিজ অধিকরণে নিজ প্রতিযোগী তাদাত্ম্যের বিরোধী হয়। যেমন- 'ঘট পট নয়' এস্থলে ঘটে পটের ভেদ থাকায়, তাতে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। তাই ঘটে পটের যে অভাব তা নিজ প্রতিযোগী পটের তাদাত্ম্যের বিরোধী হয়। কারণ বস্তুমাত্রই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে নিজেতে থাকে, নিজ ভিন্ন অন্যত্র থাকে না।

[১৬১] ঐ, পৃষ্ঠা – ৮০।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অন্যোন্যাভাব দ্বিবিধ – বিশেষাভাব ও সামান্যাভাব। 'পীতঘটো ন রক্তঘটঃ' এরূপ প্রতীতিতে পীত ঘটে রক্তঘটের অর্থাৎ বিশেষ ঘটের অন্যোন্যাভাব বিষয় হয় বলে একে বিশেষ অন্যোন্যাভাব বলা হয়। আর 'ভূতলং ন ঘটঃ' এরূপ প্রতীতিতে ভূতলে ঘট সামান্যের ভেদ বিষয় হয় বলে একে সামান্য অন্যোন্যাভাব বলা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীনগণ অভাবের অভাবকে ভাবস্বরূপ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে ঘটাভাবের অভাব ঘটস্বরূপ হয়ে থাকে। কারণ ঘটাভাবের অভাবকে যদি অতিরিক্ত অভাব বলা হয় তাহলে ঘটাভাবের অভাব, ঘটাভাবাভাবের অভাব, ঘটাভাবের অভাবের অভাবের অভাব – এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা অনিবার্য। তাই তাঁরা মনে করেন অভাবের অভাব প্রথম অভাবের প্রতিযোগীস্বরূপ। যদিও নব্য আচার্যগণ অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত অভাব বলেছেন। কারণ তাঁদের মতে ঘটবিশিষ্ট ভূতলে যখন 'ঘটাত্যন্তাভাবো নাস্তি' এরূপ নিষেধমুখে যে প্রতীতি হয়। তার বিষয় ঘটরূপ ভাবপদার্থ হতে পারে না; তা অতিরিক্ত অভাববিশেষ।

রঘুনাথ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বঃ

বৈশেষিক আচার্যগণ শব্দের সমবায়িকারণ হিসাবে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। অভিপ্রায় এই যে, আমরা জানি গুণ কখনও নিরাশ্রয় থাকে না। তা কোন না কোন আশ্রয় দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। এখন শব্দ যেহেতু একটি গুণ; তা অবশ্যই কোন দ্রব্যে আশ্রিত হবে। তা হলে সমবায়সম্বন্ধে শব্দ নামক গুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য হবে? এটা চিন্তনীয়। কোন স্পর্শবৎ দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, কিংবা বায়ু শব্দের আশ্রয় হতে পারবে না। কারণ শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু স্পর্শবৎ দ্রব্যের গুণগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তাকে আত্মার গুণও বলা যাবে না। কারণ আত্মার সুখদুঃখাদি গুণ মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। শব্দ যেহেতু সকল দ্রব্যে থাকে না, সেহেতু তাকে সামান্যগুণ বলা যায় না, তা হল একটি বিশেষগুণ। আর শব্দ বিশেষগুণ হওয়ায় তা দিক্, কাল, কিংবা মনের গুণ হতে পারবে না। যেহেতু দিক, কাল প্রভৃতির কোন বিশেষ গুণ নেই। কাজেই স্বীকার

করতে হবে পৃথিব্যাদি অষ্ট-দ্রব্যাতিরিক্ত কোন দ্রব্য নিশ্চয়ই শব্দ নামক বিশেষগুণের আশ্রয় হবে, আর তা হল আকাশ। শুধু তাই নয়, শব্দ যেহেতু একই সময়ে অনেক প্রদেশে উৎপন্ন হয় সেহেতু শব্দের আশ্রয়কেও একই সময়ে অনেক প্রদেশে অবস্থিত হতে হবে। অর্থাৎ শব্দের আশ্রয়কে সর্বগত এবং বিভু হবে। আর এমন সর্বগত এবং বিভু-দ্রব্যটি, যা শব্দ নামক বিশেষগুণের আশ্রয় হয়, তা হল আকাশ। এভাবে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ শব্দ নামক গুণের আশ্রয়রূপে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি এস্থলে আপত্তি করে বলেছেন, শব্দের অধিকরণ যে সর্ব্বগত তথা বিভু এবং নিত্য হবে তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে তার জন্য আকাশকে অতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা নেই। বৈশেষিকাচার্যগণ তো পরমাত্মা তথা ঈশ্বরকে সর্ব্বগত অর্থাৎ বিভু বলে থাকেন, আর তা যেহেতু সকল জন্য-পদার্থমাত্রেরই নিমিত্তকারণ হয়ে থাকে সেহেতু শব্দের-আশ্রয় তথা সমবায়িকারণ ঈশ্বরই হবেন। তার জন্য আকাশ নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, ঈশ্বর যেমন জন্যমাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়ে থাকেন, তদনুরূপ জীবাত্মার অদৃষ্টও জন্যমাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যেহেতু জীবাত্মার ভোগের নিমিত্ত জগৎ ও জাগতিক-বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই জীবাত্মার অদৃষ্টকে তা হলে শব্দ নামক গুণের আশ্রয় বলা হোক। কিন্তু জীবাত্মার অদৃষ্টকে শব্দ নামক গুণের আশ্রয় বলা সঙ্গত হবে না। কারণ জীবাত্মার অদৃষ্ট একটি গুণপদার্থ। আর গুণ কখনও গুণ পদার্থে আশ্রিত হয় না। পুনরায়, আপত্তি হতে পারে, জীবাত্মার অদৃষ্ট শব্দের-আশ্রয় না হলেও জীবাত্মাকে তো শব্দের-আশ্রয় বলা যেতে পারে। যেহেতু তা একটি দ্রব্য। এর উত্তরে বলা যায়, অদৃষ্ট শব্দের কারণ বলে অদৃষ্টের আশ্রয়ও যে শব্দের আশ্রয় হবে – এমন কল্পনা সত্যই নিরর্থক। ঘরের মধ্যে থাকা প্রদীপ চারপাশটা আলোকিত করে বলে এর থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত হবে না যে, ঘরও চারপাশটা আলোকিত করবে। সুতরাং জীবাত্মাকে শব্দের-আশ্রয় বলা যায় না। তাছাড়া জীবাত্মা যদি শব্দের

অধিকরণ হত তা হলে 'আমি শব্দের অধিকরণ' – এমন অনুভব আমাদের হত, কিন্তু বাস্তবতই তা হয় না। কাজেই জীবাত্মা নয়, পরমাত্মাই হলেন শব্দ নামক গুণের অধিকরণ।

পুনরায় কেউ বলতে পারেন, কর্ণশষ্কুলি-অবচ্ছিন্ন-আকাশই তো শ্রবণেন্দ্রিয়। এখন আকাশকেই যদি স্বীকার না করা হয় তা হলে কাকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হবে? এর উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণির উত্তর হল – শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্যও আকাশ নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আকাশের ন্যায় ঈশ্বরও সর্ব্বগত। কাজেই আকাশের ন্যায় তাও কর্ণবিবর-প্রদেশে বিদ্যমান। সুতরাং কর্ণচ্ছিদ্রযুক্ত-আকাশকে শ্রবণেন্দ্রিয় না বলে কর্ণচ্ছিদ্রযুক্ত-ঈশ্বরকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলাই সঙ্গত। মূলকথা হল, রঘুনাথ শিরোমণির মতে, আকাশ নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্যের স্বীকৃতি অনাবশ্যক।

রঘুনাথ শিরোমণি আকাশের ন্যায় কালকেও অতিরিক্ত দ্রব্য বলে স্বীকারই করেন না। কারণ তাঁর মতে, সকল পদার্থের স্বীকৃতির মূল কারণ হল তার প্রতীতি (অনুভব) এবং প্রতীতিমূলক ব্যবহার। কিন্তু যে কালকে অবলম্বন করে আমাদের যে, 'ইদানিং ঘটোঽস্তি', 'তদানিং ঘটোনাস্তি' ইত্যাদিরূপে প্রতীতি এবং তদ্‌নিমিত্ত ব্যবহার হয়, তা অখণ্ড এবং বিভু মহাকাল জন্য নয়। কালোপাধিস্বরূপ খণ্ডকালকে অবলম্বন করেই আমরা উক্তরূপ ব্যবহার করে থাকি। কাজেই মহাকালগোচর কোন প্রতীতি বা ব্যবহার যেহেতু আমাদের অনুভবসিদ্ধ নয় সেহেতু মহাকালরূপ নবম দ্রব্য স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন আচার্যগণ স্বীকৃত নবমপদার্থ যে কাল তা স্বরূপত এক ও অখণ্ড। কিন্তু সূর্যপরিস্পন্দনক্রিয়ারজন্য তাতে 'ইদানিং ঘটঃ', 'তদানীং ঘটঃ' প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্যপরিস্পন্দনরূপ ক্রিয়ার সঙ্গে ঘটের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ সমবায়-সম্বন্ধে সূর্যক্রিয়া সূর্যেই থাকে, ঘটে থাকে না। আবার তাদের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধও সম্ভব নয়। কারণ সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যেই থাকে। আবার তাদের মধ্যে যে স্বরূপ সম্বন্ধ থাকে এটাও বলা যায় না, যেহেতু সূর্যপরিস্পন্দন হল ক্রিয়া আর ঘট হল দ্রব্য। কাজেই তাদের মধ্যে স্বাশ্রয়সূর্যসংযোগিসংযোগরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। 'স্ব' মানে সূর্যের পরিস্পন্দনক্রিয়া, আর তার আশ্রয় হবে সূর্য। আর সেই সূর্যসংযোগী হল

কাল। আর সেই কালের সঙ্গে ঘটের সংযোগসম্বন্ধ বিদ্যমান। কাজেই 'ইদানিং', 'তদানীং' প্রভৃতি প্রতীতির অসাধারণকারণ হিসাবে 'কাল' নামক একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

এস্থলে রঘুনাথ শিরোমণি আপত্তি করে বলেন – কাল যেমন বিভু পদার্থ, ঈশ্বরও তেমন বিভু পদার্থ। কাজেই ঈশ্বরের দ্বারাই সূর্যপরিস্পন্দন এবং ঘটাদির সম্বন্ধ হতে পারে। তার জন্য কাল নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া পরমেশ্বরকে যখন জগৎকারণ হিসাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে সেহেতু লাঘববশতঃ 'কাল' নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য স্বীকার না করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

ঐ একই যুক্তিতে তিনি 'দিক্' নামক বিভু দ্রব্যটির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতে দূরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের অসাধারণ-কারণরূপে দিক্পদার্থটি গৃহীত হয়। অভিপ্রায় এই যে, আমরা অনেক সময় বলি 'পাটলিপুত্র হতে গয়া অপেক্ষা দূর'- এস্থলে পাটলিপুত্র ও গয়ার মধ্যে যে সংযোগ-পরম্পরা আছে, পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সংযোগ-পরম্পরা বিদ্যমান। এখন যা দূর (কাশী) এবং যা হতে দূর (গয়া)- এই উভয়ের সংযোগ বহুত্বের কোন সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রদত্তস্থলে সংযোগ বহুত্বের সঙ্গে উক্ত স্থান দুটির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। কাজেই তাদের মধ্যে কোন পরম্পরাসম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে, তা না হলে একটিকে অন্যটি অপেক্ষা দূর কিংবা নিকট এমন বলা যাবে না। এবং এই পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটক হবে এমন পদার্থ যা উভয়ের সাথে যুক্ত। আর সেই পদার্থটিই হল দিক্। তাছাড়া 'পূর্বদিকে ঘট' কিংবা 'পশ্চিমদিকে ঘট' ইত্যাদি প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে দিক্ নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্ত রঘুনাথ শিরোমণি এস্থলে আপত্তি করে বলেছেন – খণ্ডিত দিক্স্বরূপ ও উপাধিবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের দ্বারাই দূরত্বাদি বুদ্ধি কিংবা পূর্বদিক, পশ্চিমদিক প্রভৃতি ব্যবহারের উপপত্তি হয়ে যায়। সেহেতু দিক্ নামক অতিরিক্ত একটি দ্রব্য স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা নেই। তাছাড়া জগৎ-কারণরূপে

যেহেতু পরমেশ্বরকে স্বীকার করা হয় তখন 'দিক্' নামক অতিরিক্ত একটি বিভু দ্রব্য স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন আপত্তি হতে পারে 'এখন ঘট আছে' এবং 'পূর্বদিকে ঘট আছে' এই দুইটি প্রতীতি এক নয়। যেহেতু এদের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। তা হলে এক পরমেশ্বরের দ্বারা কীভাবে উভয়বিধ প্রতীতির ব্যাখ্যা করা যাবে? সেক্ষেত্রে অনুভব-বিরোধ হয়। কাজেই 'কাল' ও 'দিক্' নামক দুটি অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। এর উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণির বক্তব্য হল - একই ব্যক্তি যেমন কখনও পিতা, কখনও ভ্রাতা, কখনও গুরু আবার কখনও শিষ্য প্রভৃতি প্রতীতির বিষয় হয়ে থাকে, তেমনই এক ঈশ্বর উপাধিভেদে 'ইদানীং-তদানীং, কিংবা 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য' প্রভৃতি নানাবিধ প্রতীতির-বিষয় এবং নানাবিধ-ব্যবহারের হেতু হতে পারে। আমরা যদি দেখি তা হলে বুঝতে পারব, কাল কিংবা দিক্ বিভু এবং এক। অথচ উপাধিভেদে এখন, তখন, কিংবা পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদিক প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এক অখণ্ড কাল কিংবা এক অখণ্ড দিক্ যদি বৈশেষিকমতে উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীত হতে পারে, তদনুরূপ ঈশ্বর এক হলেও উপাধিভেদে তাতে নানারূপে ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণির মতে এক, নিত্য, ও বিভু ঈশ্বরের দ্বারাই 'এখন', 'তখন', কিংবা 'পূর্বদিক', 'পশ্চিমদিক' প্রভৃতি ব্যবহার উপপন্ন হয়ে যাওয়ায় তারজন্য অতিরিক্তি 'কাল' ও 'দিক্' নামক বিভু দ্রব্য স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। তাই তিনি বলেছেন - 'দিক্কালৌ নেশ্বরাদতিরিচ্যতে মানাভাবৎ'[১৬২]।

রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়-বৈশেষিক-স্বীকৃত 'মন'কেও অতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে – 'মনোঽপি চাসমবেতং ভূতম্'[১৬৩] অর্থাৎ মন অসমবেত-ভৌতিক-পরমাণু-মাত্র। তিনি মনে করেন জ্ঞানের-যৌগপদ্য বারণের জন্য এবং সুখাদির করণরূপে মন অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত একটি 'দ্রব্য' হিসাবে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন

---

[১৬২] ভট্টাচার্য, মধুসূদন (অনুদিত), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্*, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা – ৩।
[১৬৩] ঐ, পৃষ্ঠা – ৭।

নেই। কাজেই বহিরিন্দ্রিয় সকল যেমন ভৌতিক, তদনুরূপ মনও একটি ভৌতিক দ্রব্য। এখন আপত্তি হতে পারে, মনকে যদি অতিরিক্ত দ্রব্য বলে স্বীকার না করা হয়, তাকে অসমবেত-ভূতবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থাৎ পার্থিব, তৈজস, জলীয় এবং বায়বীয় পরমাণুকেই যদি মন বলা হয়, তা হলে একইক্ষণে অসমবেত-ভূতবিশেষরূপ বিভিন্ন মনের সঙ্গে একই ক্ষণে চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার ফলে, একই পুরুষের রূপ, রসাদির যুগপৎ চাক্ষুষ, রাসন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হবে। ফলত জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি হবে। এর উত্তরে রঘুনাথ বলেন – 'অদৃষ্টবিশেষোপগ্রহস্য নিয়ামকত্বাচ্চ নাতিপ্রসঙ্গ ইত্যাবয়োঃ সমানম্'[১৬৪]। মূল কথা হল চাক্ষুষ প্রভৃতি তৎ তৎ সাক্ষাৎকারের প্রতি জ্ঞাতার অদৃষ্ট বিশেষকে নিয়ামক হিসাবে কল্পনা করলে জ্ঞানের যৌগপদ্যের আপত্তি নিবারিত হয়ে যায়। এর জন্য মনকে অতিরিক্ত একটি দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

এইভাবে রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিকসম্মত নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পাঁচটি দ্রব্য স্বীকার করেন কারণ তাঁর মতে পৃথিব্যাদি এই পাঁচপ্রকার দ্রব্য স্বীকার করলেই সমস্ত ব্যবহার এবং অনুভবের উপপত্তি হয়ে যায়, তার জন্য অতিরিক্ত চারপ্রকার তথা আকাশ, কাল, দিক এবং মনকে দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। শুধু তাই নয় বৈশেষিকাচার্যগণস্বীকৃত পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, কোন স্থূল দ্রব্যের অবয়ব ধারাতে বিভক্ত করতে করতে পরিশেষে যে অবয়বে আমরা উপনীত হই অর্থাৎ অবয়ব ধারার যেখানে বিশ্রান্তি, তা হল ত্র্যণুক। পূর্বাচ্চার্যগণ মনে করেন, খোলা-জানালা হতে পতিত-কেন্দ্রীভূত-সূর্যকিরণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্মতম এবং সুস্থ্য চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় যে কণাটি তা হল ত্র্যণুক। এই ত্র্যণুক যেহেতু চক্ষু দ্বারা গৃহীত সেহেতু তা কার্য হবে, যেমন- ঘট। অনুমানের আকারটি হল - 'ত্র্যণুকং কার্যং চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ'। আর যা কার্য তা অবশ্যই নিজ পরিমাণ হতে স্বল্প-পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ তা সাবয়ব হয়ে থাকে। আর ত্র্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যটির অবয়ব হবে দ্ব্যণুক। ত্র্যণুকের অবয়বরূপে দ্ব্যণুক

---

১৬৪ ঐ, পৃষ্ঠা – ৭।

সিদ্ধ করার পর তাঁরা বলেন – 'ত্রসরেণোরবয়বং সাবয়বাং মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবৎ' অর্থাৎ মহত্ত্ব পরিমাণবিশিষ্ট ও ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব হয়, তেমনি মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট-ত্র্যণুকের জনক হওয়ায় ত্র্যণুকের-অবয়ব তথা দ্ব্যণুকও সাবয়ব হবে। আর দ্ব্যণুকের অবয়ব হল পরমাণু। এইভাবে প্রাচীন আচার্যগণ অতীন্দ্রিয় দ্ব্যণুক ও পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন। যদিও তাঁরা মনে করেন এই পরমাণু নিরবয়ব এবং নিরংশ। কারণ পরমাণুর যদি অবয়ব স্বীকার করা হয় তা হলে সেই অবয়বের অবয়ব এইভাবে চলতে থাকবে, ফলস্বরূপ একটি সর্ষপ এবং একটি মেরু পর্বতের মধ্যে যে পরিমাণের পার্থক্য তাকে ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাই তাঁদের মতে কোন বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে আমরা যেখানে পৌঁছাব, যাকে আর ভাঙা যাবে না, দ্রব্যের এমন অবিভাজ্য অংশই হল পরমাণু।

এখানেই রঘুনাথ শিরোমণি আপত্তি করে বলেছেন যে – একটি বস্তুকে বিভক্ত করতে করতে যেখানে পৌঁছাবো তা হল ত্র্যণুক বা ত্রুটি। যেহেতু পরমাণু বা দ্ব্যণুকের অস্তিত্বে কোন সাধক প্রমাণ নেই। যে অনুমানের সাহায্যে বৈশেষিকাচার্যগণ পরমাণু কিংবা দ্ব্যণুকের অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন তা ঠিক নয়। কারণ চাক্ষুষ দ্রব্য হলে অবশ্যই তা সাবয়ব হবে কিংবা মহৎ দ্রব্যের অবয়ব হলেই তা সাবয়ব হবেই এমন কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ঘট মহৎ দ্রব্য , তা সাবয়ব। ঘটের অবয়ব কপাল, মহৎদ্রব্য তাও সাবয়ব। কপালের অবয়বপিণ্ড মহৎ, তাই তারও অবয়ব দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ত্রসরেণু মহৎ দ্রব্য তাই তা সাবয়ব যেমন- ঘট, ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক; মহৎ দ্রব্যের অবয়বও ঘটাবয়ব কপালের ন্যায় সাবয়ব। মহৎ দ্রব্য ত্রসরেণুর অবয়বের (দ্ব্যণুকের) অবয়ব যে পরমাণু তাও কপালের অবয়ব পিণ্ডের ন্যায় সাবয়ব হবে। এইভাবে অবয়বের অবয়ব এবং তার অবয়ব এইভাবে অনুমান করা যেতে পারে। এস্থলে ব্যভিচারশঙ্কা-নিবর্তক কোন তর্ক না থাকায় ত্রসরেণুর অবয়ব স্বীকার করা যায় না। কাজেই রঘুনাথ শিরোমণির মতে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগোচর দ্ব্যণুকই হল সাবয়ব দ্রব্যের চরম অবয়ব।

তাই পরমাণু কিংবা দ্ব্যণুক স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। তাঁর মতে চাক্ষুষ ত্র্যণুক হতেই সকল জাগতিক বিষয়সমূহের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

রঘুনাথ শিরোমণি অনুদ্ভুত রূপ-রসাদি গুণের অস্তিত্বও খণ্ডন করেছেন। বৈশেষিকমতে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের ঘটের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, যেহেতু ঘটের যে রূপ তা উদ্ভুত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণেরযোগ্য। কিন্তু চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তা আমাদের প্রত্যক্ষের-বিষয় হয় না। কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যে রূপ তা উদ্ভুত নয়। যদিও রঘুনাথ শিরোমণি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য রূপ-রসাদি গুণ স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে, অতীন্দ্রিয় রূপরসাদি গুণ যদি স্বীকার করা হয় তা হলে 'বায়ুতে রূপাভাব' এর যে প্রতীতি তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। অভিপ্রায় এই যে, ঘরে ঘট থাকলে চক্ষু দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এখন ঘরে যদি ঘট না থাকে তা হলে ঘটের অভাবের প্রত্যক্ষ হবে। কিন্তু পিশাচাদির অভাবের প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। যেহেতু এই অভাবের প্রতিযোগী পিশাচাদি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। কাজেই অভাবের প্রতিযোগীকে প্রত্যক্ষ-যোগ্যবস্তু হতে হবে। কিন্তু 'বায়ুতে রূপাভাব' স্থলে প্রতিযোগী হল সমস্তপ্রকার রূপ। বৈশেষিকমতে, এই রূপের কতগুলি প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় (উদ্ভুত)। আর কতকগুলি প্রত্যক্ষের অযোগ্য (অনুদ্ভুত)। এমন প্রত্যক্ষের অযোগ্য অতীন্দ্রিয় রূপাদি স্বীকৃত হলে, পিশাচাদি অতীন্দ্রিয় হওয়ায় যেমন পিশাচাদির অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, তদনুরূপ বায়ুতে রূপাভাবেরও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অথচ এমন অনুভব আমাদের সর্বজনসিদ্ধ। তাই অতীন্দ্রিয় তথা প্রত্যক্ষের অযোগ্য রূপাদি গুণের অস্তিত্ব রঘুনাথ শিরোমণি স্বীকারই করেন না।

বৈশেষিকাচার্যগণ 'এটা হতে ওটা পৃথক' এরূপ প্রতীতির অসাধারণ কারণ হিসাবে 'পৃথক্ত্ব' নামক একটি গুণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির মতে, প্রদত্তস্থলে অন্যোন্যাভাবের দ্বারাই উক্ত প্রতীতির উপপত্তি হয়ে যায়। 'পৃথক্ত্ব' নামক কোন গুণান্তর স্বীকারের প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, 'ঘট পট হতে পৃথক' আর 'ঘট পট হতে ভিন্ন' এই দুটি কথার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। কাজেই পৃথক্ত্ব অন্যোন্যাভাবমাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি পরত্ব ও অপরত্বকেও গুণান্তর হিসাবে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে,

এই দু'টি সংযোগ নামক গুণেরই অন্তর্গত। বহুতর-সংযুক্ত-সংযোগ হল দৈশিক পরত্ব, আর দৈশিক অপরত্ব হল সন্নিকৃষ্টত্ব অর্থাৎ অল্পতর-সংযুক্ত-সংযোগ। আর কালিক পরত্ব হল পূর্বকাল-সংযোগ, কালিক অপরত্ব হল উত্তরকাল-সংযোগ। মূল কথা হল, দৈশিক পরত্ব বলতে বোঝায় দূরত্ব আর দৈশিক অপরত্ব বলতে বোঝায় নৈকট্য। কালিক পরত্ব বলতে জেষ্ঠত্ব অর্থাৎ যে পূর্বে জন্মেছে আর অপরত্ব বলতে বোঝায় কনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ যে পরে জন্মেছে। তাই রঘুনাথ শিরোমণির মতে, পরত্ব, অপরত্ব নামক অতিরিক্ত গুণ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই।

ঈশ্বরগত-পরিমাণ বিষয়েও তিনি প্রচলিত বৈশেষিকমতের বিরোধিতা করেছেন। বৈশেষিকমতে ঈশ্বর হলেন পরম-মহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি বিভু। ঈশ্বরকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলা যায় না। কারণ ঈশ্বর অণু হলে তাঁর সর্বব্যাপকত্ব ব্যাহত হবে। আবার ঈশ্বরকে মধ্যম তথা দেহ-পরিমাণবিশিষ্টও বলা যায় না। কারণ ঈশ্বরকে দেহ-পরিমাণবিশিষ্ট বলা হলে তা অনিত্য হয়ে পড়বে। কিন্তু ঈশ্বরকে বৈশেষিকদর্শনে নিত্য এবং বিভু বলা হয়েছে। ঈশ্বর বিভুত্বপরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায় মূর্তদ্রব্যমাত্রের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগরূপসম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ ঈশ্বরকে পরমমহৎ-পরিমাণবিশিষ্ট বলেছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির মতে ঈশ্বরের বিভুত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাঁর কোনও প্রকার পরিমাণ কল্পনার আবশ্যকতা নেই। কারণ ঈশ্বরে কোনও প্রকার পরিমাণ স্বীকার না করেও সর্বমূর্তসংযোগিত্ব স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর বিভুত্বের উপপত্তি হয়ে যায়। তাই তারজন্য ঈশ্বরগত পরিমাণ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

বৈশেষিকসম্মত সপ্তম পদার্থ হল বিশেষ। বৈশেষিক আচার্যগণ সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষ নামক অতিরিক্ত একটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। অভিপ্রায় এই যে, ঘট, পটাদি বস্তু যে পরস্পর হতে ভিন্ন তা তাদের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু সজাতীয় দুটি নিত্য-পরমাণুর মধ্যে ভেদ কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে? অবয়বাদির দ্বারা তাদের ভেদ নিরূপণ সম্ভবপর হয়না যেহেতু, পরমাণু নিরবয়ব এবং অতীন্দ্রিয়। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ভেদ আছে তা অবশ্যস্বীকার্য। কাজেই

একটা ভেদকধর্ম অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আর তা হল বিশেষ। এই বিশেষ নামক পদার্থটি প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে বৃত্তি থেকে এক নিত্য দ্রব্য হতে অপরাপর নিত্য দ্রব্যকে ব্যবৃত্ত করে। নিত্য দ্রব্যে বৃত্তি হওয়ায় বৈশেষিকদর্শনে বিশেষকে নিত্য বলা হয়েছে।

কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন, দুটি সমানগুণধর্মবিশিষ্ট সজাতীয় নিত্য পরমাণুর মধ্যে ভেদসাধনের নিমিত্ত বিশেষ নামক পদার্থান্তর স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। অভিপ্রায় এই যে, দুটি নিত্য দ্রব্যের মধ্যে ভেদসাধক হিসাবে বিশেষ স্বীকৃত হলেও, দুটি বিশেষের মধ্যে যে ভেদ তার নিরূপণ কীভাবে হবে? যদিও এর উত্তর প্রাচীন আচার্যগণ বলেছেন- বিশেষ হল একটি স্বতোব্যাবর্তকধর্ম। মূলকথা হল বিশেষ নিত্যদ্রব্যের ভেদসাধক হলেও তাদের ভেদসাধক হিসাবে কোন ধর্ম স্বীকৃত নয়। কারণ বিশেষ হল স্বতঃব্যাবর্তক। তা নিত্য দ্রব্যসমূহকে ব্যাবৃত্ত করার সাথে সাথে অন্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষ হতে নিজেকেও ব্যাবৃত্ত করে। এখানেই রঘুনাথ শিরোমণি আপত্তি করে বলেছেন যে, প্রাচীন আচার্যগণ বিশেষকে স্বতঃব্যাবর্তক বলেছেন, এর পরিবর্তে নিত্যদ্রব্যসমূহকে যদি স্বতঃব্যাবর্তক বলা হয় তা হলে আর বিশেষ স্বীকারের কোন আবশ্যকতা থাকে না। এখানে প্রশস্তপাদাচার্য প্রমুখ আপত্তি করে বলেছেন – যদিও নিত্যদ্রব্যগত বিশেষ পদার্থটি আমাদের মত সসীম জীবের প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তথাপি যারা যোগী তাঁরা যোগজ শক্তি বলে নিত্যপরমাণু, আকাশ প্রভৃতির ন্যায় তদ্‌গত যে বিশেষ পদার্থ তার প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কাজেই যা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এরূপ আপত্তির উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন- – 'এবং তর্হি ত এব সশপথং পৃচ্ছ্যন্তাং কিমেতেঽতিরিক্তং বিশেষমীক্ষন্তে ন বেতি'[১৬৫]। অর্থাৎ প্রদত্তস্থলে যোগীগণকে যদি শপথপূর্বক জিজ্ঞাসা করা হয় তা হলে বোঝা যাবে বিশেষ নামক পদার্থটি হয়তো তাঁদেরও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। মূল কথা হল রঘুনাথ শিরোমণির মতে, দ্রব্যাদি অতিরিক্ত বিশেষ নামক পদার্থান্তর স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই।

বৈশেষিকমতে, রূপ, রসাদি গুণগুলি হল ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। তারা যে আশ্রয়ে থাকে সেই আশ্রয়ে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাই যে আশ্রয়ে রূপাদি থাকে সে আশ্রয়ে রূপাদির অভাব

[১৬৫] ঐ পৃষ্ঠা – ২০।

থাকতে পারে না। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি রূপ রসাদি গুণকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলেন না। তাঁর যুক্তি হল – রূপাদি গুণসমূহ যদি ব্যাপ্যবৃত্তি হত, তা হলে একটা প্রাণীর শরীরে একটি রূপ ব্যাপ্ত হয়ে থাকতো। কিন্তু আমরা গোরু, ছাগল এমন অনেক প্রাণীই দেখতে পাই, যাদের মুখের দিকটা কালো, সমগ্র শরীর সাদা আবার লেজের দিকটা লাল। কাজেই স্বীকার করতে হয় রূপাদি গুণগুলি অব্যাপ্যবৃত্তি।

আর রূপাদি গুণসমূহকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হলে বৈশেষিকসম্মত চিত্ররূপকে আর অতিরিক্ত রূপ হিসাবে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই থাকে না। কারণ বৈশেষিকমতে একটি বস্ত্র লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি তন্তু দ্বারা নির্মিত হতে পারে। কাজেই ঐ বস্ত্রের প্রতি লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি তন্তুসমূহ হবে সমবায়িকারণ। আর বস্ত্রের রূপের প্রতি তন্তুরূপ হবে অসমবায়িকারণ। কিন্তু যেখানে লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি তন্তু দ্বারা বস্ত্রটি নির্মিত সেখানে বস্ত্রের রূপটি কি হবে? কোন একটিকে বস্ত্রের রূপ বলা যাবেনা। যেহেতু নানা বর্ণের সমাবেশে পরিলক্ষিত। আবার সবগুলিকে বস্ত্রের রূপের প্রতি কারণ বলা যাবেনা, যেহেতু রূপাদি হল ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। কাজেই একটি রূপ ব্যাপ্ত করে থাকলে অপররূপ থাকতে পারবে না। আর বস্ত্রটি যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সেহেতু স্বীকার করতে হবে তার একটি রূপ অবশ্য রয়েছে। যাকে বৈশেষিক আচার্য্যগণ চিত্ররূপ নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি যেহেতু রূপ, রসাদিকে ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ হিসাবে স্বীকার করেন না সেহেতু তিনি মনে করেন চিত্ররূপকে অতিরিক্ত একটি রূপ হিসাবে স্বীকারের কোন আবশ্যকতা নেই। তাঁর মতে, অবয়বের রূপই অবয়বীর রূপের কারণ। আমরা অনেক পশুর মুখের দিকে এক বর্ণ, লেজের দিকে এক বর্ণ, খুরের দিকে এক বর্ণ অর্থাৎ নানারূপ বিশিষ্ট পশুর প্রত্যক্ষ আমাদের হয়ে থাকে। কাজেই চিত্ররূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। রূপের ন্যায় রসও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়ে থাকে। আমরা অনেকসময় আমের উপরিভাগ অম্ল এবং অভ্যন্তরভাগ মিষ্টি এরূপ আস্বাদন করে থাকি। আবার কোন বস্তুর এক অংশের কাঠিন্য অপর অংশে কোমল - এমন প্রত্যক্ষও আমাদের হয়। কাজেই রূপের ন্যায় রসও অব্যাপ্যবৃত্তি।

বৈশেষিক আচার্য্যগণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম - এই ত্রিবিধ পদার্থে সত্তা নামে একটি জাতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি সত্তা জাতির অস্তিত্ব খণ্ডন করেন। কারণ তাঁর মতে, কোন পদার্থ প্রমাণ সাপেক্ষেই সিদ্ধ হয়। কিন্তু সত্তা জাতির অস্তিত্বের সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অভিপ্রায় এই যে, সত্তাজাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, কারণ সত্তাজাতি যে যে আশ্রয়ে থাকে সেই সেই আশ্রয়গুলির মধ্যে অনেকগুলি অতীন্দ্রিয়। যেমনঃ বৈশেষিকমতে, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা প্রভৃতি দ্রব্য অতীন্দ্রিয়। কাজেই অতীন্দ্রিয় দ্রব্যে আশ্রিত যে সত্তা জাতি তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হতে পারে না। এখন বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলতে পারেন সত্তা জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হলেও 'দ্রব্যং সৎ', 'গুণঃ সন্', 'কর্মঃ সৎ' ইত্যাদি প্রতীতির কারণরূপে সত্তাজাতিকে অনুমান করা যায়। এর উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণির যুক্তি হল - 'দ্রব্যং সৎ', 'গুণঃ সন্', 'কর্মঃ সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি যেমন আমাদের হয় তদনুরূপ 'সামান্যং সৎ', বিশেষঃ সন্', 'সমবায়ঃ সন্' এরূপ প্রতীতিও আমাদের হয়ে থাকে। তা হলে দ্রব্যাদি তিনটি দ্রব্যকে সত্তার আশ্রয় হিসাবে স্বীকার না করে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ষট্ পদার্থকে সত্তার আশ্রয় বলতে হবে। কিন্তু এমন স্বীকার করা হলে আর সত্তাকে জাতি বলা যাবে না। কারণ বৈশেষিকমতে, সামান্যাদিতে জাতি থাকে না। কাজেই সত্তা জাতি নয়, তা বর্তমানত্বমাত্র। যে বস্তু বিদ্যমান সেটিই সদ্ব্যবহারের বিষয় হয়ে থাকে।

রঘুনাথ শিরোমণি প্রাচীন বৈশেষিকসম্মত বহু পদার্থ যেমন খণ্ডন করেছেন তেমনই মহর্ষিসম্মত সপ্তপদার্থ অতিরিক্ত সংখ্যা, ক্ষণ, স্বত্ব, শক্তি প্রভৃতিকেও অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। মহর্ষি কণাদের মতে, সংখ্যা চতুর্বিংশতি গুণের মধ্যে এক প্রকার। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি সংখ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর মতে, সংখ্যা যদি গুণের অন্তর্ভুক্ত হত তা হলে গুণাদিতে সংখ্যার প্রতীতি হতে পারত না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে 'একটি রূপ', 'দু'টি রূপ' এমন প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে। এই প্রতীতিকে ভ্রমও বলা যাবে না। কারণ শুক্তিতে রজত ভ্রম হওয়ার পরক্ষণে 'এটি রজত নয়' এরূপ বাধক প্রতীতি আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু 'একটি রূপ', 'দুইটি রূপ'

এরূপ জ্ঞানের পর আমাদের কোনোরূপ বাধক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে সংখ্যা গুণপদার্থ নয়। তা দ্রব্যাদির ন্যায় অতিরিক্ত একটি পদার্থ।

বৈশেষিক মতে কাল স্বরূপত এক ও অখণ্ড। কিন্তু উপাধিভেদে তাতে ক্ষণ, লব, নিমেষ, মুহূর্ত, যাম, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন কর্মই এই ক্ষণ আদি ব্যবহারের হেতু হয়। অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকমতে কর্ম বা ক্রিয়া হল ক্ষণচতুষ্টয়স্থায়ী। যে ক্ষণে কর্মটি উৎপন্ন হয় সেখান থেকে আরম্ভ করে চতুর্থক্ষণ পর্যন্ত কর্ম থাকে, পঞ্চমক্ষণে তা বিনষ্ট হয়। প্রথমক্ষণে কর্মের উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে পূর্ব-সংযুক্ত দ্রব্যের সঙ্গে বিভাগ হয়, তৃতীয়ক্ষণে পূর্ব-সংযোগ নাশ, চতুর্থক্ষণে উত্তর-সংযোগের উৎপত্তি এবং পঞ্চমক্ষণে কর্মের নাশ হয়। তাই তাঁদের মতে বিভাগ-প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কর্মই হল ক্ষণ ব্যবহারের হেতু। অর্থাৎ বিভাগ-প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন-কর্মবিশিষ্ট কালই হল ক্ষণপদবাচ্য।

রঘুনাথ শিরোমণি বৈশেষিকাচার্যগণ সমর্থিত উক্ত ক্ষণ-প্রক্রিয়া সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেন বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট যে কর্ম, তা ক্ষণ ব্যবহারের হেতু হতে পারে না। কারণ সংসারে ক্রিয়া এক নয়; অনবরত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়ে চলেছে। কাজেই কোন একটি ক্রিয়ার পরবর্তী যে ক্রিয়ান্তর, তজ্জনিত যে বিভাগ; ঐ বিভাগের যে প্রাগভাব তা অনাদি হওয়ায় বিভাগ উৎপন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত সকল ক্রিয়াতে থাকে। এমতাবস্থায় ঐ বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট চতুঃক্ষণস্থায়ী ক্রিয়াটিও হবে। ফলত ঐ পূর্বকালীন ক্রিয়াতে ক্ষণের লক্ষণ প্রযুক্ত হয়ে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষের আপত্তি হবে। এখন যদি বলা হয়, ক্রিয়াজন্য যে বিভাগটি উৎপন্ন হবে সেই বিভাগবিশিষ্ট যে ক্রিয়াটি, সেটিই হবে ক্ষণরূপ কালোপাধি। কাজেই বলতে হবে – স্বজন্য বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট তৎ কর্মই হল ক্ষণ ব্যবহারের হেতু। এখানেই রঘুনাথ আপত্তি করে বলেছেন – এভাবে যদি পৃথক পৃথক ক্রিয়াব্যক্তিকে অবলম্বন করে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষণের লক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে লক্ষণ প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাছাড়া বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে ক্ষণ নিরূপণ করা হলে ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ার পর উক্তক্রিয়াজনিত বিভাগ যখন উৎপন্ন হবে সেই বিভাগ-কাল তাদৃশ

প্রাগভাববিশিষ্ট না হওয়ায়, তাতে ক্ষণ ব্যবহার সম্ভব হবে না। কিন্তু আমরা এমন ব্যবহার প্রায় করে থাকি – কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হলে তার পরক্ষণে একটি বিভাগরূপ কার্য উৎপন্ন করে'। তাই তিনি কালের উপাধিরূপে ক্ষণকে অতিরিক্ত একটি পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। *'পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্'* গ্রন্থে তিনি বলেছেন – 'ক্ষণশ্চ ক্ষণিকোতিরিক্তঃ কালোপাধিঃ'[১৬৬]। এই ক্ষণ পদার্থকে বিষয় করেই আমাদের ক্ষণ প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ক্ষণ পদার্থ ক্ষণিক অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণমাত্রস্থায়ী। কারণ ক্ষণকে যদি ক্ষণিক না বলা হত, তাহলে ঘটের প্রাগভাব ক্ষণেও 'ইদানীং ঘটঃ' এরূপ ব্যবহারের আপত্তি হত।

রঘুনাথ শিরোমণি স্বত্বকেও দ্রবাদি অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক মতে 'চৈত্রস্য ধনম্' – এই স্থলে যে স্বত্বসম্বন্ধ ধন প্রভৃতিতে প্রতীয়মান, তা কোন পদার্থান্তর নয়, তা স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। 'চৈত্র্যস্য ধনম্' এখানে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ চৈত্রের ধন – এখানে স্বত্বরূপ যে সম্বন্ধ তা ধনস্বরূপ। তাঁদের মতে ইচ্ছানুরূপ বিনিয়োগ যোগ্যত্বই হল স্বত্ব। এখানেই রঘুনাথ শিরোমণি আপত্তি করে বলেছেন – ইচ্ছানুরূপ-বিনিয়োগ-যোগ্যত্ব বলতে আচার্যগণ কি বোঝাতে চেয়েছেন? ইচ্ছানুসারে ভক্ষণযোগ্যত্বকে কি বিনিয়োগযোগ্যত্ব বলা যেতে পারে? তা যদি হয় তা হলে আপত্তি হবে পরের অন্ন ভোজনের যোগ্যতা যদি কোন ব্যক্তির থাকে, তাহলে কি বলা যাবে অপরের অন্ন প্রভৃতিতে ঐ পুরুষের স্বত্ব আছে? যদি বলা হয় অন্যের অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কাজেই অন্নপ্রভৃতি ভোজনের যোগ্যত্বকে স্বত্ব বলা যাবে না। রঘুনাথের মতে স্বত্ব পদার্থটিকে না জানলে শাস্ত্রে যে স্বত্ব বিষয়ে উক্ত নিষেধ আছে, তা বোধগম্য হবে না। কাজেই স্বত্বকে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে। এই অভিপ্রায়েই তিনি বলেছেন – 'এবং স্বত্বমপি পদার্থান্তরম্'[১৬৭]।

রঘুনাথ শিরোমণিরমতে গুণ প্রভৃতি যেমন তার আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়; তদনুরূপ অভাবও তার অধিকরণে কোন একটি সম্বন্ধে বৃত্তি হবে। রঘুনাথ তাকে বৈশিষ্ট্য

---

[১৬৬] ঐ, পৃষ্ঠা – ৫২।
[১৬৭] ঐ, পৃষ্ঠা – ৫৫।

বলেছেন। যদিও বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন অভাব তার অধিকরণে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু তিনি এস্থলে আপত্তি করে বলেছেন – যদি স্বীকার করা হয় অভাব তার আশ্রয়ে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে, তাহলে এটাও স্বীকার করতে হবে রূপাদি গুণসমূহও তার আশ্রয়-দ্রব্যে স্বরূপসম্বন্ধে থাকবে।

রঘুনাথ শিরোমণি শক্তিকেও অতিরিক্ত একটি পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর যুক্তি হল – তৃণে ফুৎকার দিলে, অরণী-মন্থন করলে কিংবা মণিতে রবিকিরণ প্রতিফলিত হলে অগ্নির উৎপত্তি হয়ে থাকে। কাজেই তৃণ-ফুৎকার, অরণী-নির্মন্থন, মণি-রবিবিকিরণ প্রভৃতি হল অগ্নির কারণ। এই তিনটিকে একত্রে অগ্নির কারণ বলা যাবে না। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যাতিরেক ব্যাভিচার দেখা দেবে। কারণ আমরা জানি যার অভাবে যার উৎপত্তি হয় তাকে তার কারণ বলা যায় না। প্রদত্তস্থলে তৃণ-ফুৎকার, অরণী-নির্মন্থন এবং মণি-রবিবিকিরণ – এই তিনটি স্বতন্ত্রভাবেই বহ্নির কারণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তৃণ-ফুৎকার, অরণী-নির্মন্থন, মণি-রবিবিকিরণ প্রভৃতিতে রয়েছে যে বহ্নি-কারণতা, তার অবচ্ছেদকধর্মটি কে হবে? বিনিগমনা না থাকায় বহ্নি সামান্যের প্রতি তিনটি কারণতার অবচ্ছেদক মানতে হবে, কিন্তু তাতে গৌরব অনিবার্য। তদপেক্ষা অগ্নির কারণতার অবচ্ছেদকরূপে উক্ত তিনটি কারণে অগ্নি-উৎপাদিকা এক শক্তি স্বীকার করাতেই লাঘব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশেষিক-দর্শনে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়

নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই জগতের সৃষ্টি রহস্য সত্যই বিস্ময়কর। আমরা যদি মানব সভ্যতার আদিম পর্বে ফিরে তাকাই, তা হলে দেখতে পাব একটা সময় ছিল যখন মানুষের না ছিল খাদ্যের নিশ্চয়তা; না ছিল বাসস্থানের নিশ্চয়তা, তাঁরা অরণ্যে বিচরণ করতেন। জীবনরক্ষার তাগিদে তাঁদের প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হত। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যখন তাঁরা জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করতে শিখে গেলেন, তখনই তাঁদের শুরু হল নিজের বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে লড়াই। সে কে? কোথা হতে এল? এই বৈচিত্রে ভরা জগতের সৃষ্টি হল কীভাবে? কে সৃষ্টি করলেন এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে? এই জগৎ এর শেষ কোথায়? মহাপ্রলয় বলে কি কিছু আছে? এমন হাজার প্রশ্নের সম্মুখে মানুষ নিজেকে দাঁড় করিয়েছে এবং নিজ নিজ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তার উত্তর আনুসন্ধনে ব্যাপৃত থেকেছে।

বৈশেষিকমতে আমাদের পরিদৃশ্যমান এই জগৎ-সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়েই বিবর্তিত হয়। আজকে আমাদের এই জগৎ বিদ্যমান; তার সৃষ্টির পূর্বে তৎপূর্বতন সৃষ্টির প্রলয় হয়েছিল। প্রলয়ের পর সৃষ্টি আবার প্রলয় তারপর সৃষ্টি এভাবে নিরন্তর ধারা বয়ে চলেছে। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ জগৎকে অনাদি বলেছেন। কারণ তাঁদের মতে বর্তমানে আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি তার আদি নির্ণয় করা আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে সম্ভবই নয়। তবে তা অনন্ত নয়। তাঁদের মতে সকল জীবের সকল কর্মের ফলভোগের যুগপৎ পরিসমাপ্তি যেদিন ঘটবে, সেদিন আসবে মহাপ্রলয়। প্রশস্তপাদাচার্য, আচার্য উদয়ন প্রমুখ হলেন এই মতের সমর্থক। যদিও কোনও কোনও আচার্য, যেমন – মীমাংসক কুমারিলভট্ট মনে করেন সকল জীবের সকল কর্মের ফলভোগ এর যুগপৎ পরিসমাপ্তি কখনওই সম্ভব নয়। কারণ জীব অনন্ত, তাই তার কর্মও অনন্ত। তাই সকল জীবের সকল কর্মের যুগপৎ বিনাশ কখনওই সম্ভব নয়। কাজেই মহাপ্রলয়ের

কল্পনা অর্থহীন। যদিও বৈশেষিক-আচার্যগণ মনে করেন আমাদের এই জগৎ-সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছে। ‘ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ’ অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্বের সৃষ্টির ন্যায় এই সৃষ্টির রচনা করেছেন - এই শ্রুতি বাক্যই সে বিষয়ে প্রমাণ। বর্তমান অধ্যায়ে আমি মূলত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অবস্থাতে পদার্থের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করব। অভিপ্রায় এই যে, পদার্থের কীরূপ তারতম্যের ফলে জগৎ-সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা অনুসন্ধান করা আমার এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের আলোচনায় বৈশেষিক-সম্মত পদার্থসমূহের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে হলে সর্বাগ্রে বৈশেষিক-সম্মত সৃষ্টি ও প্রলয় ক্রমটির আলোচনা করা আবশ্যক। তাই এখন বৈশেষিকাচার্যগণ-বর্ণিত জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রমটি আলোচনা করা হচ্ছে - বৈশেষিকাচার্যগণ সৃষ্টিমাত্রকে প্রলয়পূর্বক বলেছেন। তাঁদের মতে বর্তমানে যে সৃষ্টি রয়েছে তার পূর্বে পূর্বতন সৃষ্টির প্রলয় হয়েছিল। আবার সেই প্রলয়ের যে পূর্বতন সৃষ্টি তার পূর্বে আরেক প্রলয় ছিল। কাজেই সৃষ্টির ধারণাটিকে বুঝতে গেলে প্রথমে প্রলয়ের ধারণাটি বিষয়ে অবগত হতে হবে। বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ তাই তাঁর *‘পদার্থধর্মসংগ্রহ’* গ্রন্থের সৃষ্টি-সংহার প্রকরণে বলেছেন - ‘ব্রাহ্মেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রহ্মণোঽপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং...পূর্বস্য পূর্বস্য বিনাশঃ ততঃ প্রবিভক্তাঃ পরমাণবোঽবতিষ্ঠন্তে ধর্মাধর্মসংস্কারানুবিদ্ধা আত্মানস্তাবন্তমেব কালম্’[১৬৮]। অভিপ্রায় এই যে, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব সারাদিনের ক্লান্তি থেকে কিছু সময়ের জন্য নিষ্কৃতির নিমিত্ত রাত্রিকালে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে। ঠিক তেমনই জীব পূর্বজন্মে কৃত-কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জন্ম তারপর মৃত্যু আবার জন্ম এভাবে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে বারংবার আবর্তিত হতে হতে একটা সময় অসহায় বোধ করে এবং তা থেকে আপাত নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণে একশত বৎসর শেষে

[১৬৮] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

যখন তাঁর বিদেহ মুক্তিলাভের সময় উপস্থিত হয় এবং দীর্ঘ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত জীব কিছুকাল সংসার চক্র থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন মহেশ্বর (পরমেশ্বর) জীবকুলকে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সমস্ত জগতের তথা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল – এই সপ্ত অধঃলোক এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, অপঃ ও সত্য – এই সপ্ত ঊর্দ্ধ্বলোকের সংহারের ইচ্ছা করেন। পরমেশ্বরের সংহারেচ্ছা উপস্থিত হলে মহাপ্রলয়ের কারণীভূত অদৃষ্টের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, মহাভূতের উৎপাদক অদৃষ্ট সকলের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, পৃথীব্যাদি চতুর্বিধ মহাভূতের প্রত্যেক কার্যদ্রব্যের পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে উক্ত ক্রিয়ার ফলে পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ উৎপন্ন হয়। ফলত পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে অসমবায়ি কারণের নাশে প্রথম উৎপন্ন কার্য দ্রব্য দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়। দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুক বিনষ্ট হয়। ত্র্যণুক (ত্রসরেণু) বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত চতুরণুকের বিনাশ ঘটে। এভাবে ক্রমে ক্রমে পৃথিব্যাদি স্থূল কার্যদ্রব্য সমূহ বিনষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ্য যে কার্যদ্রব্য বিনাশ প্রক্রিয়া বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোনও কোনও আচার্যয়গণ মনে করেন কার্যদ্রব্যের নাশ দু'ভাবে হতে পারে। কখনও সমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়; আবার কখনও অসমবায়ি কারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়। যেমন, ঘট প্রভৃতি জন্য দ্রব্যের নাশের প্রতি তার সমবায়িকারণ তথা কপালের নাশ কারণ হয়ে থাকে। যেহেতু মুদ্গার প্রভৃতির আঘাতে ঘটের সমবায়িকারণ তথা কপাল বিনষ্ট হলে ঘট বিনষ্ট হতে দেখা যায়। তবে দ্ব্যণুকের নাশে তার সমবায়ি কারণের তথা পরমাণুর নাশকে কারণ বলা যাবে না। যেহেতু দ্ব্যণুকরূপ কার্যের সমবায়িকারণ হয় দু'টি পরমাণু। আর বৈশেষিকমতে পরমাণু নিত্য। তাই তার উৎপত্তি নেই; বিনাশও নেই। এহেতু দ্ব্যণুকের নাশের প্রতি অসমবায়ি কারণের নাশ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশকে কারণ বলতে হবে। যদিও অনেক নব্য নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন- দ্ব্যণুকরূপ প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতি অসমবায়ি কারণের নাশ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশকে কারণ আবার ত্র্যণুকাদি হতে শুরু করে যাবৎ

জন্য পদার্থের নাশের প্রতি তাদের স্ব স্ব সমবায়িকারণের নাশকে কারণ না বলে; সকল জন্য দ্রব্যের নাশের প্রতি স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ বলা অধিক সঙ্গত হয়। কারণ কোনও কোনও জন্য দ্রব্যের নাশকে ব্যাখ্যা করতে অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ আবার কোনও কোনও জন্য দ্রব্যের নাশকে ব্যাখ্যা করতে সমবায়ি কারণের নাশকে কারণ বলাতে গৌরব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তদপেক্ষা সকল জন্য দ্রব্যের নাশ যেহেতু স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় সেহেতু সকল জন্য দ্রব্যের নাশের ব্যাখ্যা একটি প্রক্রিয়াতে দিলে লাঘব হয়। দ্ব্যণুকাদি প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতি যেমন তার অসমবায়িকারণ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। তদনুরূপ ত্র্যণুক প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতিও তার অসমবায়িকারণ তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। এভাবে ঘটাদি স্থূল কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতিও তার অসমবায়িকারণ তথা কপালদ্বয়ের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। তাই অনেক নব্য আচার্য এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণও জন্য দ্রব্যমাত্র নাশের প্রতি স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ মেনেছেন। যাই হোক বৈশেষিকমতে পরমেশ্বরের সংহারেচ্ছায় পরমাণু-সমূহ সক্রিয় হলে তাতে বিভাগ উৎপন্ন হয়। পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ উৎপন্ন হলে তাদের যে পূর্ব সংযোগ তা বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়। দ্ব্যণুকের নাশে ত্র্যণুক, ত্র্যণুকের নাশে চতুরণুক এভাবে ক্রমান্বয়ে স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্তুল তেজ, স্থূল বায়ু হতে শুরু করে সমস্ত কার্যদ্রব্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কার্যদ্রব্য বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত রূপাদি গুণসমূহও বিনষ্ট হয়। এভাবে বৈচিত্র্যময় এই জগৎ ও জগৎএর যাবতীয় বস্তুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রলয়কালে সমস্ত কার্যদ্রব্য বিনষ্ট হলেও নিত্য দ্রব্যসমূহ তথা প্রচয় নামক সংযোগ রহিত পরমাণু সকল, আত্মা সকল, দিক্, কাল, আকাশ, মন, ঈশ্বর, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রযত্ন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। শুধু তাই নয়, ধর্ম-অধর্মরূপ যে অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার নিত্য না হলেও প্রলয়ের পর বিদ্যমান থাকে। কারণ তা না হলে প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হবে সেখানে জীবগণের প্রতিনিয়ত যে ভোগ ব্যবস্থা

তা সিদ্ধ হবে না। অভিপ্রায় এই যে শাস্ত্রে বলা আছে প্রতিটি জীবাত্মার ভোগ নিয়ত। এক আত্মার ভোগ অন্য আত্মাতে প্রযুক্ত হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতি জীবাত্মার সঙ্গে সম্বদ্ধ ধর্ম-অধর্ম, সংস্কার প্রভৃতির বিদ্যমানতা প্রলয়কালেও অবশ্য স্বীকার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উদয়নাচার্য বলেছেন নিত্য পরমাণু, নিত্য আত্মা এবং তার সঙ্গে সম্বদ্ধ ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার ছাড়াও যে সকল পদার্থ নিত্য যেমন দিক্, কাল, আকাশ, মনঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রযত্ন প্রভৃতি এবং পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণও মহাপ্রলয়ে বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়াও কালের অবচ্ছেদক উপাধিস্বরূপ মহাভূতের সংক্ষোভ জনিত যে বেগ সেই বেগজন্য কর্মসমূহও বিদ্যমান থাকে। তা না হলে কালের অবচ্ছেদক ব্যতীত পুনরায় সৃষ্টি হতে পারবে না। সুতরাং বৈশেষিকমতে জন্ম হতে জন্মান্তরে দীর্ঘকাল ধরে জন্ম ও মৃত্যু জনিত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে করতে ক্লান্ত জীবকুলকে আপাত-বিশ্রাম প্রদানের নিমিত্ত পরম করুণাময় ঈশ্বর জগৎ-সংহারের ইচ্ছা করেন। ফলস্বরূপ প্রত্যেক কার্যদ্রব্যের পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যার ফলে পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ হয়। এই বিভাগের দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের মধ্যেকার সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়ে যায়। আর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুক বিনষ্ট হয়ে যায়। ত্র্যণুক বিনষ্ট হলে ত্র্যণুকে আশ্রিত চতুরণুক বিনষ্ট হয়। চতুরণুক বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত পঞ্চাণুক বিনষ্ট হয়। পঞ্চাণুক বিনষ্ট হলে পঞ্চাণুকে আশ্রিত যে ষড়ণুক তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে স্থূল কার্যদ্রব্যসমূহের বিনাশ ঘটে। যাকে বৈশেষিকাচার্যগণ প্রলয় নামে অভিহিত করেছেন।

বৈশেষিকমতে জগৎ-সৃষ্টিমাত্রই প্রলয়পূর্বক; তা হলে প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে প্রলয়ের কত কাল পরে পরবর্তী সৃষ্টি শুরু হয়? এর উত্তরে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – ব্রহ্মার একশত বৎসর পরিমিত যে কাল তা হল প্রলয়ের কাল। তারপর জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী ফলভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর পরবর্তী জগতের সৃষ্টি করেন। সেই জগৎ ব্রহ্মা পরিমিত একশত বৎসর স্থায়ী হয়। তারপর আবার প্রলয়, আবার সৃষ্টি এভাবে চলে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ব্রহ্মার পরিমিত একশত বৎসর' – এই বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে

বর্ণনা না করা হলে বৈশেষিক-সম্মত সৃষ্টি ও প্রলয়ের ধারণাটি অস্পষ্ট থেকে যাবে। বৈশেষিকমতে কাল স্বরূপতঃ অখণ্ড, নিত্য এবং এক। তবে আমরা ব্যবহারের সুবিধার্থে উপাধি প্রযুক্ত করে এক অখণ্ড কালকে লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি নামে কল্পনা করে থাকি। ভারতীয় শাস্ত্রে মতে চক্ষুর পলককে লব বলা হয়। এরূপ তিন লব নিয়ে হয় এক নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে হয় এক কাষ্ঠা; আর এরূপ তিরিশ কাষ্ঠাতে হয় এক কলা। তিরিশ কলাতে হয় এক ঘটিকা; আর এরূপ দুই ঘটিকাতে হয় এক মুহূর্ত। তিরিশটি মুহূর্ত নিয়ে হয় মনুষ্যলোকের এক অহোরাত্র। আর এরূপ তিরিশ অহোরাত্রে হয় এক মাস। প্রতিটি মাসে দু'টি করে পক্ষ থাকে – কৃষ্ণপক্ষ আর শুক্ল পক্ষ। পনেরটি অহোরাত্র নিয়ে হয় এক পক্ষ আর বাকি পনেরটি অহোরাত্র নিয়ে হয় আরেক পক্ষ। কাজেই তিরিশ অহোরাত্রে হয় এক মাস। দু'টি করে মাস নিয়ে হয় এক একটি ঋতু। আর তিন ঋতুতে তথা ছয় মাসে হয় এক অয়ন[১৬৯]। মাঘ হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এই ছয়মাস উত্তরায়ণ। আর শ্রাবণ হতে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ছয় মাস হল দক্ষিণায়ন। আর দুই অয়নে তথা বারো মাসে হয় এক বছর। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, মনুষ্যকল্পিত সময় আর দেবতাগণের সময়ের হিসাব এক নয়। মনুষ্যের সময় অপেক্ষা দেবতাগণের সময় ৩৬০ গুণ বেশি। অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্য-গণনায় ছয় মাসে হয় এক অয়ন। যেমন – মাঘ মাস হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত মনুষ্য-গণনায় উত্তরায়ণ; যা দেবতাগণের দিবাভাগ। অনুরূপভাবে শ্রাবণ হতে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ছয় মাস মনুষ্য-গণনায় দক্ষিণায়ন। কিন্তু এই ছয় মাস দেবতাগণের রাত্রিভাগ। কাজেই মানুষের গণনায় দুই অয়নে এক বৎসর হলেও দেবতাগণের হিসাবে তা এক অহোরাত্র। মানুষের গণনায় ৩৬০ বছর হলে তবে দেবতাগণের হিসাবে মাত্র এক বছর হয়। এভাবে দেবতাগণের ১২০০০ বছরে হয় এক মহাযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি - এই চারটি যুগের সমষ্টিকে মহাযুগ বলা হয়ে থাকে। মনুষ্য-গণনায় মহাযুগ হয় (১২০০০ × ৩৬০) = ৪৩২০০০০ [তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বছরে]। এখানে উল্লেখ্য যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর

[১৬৯] বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (অনুবাদক), *বিষ্ণুপুরাণ*, কলকাতা, শ্রী অরুণোদয় রায়, ১২৯৭, পৃষ্ঠা – ৮-১০।

ও কলি – এই চারটি যুগ সমপরিমাণবিশিষ্ট নয়। শাস্ত্রানুসারে, সতের লক্ষ আঠাশ হাজার (১৭২৮০০০) বছরে সত্যযুগ, বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার (১২৯৬০০০) বছরে ত্রেতাযুগ, আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার (৮৬৪০০০) বছরে দ্বাপর যুগ আর কলি যুগের পরিমাণ হল চার লক্ষ বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) বছর। কাজেই মনুষ্য গণনা অনুসারে চারটি যুগের মোট পরিমাণ হল (১৭২৮০০০ + ১২৯৬০০০ + ৮৬৪০০০ + ৪৩২০০০) বছর = ৪৩২০০০০ [তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার] বছর। যা দেবতাগণের গণনায় মাত্র (৪৩২০০০০ ÷ ৩৬০) = ১২০০০ বছর। যাই হোক মনুষ্য-গণনায় তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বছরে হয় এক মহাযুগ। আর এক হাজার মহাযুগে অর্থাৎ (৪৩২০০০০ × ১০০০) = ৪৩২০০০০০০০ বছরে হয় ব্রহ্মার এক কল্প। এরূপ দুই কল্প তথা (৪৩২০০০০০০০ × ২) = মনুষ্য পরিমিত ৮৬৪০০০০০০০ বছরে হয় ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ৪৩২০০০০০০০ বছরে হয় ব্রহ্মার পরিমাণে এক দিবাভাগ; অনুরূপ ৪৩২০০০০০০০ বছরে হয় ব্রহ্মা পরিমিত রাত্রিভাগ। কাজেই মনুষ্য-গণনায় (৮৬৪০০০০০০০ × ৩৬০) = ৩১১০৪০০০০০০০০ বছরে হয় ব্রহ্মার এক বছর। আর শাস্ত্র মতে ব্রহ্মার আয়ু হল এক শত বৎসর; যা মনুষ্য-গণনায় হবে (৩১১০৪০০০০০০০০ × ১০০) = ৩১১০৪০০০০০০০০০০ [তিন কোটি এগার লক্ষ চার হাজার কোটি] বছর। এটাই হল এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং স্থিতি কাল। ব্রহ্মার পরিমাণে একশত বৎসর অন্তে যখন ব্রহ্মার মুক্তিকাল উপস্থিত হয় বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত পরিশ্রান্ত জীবকুলের জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে আপাত নিষ্কৃতি প্রদানের নিমিত্ত পরমেশ্বর জগৎ সংহারের ইচ্ছা করেন। তখন শুরু হয় প্রলয়। এই প্রলয় ব্রহ্মার পরিমাণে একশত বৎসর ধরে চলতে থাকে; যা মানুষের গণনায় তিন কোটি এগার লক্ষ চার হাজার কোটি বছর ধরে চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ে জীবকুল বিনাশপ্রাপ্ত হলেও পূর্বার্জিত কর্মসকলের ফলভোগ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেগুলি সংস্কার রূপে নিজ নিজ আত্মাতে বিদ্যমান থাকে। জীবের পূর্ব পূর্বজন্মে কৃত-কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত ঈশ্বর প্রলয়ের পর পুনরায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইচ্ছা তথা সিসৃক্ষা করেন। এভাবে প্রলয়ান্তে সৃষ্টি, তারপর প্রলয়

আবার সৃষ্টি; বৈশেষিকমতে এইরকমভাবেই বিশ্ব-সংসার সুদীর্ঘকাল হতে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে চার প্রকার প্রলয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা – নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়। যে প্রলয় আমাদের জীবনে নিত্যদিন তথা প্রতিদিনই সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে শাস্ত্রাকারগণ নিত্য প্রলয় বলেছেন। যেমন – সুষুপ্তির অবস্থা হল নিত্য প্রলয়ের উদাহরণ। কারণ প্রায় প্রতিদিনই নিদ্রাকালে এটি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুষুপ্তিকালে জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য সেই সেই জীবের নিজ নিজ আত্মাতে লীন হয়ে যায় অর্থাৎ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রলয় প্রতিদিনই নিদ্রাকালে সংঘটিত হয় বলে, সুসুপ্তিকে নিত্য প্রলয় বলা হয়েছে। আর কোনও কিছুর নিমিত্ত যে প্রলয় সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে শাস্ত্রে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, যিনি পুরাণাদিতে ব্রহ্মা নামে অভিহিত, তাঁর পরিমিত এক দিবসের অবসানে অর্থাৎ কল্পান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হন তখন ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ – এই তিন লোকের প্রলয় হয়। ব্রহ্মার বিশ্রামকালের নিমিত্ত এই প্রলয় সংঘটিত হওয়ায় একে শাস্ত্রে নৈমিত্তিক-প্রলয় বলা হয়েছে। তারপর রাত্রিশেষে যখন ব্রহ্মা জাগ্রত হন তখন পুনরায় তিন লোকের সৃষ্টি করেন। এভাবে কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় এবং কল্পারম্ভে সৃষ্টি এভাবে চলতে থাকে। আর ব্রহ্মার পরিমিত একশত বর্ষ অন্তে তথা ব্রহ্মার আয়ুর শেষে বিদেহমুক্তিকালে স্থূল, সূক্ষ্ম সকল প্রকার জগতের তার প্রকৃতিতে যে লয়, তা হল প্রাকৃত প্রলয়। একে শাস্ত্রে মহাপ্রলয়[১৭০] বলা হয়েছে। আর ব্রহ্মজ্ঞান হলে পর অজ্ঞান নাশপূর্বক সমস্ত প্রকার কার্যদ্রব্যের যে আত্যন্তিক বিনাশ, তাকে শাস্ত্রে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। অনেক আচার্য প্রলয়কে আবার খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের অংশতঃ বিনাশপ্রাপ্ত তাকে খণ্ডপ্রলয় বলা হয়েছে। আর যে প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভাবকার্য যুগপৎ লয়প্রাপ্ত হয় তা হল মহাপ্রলয়।

---

[১৭০] ঐ, পৃষ্ঠা – ১২-১৫।

এখন আপত্তি হতে পারে, মীমাংসকাদি সম্প্রদায় তো প্রলয়ই স্বীকার করেন না। কারণ তাঁদের মতে প্রলয় যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সাধক প্রমাণ নেই। পরন্তু প্রলয় যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে বাধক প্রমাণ বিদ্যমান। প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে মীমাংসক-সম্প্রদায় পাঁচটি বিপ্রতিপত্তির উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল -

প্রথমত, 'অহোরাত্রং অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকং অহোরাত্রত্বাৎ, সম্মতাহোরাত্রবৎ' অর্থাৎ প্রতিটি অহোরাত্রের অব্যবহিত পূর্বে অন্য অহোরাত্র থাকে, যেহেতু তাতে অহোরাত্রত্ব আছে, যেমন – সম্মত-অহোরাত্র -এরূপ অনুমানই হল প্রলয়ের বাধক প্রমাণ। মীমাংসামতে সমস্ত অহোরাত্রের অব্যবহিতপূর্বে অন্য একটি অহোরাত্র থাকে -এরূপ স্বীকার করা হলে আর প্রলয়কে স্বীকার করা যাবে না। অভিপ্রায় এই যে, অহঃ এবং রাত্রি সম্ভব হয় সূর্যের উপস্থিতির জন্য। পৃথিবী তার আহ্নিক গতির জন্য নিজ কেন্দ্রকে অবলম্বন করে লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের সম্মুখে আসে সেই অংশে হয় দিবা; আর যে অংশে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে না সেই অংশে হয় রাত্রি। যাই হোক মীমাংসামতে প্রতিটি অহোরাত্রই অহোরাত্রপূর্বক অর্থাৎ এমন একটি অহোরাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যার পূর্বে অন্য অহোরাত্র নেই। কাজেই অহোরাত্র মাত্রই অহোরাত্রপূর্বক হলে স্বীকার করতে হবে পূর্বে সূর্যাদি স্থূলবস্তু অবশ্যই উপস্থিত আছে; তা না হলে অহোরাত্র সংঘটিত হতে পারবে না। আর যদি এটা স্বীকার করা হয় প্রতিটি অহোরাত্রের পূর্বে সূর্য, চন্দ্রাদি স্থূল বস্তু বিদ্যমান; তা হলে আর প্রলয় স্বীকার করা যাবে না। কারণ ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণের মতে মহাপ্রলয়কালে চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি যাবৎ ভাববস্তুই যুগপৎ লয়প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, মীমাংসামতে জীব অনন্ত। তাই তাদের কর্মও অনন্ত। এই অনন্ত জীবের অনন্ত কর্মের ফলভোগ কোনও এককালে সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম জন্য যে অদৃষ্ট তা ভিন্ন ভিন্ন কালে ফল প্রসব করে থাকে। কাজেই যুগপৎ সমস্ত জীবের সমস্ত কর্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হবে; তখন আসবে মহাপ্রলয় – এমন কল্পনা সত্যই নিরর্থক।

তৃতীয়ত, প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে মীমাংসক-সম্প্রদায় তৃতীয় যে বাধক প্রমাণের উল্লেখ করেছেন তা হল – 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজন্য ব্রাহ্মণত্বহেতুক' অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রই ব্রাহ্মণজন্য যেহেতু তাতে ব্রাহ্মণত্ব রয়েছে। তাৎপর্য এই যে, প্রতিটি ব্রাহ্মণই তাঁর ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা জন্য হয়ে থাকেন। যেহেতু পিতা-মাতা হতেই সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনুমান স্বীকার করা হলে আর প্রলয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রলয়কালে সকল ভাববস্তুই যুগপৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিটি ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা জন্য হলে সৃষ্টির প্রথম ব্রাহ্মণটিও তাঁর পিতা-মাতা জন্য হবে। কাজেই স্বীকার করতে হবে প্রলয় বলে কিছু নেই।

চতুর্থত, মীমাংসক-সম্প্রদায় মনে করেন প্রলয় স্বীকার করা হলে ঘট-পটাদি শব্দ ব্যবহার ব্যর্থ হবে। অভিপ্রায় এই যে, একজন শিক্ষক যখন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন – "অমুক পদ অমুক অর্থকে বোঝায়" তখন শিক্ষকের উচ্চারিত উক্ত বাক্য শ্রবণ করে ছাত্র-ছাত্রীগণ নির্দিষ্ট পদ হতে নির্দিষ্ট পদার্থকে বোঝে অর্থাৎ পদার্থে শক্তিজ্ঞান হয়। এরপর তারা ঐ নির্দিষ্ট পদার্থটিকে বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু প্রলয় স্বীকার করা হলে প্রলয়কালে যাবৎ ভাববস্তু যুগপৎ বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টিতে যে মানুষ জন্মাবে, তাদের পূর্বে প্রযোজক তথা শিক্ষকরূপে কেউ বিদ্যমান না থাকায় 'ঘট পদটি ঘট পদার্থটিকে বোঝাবে' এমন শক্তিজ্ঞানের অভাবে ঘট, পটাদি শব্দ প্রয়োগ সম্ভব হবে না। কিন্তু আমরা বর্তমান সময়েও ঘট, পট প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করে থাকি। কাজেই 'ঘট পদ হতে ঘট পদার্থটিকে বুঝবে' কিংবা 'পট পদের শক্তি পট পদার্থে' – এরূপ শক্তিজ্ঞানের প্রযোজক কোনও ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল; তা স্বীকার করতে হবে। আর কোনও স্থূল পদার্থ বিদ্যমান থাকলে আর বলা যাবে না এই সৃষ্টির পূর্বে কোনও প্রলয় হয়েছিল। সুতরাং প্রলয় সম্ভব নয়।

পঞ্চমত, প্রলয় স্বীকার করা হলে ঘট-পটাদির যে নির্মাণ প্রক্রিয়া তা ব্যাহত হবে। অভিপ্রায় এই যে, আমরা জানি কোনও কিছু নির্মাণ করতে গেলে পূর্ব হতে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন – যিনি ঘট-নির্মাণ করবেন, তাঁর পূর্ব হতে ঘট-নির্মাণ প্রক্রিয়া,

ঘটের উপাদান, ঘট নির্মাণের সহযোগী যাবতীয় সামগ্রী প্রভৃতি বিষয়ে সম্যগ্ জ্ঞান না থাকলে তাঁর দ্বারা ঘট-নির্মাণ সম্ভব হবে না। এখন যদি প্রলয় স্বীকার করা হয় তা হলে স্বীকার করতে হবে প্রলয়কালে সকল ভাববস্তু লয়প্রাপ্ত হওয়ায় কুম্ভকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ও লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। আর কুম্ভকার প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হলে, প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্ট যে মানুষ তাদের ঘটাদি নির্মাণ বিষয়ে কোনওরূপ জ্ঞান না থাকায় এবং প্রযোজক কোনও ব্যক্তি যিনি ঘট-নির্মাণ প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেবেন - তিনি প্রলয়কালে বিদ্যমান না থাকায় ঘট-পটাদির নির্মাণই সম্ভব হবে না। কিন্তু বর্তমান দিনেও আমরা ঘট-পটাদির নির্মাণ প্রত্যক্ষ করে থাকি। কাজেই মানতে হয় যারা ঘট পটাদির নির্মাণ করেছেন তাদের এই নির্মাণ প্রক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞান পূর্ব হতে রয়েছে কিংবা কোনও প্রযোজক ব্যক্তি পূর্বে অবশ্যই বিদ্যমান; যিনি ঘট-পটাদির নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। কিন্তু এমন স্বীকার করা হলে আর প্রলয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। তাই মীমাংসক-সম্প্রদায় মনে করেন, প্রলয় সম্ভব নয়। আর প্রলয় সম্ভব না হলে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত জগৎ এর সৃষ্টি প্রক্রিয়ারও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলস্বরূপ ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত সৃষ্টি ও প্রলয়ের আলোচনাটি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

তাই আচার্য উদয়ন তাঁর '*ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে প্রলয় বিষয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের উপর্যুক্ত বিপ্রতিপত্তিগুলি খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন-

'বর্ষাদিবত্তবোপাধির্বৃত্তিরোধঃ সুষুপ্তিবৎ।
উদ্ভিদ্‌বৃশ্চিকবদ্বর্ণা মায়াবৎ সময়াদয়ঃ'[১৭১]।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার আচার্য উদয়ন প্রলয় বিষয়ে মীমাংসকগণের পঞ্চ বিপ্রতিপত্তির উত্তরে উক্ত কারিকাটির অবতারণা করেছেন। মীমাংসা-মত খণ্ডনে তাঁর যুক্তিগুলি হল –

প্রথমত, মীমাংসকগণ প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে প্রথম যে বাধক যুক্তিটি দিয়েছেন তা হল – 'অহোরাত্রং অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকং অহোরাত্রত্বাৎ'। কিন্তু উদয়নাচার্য দেখিয়েছেন যে,

[১৭১] মিশ্র, অধ্যাপক শ্যামাপদ, শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য প্রনীতঃ *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* (প্রথমদ্বীতিয়স্তবকমাত্রম্), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০, পৃষ্ঠা – ১৫৯।

প্রদত্ত অনুমানটিই যথার্থ নয়। কারণ প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে মীমাংসকগণ প্রদত্ত উপর্যুক্ত অনুমানটিকে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস ঘটেছে। অভিপ্রায় এই যে, মীমাংসকগণ প্রদত্ত অনুমানটিতে অহোরাত্রত্বকে হেতু করে সমস্ত অহরাত্রেই অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকত্বকে সাধন করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রদত্ত স্থলে সাধ্যটি তথা অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকত্ব স্বরূপতঃ পক্ষে তথা সমস্ত অহোরাত্রে থাকে না। প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে প্রথম যে অহোরাত্র, সেই অহোরাত্রের পূর্বে কোনও অহোরাত্র থাকে না, যেহেতু প্রলয়কালে সকল ভাববস্তুই বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পক্ষে যে সাধ্যকে সাধন করার জন্য হেতু প্রয়োগ করা করা হচ্ছে, সেই সাধ্যটি পক্ষে স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় প্রদত্ত অনুমানটি স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রদত্ত অনুমানটিতে ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাসও ঘটেছে। আমরা জানি প্রতিটি অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি হল একটি মূল ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু হেতু ও সাধ্যের সম্পর্কটি যদি শর্তনির্ভর অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হয়, সে স্থলে ঐরূপ সোপাধিক হেতুর সাহায্যে কোনও অনুমানের সাধ্যকে যদি সাধন করা হয় তা হলে সেই অনুমানটি ব্যাপতাসিদ্ধ হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়। প্রদত্ত স্থলে হেতু অহোরাত্রত্ব এবং সাধ্য অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকত্ব এর মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তা ‘ভবঃ’ অর্থাৎ সংসারপূর্বকত্বরূপ উপাধি নির্ভর। যা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয়, তাকে উপাধি বলা হয়। যখন একটি অহোরাত্রের পূর্বে অন্য একটি অহোরাত্র থাকে, তখন বুঝতে হবে ঐ অহোরাত্রের অব্যবহিত পূর্বে সংসার আছে। কাজেই সংসার-পূর্বকত্ব উক্ত অনুমানের সাধ্য-(অব্যবহিতাহোরাত্রপূর্বকত্ব) এর ব্যাপক হচ্ছে। যদিও তা হেতু (অহোরাত্রত্ব)-এর অব্যাপক হয়ে থাকে। কারণ প্রলয়ের পর যখন সৃষ্টি হয় তখন প্রথম সৃষ্ট যে অহোরাত্র, তাতে অহোরাত্রত্ব থাকলেও সংসারপূর্বকত্ব থাকে না। যেহেতু প্রলয়কালে সংসারাদি সমস্ত ভাববস্তুরই যুগপৎ বিনাশ ঘটে। এই অভিপ্রায়েই আচার্য উদয়ন বলেছেন – ‘বর্ষাদিবদিত্যাদি’। তাৎপর্য এই যে, ‘বর্ষাদিনের অব্যবহিত পূর্বে বর্ষাদিন বিদ্যমান যেহেতু তাতে বর্ষাদিনত্ব রয়েছে; যেমন – বর্তমান বর্ষাদিন’ -এই অনুমানের হেতুটি ‘বর্ষাদিনত্ব’ সোপাধিক। এই স্থলে রাশিবিশেষ দ্বারা অবচ্ছিন্ন রবিকালপূর্বকত্ব হল উপাধি। আমরা জানি, সূর্য প্রতিটি রাশিতে এক মাস তথা তিরিশ দিন করে অবস্থান করে। অর্থাৎ সূর্য বৈশাখ

মাসে মেষ রাশিতে অবস্থান করে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে, শ্রাবণ মাসে কর্কট রাশিতে এবং ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে অবস্থান করে। শ্রাবণ মাসের এক তারিখ হতে সূর্য কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে; শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত কর্কট রাশিতে অবস্থান করে। আবার ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখ হতে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত সিংহ রাশিতে অবস্থান করে। এই দুই মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্র হল ভারতীয় শাস্ত্রমতে বর্ষাকাল। কাজেই বর্ষাদিনের পূর্বে যখন বর্ষাদিন থাকে তখন সূর্য কর্কট ও সিংহ রাশিতে অবস্থান করে। কিন্তু বর্ষাকালে প্রথম যেদিন অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখে বর্ষাদিন থাকলেও তার পূর্বে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষ দিন (সংক্রান্তির দিন) সূর্য কর্কট কিংবা সিংহ রাশিতে থাকে না, তা মিথুন রাশিতে অবস্থান করে। কাজেই কর্কট ও সিংহ রাশিবিশেষ দ্বারা অবচ্ছিন্ন রবিকালপূর্বকত্ব সাধ্য 'অব্যবহিতবর্ষাদিনপূর্বকত্ব' এর ব্যাপক হলেও হেতু 'বর্ষাদিনত্ব'এর অব্যাপক হয়েছে। এরূপ স্থলে হেতুটি সোপাধিক হওয়ায় প্রদত্ত অনুমানটিকে যেমন যথাযথ বলা যায় না; তদনুরূপ মীমাংসা-সম্প্রদায় প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে যে বাধক যুক্তি দেখিয়েছেন, তা 'ভবঃ' অর্থাৎ সংসারপূর্বকত্বরূপ উপাধি বিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাসে দুষ্ট হয়েছে। ফলত এরূপ দুষ্ট যুক্তি প্রলয়ের বাধক প্রমাণ হতে পারে না। কাজেই প্রলয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

দ্বিতীয়তঃ মীমাংসাসম্মত দ্বিতীয় বাধক যুক্তিটির উত্তরে উদয়নাচার্য বলেছেন – 'সুষুপ্তিবদিতি'। অভিপ্রায় এই যে, কোনও ব্যক্তি যখন সুসুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন সেই ব্যক্তির কোনও প্রকার সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি থাকে না। কাজেই সুষুপ্তিকালে ব্যক্তি-বিশেষের অদৃষ্টের বৃত্তি সকল যুগপৎ নিরুদ্ধ হয়। এর থেকে এমন চিন্তা করা অসঙ্গত হবে না যে, এমন এক কাল আসবে যেখানে সকল ব্যক্তির সকল কর্মের ফলভোগের যুগপৎ নিবৃত্তি ঘটবে। মূল কথা হল, এমন একটা কাল আমরা কল্পনা করতেই পারি যেখানে সকল জীবের ফলভোগজনক যে অদৃষ্ট সকল তাদের বৃত্তি যুগপৎ নিরুদ্ধ হয়ে যাবে। আর সেই কালই হল বৈশেষিক-সম্মত মহাপ্রলয়ের কাল।

তৃতীয়তঃ মীমাংসকগণ প্রলয়ের অস্তিত্ব খণ্ডনে তৃতীয় যে বাধক যুক্তিটি উপস্থাপন করেছেন, তা হল – ‘ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজন্য ব্রাহ্মণত্বহেতুক’; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ দেখান যে মীমাংসা প্রদত্ত প্রলয়ের তৃতীয় বাধক প্রমাণটিও যথাযথ হয়নি। কারণ তা স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস জনিত দোষে দুষ্ট। প্রদত্ত অনুমানস্থলে পূর্বপক্ষী ব্রাহ্মণত্ব হেতুর দ্বারা ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রাহ্মণজন্যত্বরূপ সাধ্যকে সিদ্ধ করতে চেয়েছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণমাত্রই যে ব্রাহ্মণজন্য হবে এমনটা সবসময় বলা যায় না, যেমন – তণ্ডুলীয় শাক। তণ্ডুলীয় শাক সবসময় শাকের বীজ হতে উৎপন্ন হয় না, কখনও তণ্ডুল কণা হতেও উৎপন্ন হয়। তদনুরূপ বৃশ্চিক সবসময় স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগজন্য হয় - এমন নয়। যদি আমরা কিছু গোময়কে বায়ু নিরুদ্ধ কোনও পাত্রে বহুদিন রেখে দিই, তা হলে দেখতে পাব তার মধ্যে বৃশ্চিক এর জন্ম হয়েছে। তেমনই ব্রাহ্মণমাত্রই যে ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা জন্য হবে এমনটা নাও হতে পারে। প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির পূর্বে ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার অস্তিত্ব না থাকলেও কেবল ঈশ্বরের সংকল্প হতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হতে পারে। সৃষ্টির আদিতে প্রথম সৃষ্ট যে ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা হতে জাত হননি। কাজেই ব্রাহ্মণমাত্রই ব্রাহ্মণ পিতা-মাতাজন্য, এমনটা বলা যায় না। তাই ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন প্রলয়, এরপর সৃষ্টি; আবার প্রলয় এবং তারপর সৃষ্টি এভাবেই আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বহু বহু যুগ ধরে আবর্তিত হয়েই চলেছে।

চতুর্থত, মীমাংসামতে প্রলয় স্বীকার করলে প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে প্রযোজক ব্যক্তির অভাববশতঃ ঘট-পট প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারই লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মীমাংসকগণের এমন আপত্তিটিও যথাযথ হয়নি। কারণ ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন প্রলয়কালে সমস্ত কার্যদ্রব্যের যুগপৎ বিনাশ ঘটলেও প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় দু’টি শরীর সৃষ্টি করে একজনকে প্রযোজক তথা শিক্ষকরূপে এবং অন্যজনকে শিষ্যরূপে ঘট-পটাদির শব্দ বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করে থাকেন। তদনুরূপ ঈশ্বর নিজ সংকল্পের দ্বারা প্রযোজক ও প্রযোজ্যভাবে পদ ও পদার্থের শক্তিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কাজেই প্রলয় স্বীকার

করলে শিক্ষকের অভাববশতঃ ঘট-পটাদি শব্দ ব্যবহার ব্যর্থ হবে – মীমাংসকগণের এমন আপত্তিকে যথাযথ বলা যায় না।

পঞ্চমত, ঐ একই যুক্তিতে মীমাংসকগণের পঞ্চম বিপ্রতিপত্তিটিও খণ্ডিত হয়ে যায়। কারণ ঈশ্বর নিজেই প্রযোজকরূপে প্রতিটি প্রলয়ের পর সৃষ্টিতে মানুষকে ঘট-পটাদির নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। কাজেই প্রলয়কালে শিক্ষকের অবিদ্যমানতাহেতুক ঘট-পটাদির নির্মাণ কৌশল বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যাহত হবে। এমন আপত্তিটিও সঙ্গত নয়। কিন্তু এস্থলে মীমাংসক-সম্প্রদায় আপত্তি করে বলতে পারেন, ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত ঈশ্বর তো শরীরহীন। এমন পুরুষ কীভাবে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা হবেন? কীভাবেই বা তিনি প্রযোজক-প্রযোজ্য কর্তা সৃষ্টি করবেন? আর প্রতিটি সৃষ্টিতে ঘট-পটাদি শব্দ ব্যবহার কিংবা নির্মাণ কৌশল ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করবেন? এর উত্তরে বলা যায়, কোনও শিক্ষক যখন চেয়ারে বসে বসে কোনও ছাত্রকে বলেন 'দরজাটা বন্ধ কর'; তখন শিক্ষকের শরীর দ্বারা কোনওরূপ প্রযত্ন ব্যাতিরেকেই কেবল শব্দোচারণ দ্বারাই দরজা বন্ধ করা রূপ ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে যায়; তদনুরূপ ঈশ্বরের শরীর দ্বারা কোনওরূপ প্রযত্ন ব্যতিরেকেই কেবল তাঁর সংকল্প হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় সংঘটিত হয়। এখানে যদি বলা হয়, প্রদত্ত স্থলে শিক্ষকের শরীরপ্রযত্ন না থাকলেও ছাত্রের শরীর প্রযত্ন এই স্থলে বিদ্যমান। কাজেই শরীরহীন ঈশ্বরকে কীভাবে জগৎরূপ কার্যের কর্তা বলা যাবে? এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায়, ঈশ্বর নিজ ইচ্ছার দ্বারাই জগৎ-সৃষ্টি করতে সমর্থ। তিনি শরীর রহিত হলেও প্রাণিগণের কর্মও ও অদৃষ্ট অনুযায়ী ফলভোগের নিমিত্ত তিনি কেবল নিজ ইচ্ছার দ্বারা জগৎএর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়কে ত্বরান্বিত করে থাকেন। তাই ন্যায়-বৈশেষিকমতে ঈশ্বরের সংহার-ইচ্ছা উপস্থিত হলে পরমাণু-সমূহ সক্রিয় হয়, ফলস্বরূপ পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ উৎপন্ন হয়। এরফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে প্রথম উৎপন্ন যে কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুক, তা বিনষ্ট হয়। দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুক বিনষ্ট হয়। ত্র্যণুক বিনষ্ট হলে চতুরণুক, চতুরণুক

বিনষ্ট হলে পঞ্চাণুক এভাবে পরিদৃশ্যমান এই জগতের যাবৎ কার্যদ্রব্য একসময় যুগপৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। একেই বৈশেষিকাচার্যগণ মহাপ্রলয় নামে অভিহিত করেছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, প্রলয় বিষয়ে সাধক প্রমাণ কী? অন্যভাবে বলা যায় বৈশেষিকাচার্যগণ যে 'প্রলয় আছে' স্বীকার করেন তার সপক্ষে প্রমাণ কী? এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, আমরা যদি আমাদের চারপাশে একটু তাকাই তা হলে দেখতে পাব জাগতিক বস্তুসমূহ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময় বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যেমন – একটি মৃত্তিকা নির্মিত ঘট কিংবা এক টুকরো লৌহখণ্ডকে যদি খোলা আকাশের নীচে জল-ঝড়-বৃষ্টিতে দীর্ঘ দিন ফেলে রাখা হয়, তা হলে দেখা যাবে ক্রমশঃ তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একটা সময় তা মৃত্তিকাতে পর্যবসিত হয়ে যাবে। আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে অনুধাবন করা হল – আমরা যদি একটি প্রজ্বলিত প্রদীপকে দেখি, তা হলে বুঝতে পারবো প্রদীপটিতে ক্রমশ তেল নিঃশেষিত হতে থাকছে এবং প্রদীপের শিখা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হয়ে একটা সময় প্রদীপটি নির্বাপিত হয়ে যায়। এভাবে সকল কার্যদ্রব্যের ক্রমহ্রাসমানতা এবং ক্ষয়িষ্ণুতা প্রমাণ করে যে, একসময় সকল জন্যদ্রব্যের উচ্ছেদ ঘটবে এবং সেটাই হল প্রলয়-কাল। আচার্য উদয়ন তাঁর '*ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে প্রলয়ের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করতে বলেছেন – 'জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্ম্মণোঃ। হ্রাস-দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্'[১৭২]। অভিপ্রায় এই যে, জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, স্বাধ্যায়, কর্ম প্রভৃতির ক্রমশঃ হ্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। জন্ম যে পূর্ব অপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় – পূর্বে ব্রহ্মার সংকল্প হতে অপত্যের জন্ম হত। পরবর্তিকালে পুত্রলাভের কামনায় যাগ-যজ্ঞাদি করা হলে তার মাধ্যমে সন্তানাদির জন্ম হত। তারও পরবর্তী সময়ে দিন, ক্ষণ নির্ধারণ পূর্বক শাস্ত্রাদির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তদনুসারে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যদিয়ে সন্তানাদির জন্ম হত। কিন্তু বর্তমান দিনে কেবলমাত্র পাশবিক ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার নিমিত্ত মানুষের জন্ম হচ্ছে। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, সময়ের

[১৭২] ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬৬।

সঙ্গে সঙ্গে জন্মের হ্রাস ঘটছে। এখানে উল্লেখ্য যে, হ্রাস বলতে পূর্ব অপেক্ষা শক্তির হ্রাসকে বুঝতে হবে। একইভাবে সংস্কার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে তার উদাহরণ হল – পূর্বে ব্রাহ্মণমাত্রকেই গর্ভধারণাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করা হত। অভিপ্রায় এই যে পূর্বে চরু প্রভৃতিতে সংস্কার হত। তার পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভের সংস্কার করা হত। তারও পরবর্তী সময়ে সন্তানাদি জন্মের পর সংস্কার করা হত। কিন্তু এখন কেবল অন্তিম সংস্কার বিবাহটাই সমাজে রয়ে গেছে। তবে বৈদিক্ মতে বিবাহ আজকের দিনে প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। বর্তমান দিনে যে কোনও প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হতে দেখা যাচ্ছে, মানুষ বৈদিক্ আচারানুষ্ঠান কতটা মেনে শুভকাজ সম্পন্ন হচ্ছে সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাহ্যিক সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা, ভোজন, পানীয় প্রভৃতিতে মত্ত হয়ে উঠছে। বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে সমস্ত বিদ্যার্থীকে বেদ-বেদাঙ্গ বিষয়ে পাঠ দেওয়া হত। পরবর্তিকালে এক একটি বেদ কিংবা বেদাঙ্গ-এর অধ্যয়ন হত। তারও পরবর্তী সময়ে দু-একটি অঙ্গাদির অধ্যয়ন চলত। কিন্তু বর্তমান দিনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যইয়ন একেবারে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে বহু বিদেশী গ্রন্থ পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এভাবে বিদ্যার হ্রাস দেখা যাচ্ছে। বিদ্যার হ্রাস ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নের তথা স্বাধ্যায়-এর হ্রাস দেখা যাচ্ছে। পূর্বে শিক্ষার্থীরা গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়ে গুরুর আশ্রমে অবস্থান পূর্বক বিদ্যা লাভ করত। গুরুর মুখ নিঃসৃত বাক্যসকল শ্রবণ পূর্বক স্মৃতিতে সংরক্ষণ করত। কিন্তু বর্তমান দিনে মোবাইল, ইন্টারনেটের যুগে শিক্ষার্থীরা এমনকি তাদের অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি অপেক্ষা ঘরে বসে যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে পড়াশুনাতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে। শুধু তাই নয়, পুস্তক অধ্যয়ন অপেক্ষা তারা মোবাইলে নানা রকমের খেলা করা, ছবি দেখা, তথ্য আদান-প্রদান করা এসবে সময় অতিবাহিত করছে। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে শক্তির তথা সামর্থের হ্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। যখন গুরুর নিকট হতে নানা উপদেশ শুনে মনে রাখতে হত, তখন শিক্ষার্থীর যে স্মরণ শক্তি তথা মনে রাখার সামর্থ্য তা বর্তমান দিনে মোবাইল, রেকর্ডার ইত্যাদির

দৌলতে তা ক্ষয় পেতে পেতে একেবারে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। কাজেই বিদ্যা, অধ্যয়ন কিংবা শক্তির যে হ্রাস ঘটছে তা বর্তমান দিনে বেশ সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, জীবিকা ধর্ম প্রভৃতির হ্রাস আজকের দিনে বেশ চোখে পরার মত। প্রাচীনকালে কণাদ প্রমুখ মহর্ষিগণ কেবল শরীর ধারণের নিমিত্ত অপরিহার্যরূপে নূন্যতম যতটুকু প্রয়োজন তার জন্য তণ্ডুল কণাদি কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরপর মানুষ কৃষিকাজ, বাণিজ্য প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেছে। তবে বর্তন দিনে অনেক মানুষ আবার চৌর্যবৃত্তি, প্রতারণা, দস্যুবৃত্তি, দালালি প্রভৃতিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কাজেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবিকার হ্রাস ঘটছে। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে ধর্মেরও ক্রমহ্রাসমানতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় – সত্য যুগে মানুষ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও জ্ঞান – এই চতুষ্পাদ ধর্মের অনুষ্ঠান করত। কিন্তু পরবর্তী যুগে এসে ক্রমে ক্রমে ত্রিপাদ, দ্বিপাদ; আর কলিতে এসে অতি জীর্ণ কেবল একপাদ ধর্ম আচরিত হতে দেখা যাচ্ছে। পূর্বে লোক যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ ভোজনের কাজে ব্যবহার করতেন। তারও পরবর্তী সময়ে অতিথিকে ভোজন করানোর পর যা অবশিষ্ট থাকত তা দিয়ে ভোজন করতেন। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ অন্যকে ঠকিয়ে অন্যের খাদ্য নিজেরা আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত। এই সবই ধর্ম-হ্রাসের উদাহরণ। এভাবে আয়ু, আরোগ্য, বল, বীর্য্য, শ্রদ্ধা, শ্রম, দম, গ্রহণ, ধারণ প্রভৃতি শক্তির হ্রাস ঘটছে। প্রাচীনকালে মানুষের সহস্রাধিক বৎসর পর্যন্ত আয়ু ছিল; পরে শতাধিক, আর এখন বিভিন্ন রকম সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, মানুষের আয়ু ষাট বছরে নেমে এসেছে। পূর্বে মানুষ বহু বহু বছর নীরোগ জীবন যাপন করতেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা যদি আমরা দেখি তা হলে এমন স্বল্প সংখ্যক মানুষ খুঁজে বের করা কষ্টকর যারা রোগের কবলে জর্জরিত নন। একইভাবে শ্রদ্ধাদিরও হ্রাস ঘটছে। পূর্ব পূর্ব সময়ে যিনি শিক্ষাদান করেন তাঁকে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করে পূজা করা হত। আর এখন স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-আন্দোলন, শিক্ষকদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ – এসব শ্রদ্ধা হ্রাসের উদাহরণ। এভাবে সমস্ত কিছুই ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত

হচ্ছে। এসব দেখে বোঝা যায় এমন একটা সময় আসবে যখন সমস্ত কিছুই হ্রাস পেতে পেতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তাকেই ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ প্রলয় বলেছেন।

বৈশেষিকমতে প্রলয়কালে সমস্ত কার্যদ্রব্য যুগপৎ বিনাশপ্রাপ্ত হলেও জীবমাত্রের যে কর্ম, তা বিনষ্ট হয়ে যায় না; তা ধর্মাধর্মরূপ সংস্কাররূপে জীবমাত্রের নিজ নিজ আত্মাতে বিদ্যমান থাকে। এখন আমরা জানি কর্ম অনুযায়ী জীবের ফলভোগ অবশম্ভাবী। টাই পরম করুণাময় ঈশ্বর জীবমাত্রেরই পূর্ব পূর্ব কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ যথাযথভাবে ব্যবস্থিত করার নিমিত্ত জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। তার ফলে সর্ব প্রথম বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে ঐ ক্রিয়া জন্য পরমাণুর পূর্বদেশের সঙ্গে তার বিভাগ উৎপন্ন হয়। এর ফলে পূর্বদেশের সঙ্গে পরমাণুর সংযোগ বিনষ্ট হয়। তারপর দু'টি বায়বীয় পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। তারপর পূর্বের ন্যায় দ্ব্যণুকে ক্রিয়া প্রভৃতি হতে তিনটি দ্ব্যণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু উৎপন্ন করে। এরপর ত্রসরেণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে চারটি ত্র্যণুক মিলিত হয়ে এক একটি চতুরণুক উৎপন্ন করে। এভাবে পাঁচটি চতুরণুক সংযুক্ত হয়ে পঞ্চাণুক, ছয়টি পঞ্চাণুক মিলিত হয়ে ষড়ণুক – এভাবে ক্রমে ক্রমে মহাবায়ু উৎপন্ন করে। প্রথমে মহাবায়ু উৎপন্ন হলেও পৃথীব্যাদির অভাবে তা কোনওরূপে প্রতিহত না হয়ে আকাশে অত্যন্ত বেগবিশিষ্টরূপে অবস্থান করে। এরপর এই বায়ুতে জলীয় পরমাণু সকল দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহাজল উৎপন্ন করে। কিন্তু এই মহাজলরাশি পৃথিবীর অভাবে অব্যাহত হয়ে সর্বত্র প্লাবিত করে অবস্থান করে। অতঃপর সেই জলে পার্থিব পরমাণু সকল সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে স্থূল মহাপৃথিবীর সৃষ্টি করে। এরপর সেই জলরাশিরূপ আধারে তৈজস্ পরমাণু সকল সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান তেজরাশি উৎপন্ন করে। তারপর ঈশ্বরের সংকল্পবশতঃ তৈজস্ পরমাণুতে পার্থিব পরমাণু সকল যুক্ত হয়ে একটি মহৎ পিণ্ড বা অণ্ড তৈরি করে। এই পিণ্ডের সমবায়িকারণ হয় তৈজস্ পরমাণু, আর নিমিত্ত কারণ হয় পার্থিব পরমাণু সকল। এরপর পরমেশ্বর সেই অণ্ডে অতল, বিতল, সুতল, ততাতল, রসাতল, মহাতল, পাতাল – এই সপ্ত অধঃলোক এবং ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য – এই সপ্ত

ঊর্ধ্বলোক অর্থাৎ চতুর্দশলোক সৃষ্টি করেন। এর সঙ্গে সকল প্রাণীর আদি পুরুষ এবং প্রাণীদের পূর্ব পূর্ব কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ ব্যবস্থিত করবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর কর্তৃক প্রজা সৃষ্টিতে নিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মা জীবের পূর্বার্জিত কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত সমস্ত জীবকুল এবং পরিদৃশ্যমান জগত-এর যাবতীয় জাগতিক বস্তু সমূহের সৃষ্টি করেন। এভাবে বৈশেষিক-দর্শনে জগৎ-সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশস্তপাদভাষ্যে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - ততঃ পুনঃ প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে মহেশ্বরসিসৃক্ষানন্তরং সর্বাত্মগতবৃত্তিলব্ধাদৃষ্টাপেক্ষেভ্যস্তৎসংযোগেভ্যঃ পবনপরমাণুষু কর্মোৎপত্তৌ তেষাং পরস্পরসংযোগেভ্যো দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ মহান্ বায়ুঃ সমুৎপন্নো নভসি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি। তদনন্তরং তস্মিন্নেব...দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণোৎপন্নো মহাংস্তেজোরাশিঃ কেনচিদনভিভূতত্বাদ্দেদীপ্যমানস্তিষ্ঠতি'[১৭৩]। সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা জাগরিত হলে জীবের অদৃষ্টবশতঃ সর্বপ্রথম পরমাণু-সমূহ স্পন্দিত হয়। কারণ প্রথমে পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে দু'টি দু'টি করে সজাতীয় পরমাণু তথা দু'টি বায়বীয় পরমাণু, দু'টি জলীয় পরমাণু, দু'টি পার্থিব পরমাণু, দু'টি তৈজস্ পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অসংখ্য বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব ও তৈজস্ দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। এই দ্ব্যণুক-সমূহই হল প্রথন উৎপন্ন কার্যদ্রব্য। আমরা জানি বৈশেষিকমতে যে কোনও কার্যদ্রব্যের উৎপত্তিতে তার সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ অপেক্ষিত হয়। দ্ব্যণুকরূপ কার্যদ্রব্য উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ হবে পরমাণু দু'টি, কারণ যে অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয় তাকে সমবায়িকারণ বলে। পরমাণুরূপ অধিকরণে দ্ব্যণুক সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। তাই দ্ব্যণুকরূপ কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে তদীয় দ্ব্যণুকের অবয়ব তথা পরমাণু দু'টি। আর ক্রিয়াজন্য দু'টি পরমাণুর যে সংযোগ তা হবে দ্ব্যণুকরূপ কার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ। আর দ্ব্যণুকের নির্মাতা ঈশ্বর, দ্ব্যণুকের জনক পরমাণুদ্বয় বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, তাঁর দ্ব্যণুকোৎপাদক ইচ্ছা, তাঁর দ্ব্যণুক-নির্মাণে প্রযত্ন, কাল, দিক্, দ্ব্যণুক

[১৭৩] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

প্রাগভাব, এই দ্ব্যণুক পরম্পরাক্রমে যে সকল জীবের সুখ-দুঃখের কারণ হবে সেই জীবের অদৃষ্ট এবং প্রতিবন্ধকাভাব – এই নয়টি হবে নিমিত্ত কারণ। এভাবে ত্রিবিধ কারণ হতে দ্ব্যণুকসমূহ উৎপন্ন হলে পর জীবের অদৃষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রযত্নে ঐ দ্ব্যণুক সমূহে পুনরায় ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া হতে সজাতীয় তিনটি দ্ব্যণুক তথা তিন বায়বীয় দ্ব্যণুক, তিনটি জলীয় দ্ব্যণুক, তিনটি পার্থিব দ্ব্যণুক এবং তিনটি তৈজস্ দ্ব্যণুক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ত্র্যণুক নামক কার্যদ্রব্য উৎপন্ন করে। এই ত্র্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে দ্ব্যণুকত্রয়, অসমবায়িকারণ হবে দ্ব্যণুকত্রয়ের পরস্পর সংযোগ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নয়টি কারণ হবে নিমিত্ত কারণ। ত্রসরেণু-সমূহের উৎপত্তির পর পূর্বোক্ত ক্রমে পুনরায় ত্রসরেণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ফলস্বরূপ সজাতীয় চারটি ত্রসরেণু তথা চারটি বায়বীয়, চারটি জলীয়, চারটি পার্থিব এবং চারটি তৈজস্ ত্রসরেণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অসংখ্য চতুরণুক উৎপন্ন করে। এই চতুরণুরূপ কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে প্রতিটি চতুরণুকরূপ কার্যের অবয়বস্বরূপ চারটি ত্র্যণুক। আর চারটি ত্র্যণুকের পরস্পর সংযোগ হবে অসমবায়িকারণ এবং পূর্বোক্ত নয়টি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রভৃতি হবে নিমিত্ত কারণ। এভাবে পূর্বোক্ত রীতিতে পাঁচটি চতুরণুক মিলিত হয়ে পঞ্চাণুক, ছয়টি পঞ্চাণুক মিলিত হয়ে ষড়ণুক এভাবে ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর, স্থূলতর হতে স্থূলতম কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি চলতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় আরম্ভবাদী; তাই তাঁরা মনে করেন কার্য ও কারণ দু’টি ভিন্ন বস্তু। দ্ব্যণুকাদি উৎপত্তির পূর্বে তা তার সমবায়িকারণ পরমাণুসমূহে নিহিত থাকে না। বরং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে সম্পূর্ণ নতুন একটি কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। কাজেই বৈশেষিকমতে প্রতিটি কার্যদ্রব্য তার স্ব স্ব সমবায়িকারণ হতে ভিন্ন। এই হেতু সৃষ্টি বিষয়ে বৈশেষিক অভিমত আরম্ভবাদ নামে অভিহিত। বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন ‘কারণগুণা হি কার্যগুণারম্ভতে’ অর্থাৎ কারণগতগুণই কার্যগুণকে উৎপন্ন করে। যেমন – তন্তুরূপ পটরূপকে উৎপন্ন করে। কাজেই বৈশেষিকমতে কার্যমাত্রই নতুন সৃষ্টি।

এখানে আপত্তি হতে পারে, বৈশেষিকাচার্যগণ অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ হতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে পরিদৃশ্যমান এই স্থূলজগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু বৈশেষিক-সম্মত জগতের

উৎপত্তি প্রক্রিয়াটি তখনই গ্রহণীয় হবে যদি পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদিও বৈশেষিকমতে পরমাণু অতীন্দ্রিয়; তাই তা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। তা হলে এমন অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – প্রত্যক্ষের সাহায্যে পরমাণুকে জানা আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে সম্ভব না হলেও অনুমানের সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁদের মতে, জানালা দিয়ে যখন সূর্যালোক আমাদের ঘরে প্রবেশ করে তখন আমরা সবাই সেই পতিত সূর্যালোকে অসংখ্য ছোট ছোট ভাসমান কণা দেখতে পাই। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং সুস্থ চক্ষু দ্বারা গৃহীত কণাগুলিকে বৈশেষিকাচার্যগণ ত্র্যণুক নামে অভিহিত করেছেন। কেন্দ্রীভূত সূর্যালোকে ভাসমান এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তা একটি কার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ঘট' নামক বস্তুটি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তা যেমন কার্য বলে বিবেচিত, তদনুরূপ রন্ধ্রপথে পতিত সূর্যালোকে ভাসমান অতীব সূক্ষ্ম কণাগুলি সুস্থ চক্ষু দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তা অবশ্যই কার্য হবে। প্রদত্ত অনুমানটির আকার হল – 'ত্রণ্যুকং কার্যং চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ, ঘটবৎ'। এরূপ অনুমানের দ্বারা ত্রণ্যুকে চাক্ষুষদ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা কার্যত্বকে সিদ্ধ করার পর বৈশেষিকাচার্যগণ আরও একটি অনুমানের দ্বারা ত্রণ্যুকে সাবয়বত্ব সিদ্ধ করেন। তাঁদের এই অনুমানের আকারটি হল – 'জালসূর্যমরীচিস্থং সূক্ষ্মতমং রজঃ স্বল্পপরিমাণদ্রব্যারব্ধং কার্যদ্রব্যত্বাৎ, ঘটবৎ। অভিপ্রায় এই যে, জানালার রন্ধ্রপথ দিয়ে যখন সূর্যালোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেই পতিত সূর্যালোকে যে কণাগুলিকে ভাসমান অবস্থায় দেখায় যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে কণাগুলি, যা সুস্থ চক্ষু দ্বারা গৃহীত হয় তা সাবয়ব অর্থাৎ নিজের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যেহেতু এগুলি কার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঘট একটি কার্যদ্রব্য হওয়ায় তা যেমন নিজের পরিমাণ অপেক্ষা অল্প পরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্য তথা কপালাদি হতে উৎপন্ন হয়, তদনুরূপ সূর্যালোকে ভাসমান অতীব সূক্ষ্ম কণাগুলি তথা ত্র্যণুকগুলি কার্য হওয়ায় তা নিজ পরিমাণের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ তা সাবয়ব হবে। আর ত্র্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যের অবয়বরূপে যা সিদ্ধ হয় তা হল দ্ব্যণুক। যেহেতু তিনটি দ্ব্যণুক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে

ত্র্যণুক উৎপন্ন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, জানালার রন্ধ্রপথ দিয়ে পতিত সূর্যালোকে যে সূক্ষ্মতম কণাগুলিকে ভাসমান অবস্থায় দেখি তা হল পার্থিব ত্র্যণুক। জলীয়, বায়বীয় কিংবা তৈজস্ ত্রণ্যুকাদি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হয় না। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে উক্ত অনুমানের দ্বারা তো কেবল পার্থিব ত্র্যণুক যে সাবয়ব তা সিদ্ধ হয়। কিন্তু জলীয়, তৈজস্ কিংবা বায়বীয় ত্র্যণুককে কি সাবয়ব বলা সঙ্গত হবে? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – ত্রণ্যুকে ত্র্যণুকত্ব জাতি বিদ্যমান, কারণ চতুরণুকের জনকতাবচ্ছেদক রূপে ত্র্যণুকত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকাচার্যগণ চার প্রকার ত্রণ্যুকে চারটি ত্র্যণুকত্ব জাতি স্বীকার করেন – পৃথিবীত্বব্যাপ্য ত্র্যণুকত্ব, জলত্বব্যাপ্য ত্র্যণুকত্ব, তেজস্ত্বব্যাপ্য ত্র্যণুকত্ব এবং বায়ুত্বব্যাপ্য ত্র্যণুকত্ব। উপর্যুক্ত অনুমানে পৃথিবীত্বব্যাপ্য ত্র্যণুকত্ববিশিষ্ট ত্র্যণুককে যদিও পক্ষ করে তাতে সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা হয়েছে, তথাপি ত্র্যণুক সাবয়ব তা সিদ্ধ হলে ঐ একই যুক্তিতে জলীয়, তৈজস্ কিংবা বায়বীয় ত্র্যণুক যে সাবয়ব তা সিদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই বৈশেষিকমতে ত্র্যণুকের অবয়বরূপে দ্ব্যণুকের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এভাবে দ্ব্যণুক সিদ্ধ করার পর বৈশেষিকাচার্যগণ অপর একটি অনুমানের সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করেছেন। তাদের অনুমানের আকারটি হল – ‘ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ, কপালবৎ’। অভিপ্রায় এই যে, মহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব হয়; তদনুরূপ মহত্ত্ব-পরিমাণ-বিশিষ্ট ত্র্যণুকের জনক হওয়ায় ত্র্যণুকের অবয়বও সাবয়ব হবে এবং সেই ত্র্যণুকের অবয়ব যে দ্ব্যণুক তার অবয়ব হল পরমাণু। কাজেই পরমাণু অবশ্য-স্বীকার্য। ফলত বৈশেষিকশাস্ত্রে বর্ণিত পরমাণু হতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহৎ দ্রব্যের উৎপত্তির ক্রম তথা সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ নয়।

বৈশেষিকমতে পরমাণু নিরবয়ব ও নিরংশ। তার উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় তা নিত্য। কিন্তু এখানে আপত্তি হতে পারে – ত্র্যণুক নামক কার্যদ্রব্যের উৎপাদক হওয়ায় দ্ব্যণুককে যদি সাবয়ব বলা হয়; তা হলে দ্ব্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যের উৎপাদক হওয়ায় পরমাণুকেও সাবয়ব বলা হোক। আর যা সাবয়ব তা অবশ্যই উৎপন্ন দ্রব্য হবে অর্থাৎ তার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করতে হবে। ফলত পরমাণুকে আর নিত্য বলা যাবে না। আর

পরমাণুকে নিত্য বলা না হলে বৈশেষিক-সম্মত জগৎ-সৃষ্টির ধারাটি ব্যাহত হবে। এ উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব যদি সাবয়ব দ্রব্য হা, তা হলে অনন্ত অবয়বধারা স্বীকার করতে হবে। সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব, তার অবয়ব, সেই অবয়বের অবয়ব এভাবে চলতে চলতে অনন্ত পথের যাত্রী হতে হবে; অর্থাৎ অনবস্থা অনিবার্য। এজন্য এই অবয়ব ধারার বিশ্রান্তিস্বরূপ একটি নিরবয়ব অবস্থা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; আর তা হল পরমাণু। এখানে কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন – বীজ হতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, আবার সেই অঙ্কুর হতে বীজের উৎপত্তি এরূপ কার্য-কারণ ধারার কোনও শেষ না থাকলেও তাকে তো দোষের বলা যায় না। মূল কথা হল, অনবস্থা হলেই যে তাকে সবসময় দোষের বলা যায় –এমনটা নয়। কাজেই প্রদত্ত স্থলে অনবস্থা হলেও তা দোষাবহ না হোক। এ উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্তরূপ অনবস্থা দোষের নয়; তা হলে হিমালয়ের ন্যায় সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে সর্ষপের যে পরিমাণগত পার্থক্য, তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। অভিপ্রায় এই যে, হিমালয় একটি বৃহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য; আর তার তুলনায় সর্ষপ অতীব ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট একটি দ্রব্য। এখন পরমাণু যদি সাবয়ব হয়, আবার ঐ পরমাণুর অবয়ব যদি অবয়ববিশিষ্ট হয় –এভাবে অনন্ত ধারা যদি চলতে থাকে তা হলে পর্বতকে বিভক্ত করতে থাকলে তার চরম অবয়বে যেমন পৌঁছানো সম্ভব হবে না; তদনুরূপ সর্ষপেরও অনন্ত অবয়বধারা স্বীকার করায় পর্বত ও সর্ষপের যে পরিমাণগত পার্থক্য তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ফলত তাদেরকে সমপরিমাণবিশিষ্ট বলতে হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানি যে, একটি পর্বত এবং একটি সর্ষপ সমপরিমাণবিশিষ্ট নয়। যেহেতু উভয়ের আরম্ভক পরমাণু সমসংখ্যক নয়। কাজেই সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বকে সাবয়ব বলা যায় না; ঐ অবয়ব ধারার বিশ্রান্তি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যে পর্যায়ে ঐ অবয়ব ধারা সমাপ্ত হয়, তাকে বৈশেষিকাচার্যগণ পরমাণু বলেছেন; যা নিরবয়ব ও নিরংশ; যার আর বিভাগ সম্ভব নয়। বৈশেষিকমতে এই নিত্য ও অবিভাজ্য পরমাণুসমূহই হল এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূল উপাদান।

এখন আপত্তি হতে পারে, বৈশেষিক-দর্শনে দু'টি পরমাণু হতে একটি দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুক হতে একটি ত্র্যণুক, চারটি ত্র্যণুক হতে একটি চতুরণুক এভাবে দীর্ঘ পরম্পরা ক্রমে ঘটাদি স্থূল দ্রব্যসমূহের সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এমন গুরু কল্পনা অপেক্ষা পরমাণু হতে সাক্ষাৎভাবে স্থূল দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি ব্যাখ্যা তুলনামূলক সহজ নয় কি? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে বলা যায়, স্থূল কার্যদ্রব্যের উৎপত্তিতে দ্ব্যণুকাদি পরম্পরা স্বীকার না করে যদি পরমাণুসমূহ হতে স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তা হলে মুদ্গরাঘাতে একটি ঘটকে ধ্বংস করা হলে ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্যক্ষ করা যেত না। যেহেতু পরমাণু-সমূহ হতে সাক্ষাৎভাবে কার্য দ্রব্য উৎপন্ন হলে যখন কার্য-দ্রব্যটির ধ্বংস হবে, তখন পরমাণু-সমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর পরমাণু-সমূহ বৈশেষিকমতে অতীন্দ্রিয় হওয়ায় ধ্বংসাবশেষরূপে কিছু প্রত্যক্ষ করা যাবে না। কিন্তু আমরা যখন একটি ঘটকে ভেঙে ফেলি তখন তার ধ্বংসাবশেষ হিসাবে আমরা কিছু অংশ প্রত্যক্ষ করে থাকি। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, পরমাণু-সমূহ হতে সাক্ষাৎভাবে ঘটাদি স্থূল দ্রব্য সমূহ উৎপন্ন হতে পারে না। দ্ব্যণুকাদিক্রমে অর্থাৎ পরমাণু হতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুক, ত্র্যণুক হতে চতুরণুক এভাবে ক্রমে ক্রমে স্থূল কার্যদ্রব্যাত্মক এই নানাত্বের জগতের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে, ঘটাদি স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি পরমাণু-সমূহ হতে না হলেও ত্র্যণুকের উৎপত্তি পরমাণু-সমূহ থেকে হোক; অর্থাৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগজন্য ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হোক। সেক্ষেত্রে ঘটাদি দ্রব্যের বিনাশে অবশিষ্টাংশের আপত্তি হবে না এবং ত্র্যণুক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়ায় ঘটাদি স্থূল বস্তুর ধবংসাবশেষরূপে যা অবশিষ্ট পড়ে থাকবে, তা প্রত্যক্ষযোগ্যও হবে। তাছাড়া দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ায়, পরমাণু-সমূহ হতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকসমূহের সংযোগে ত্র্যণুক এভাবে স্বীকার না করে সাক্ষাৎভাবে পরমাণুসমূহ হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হোক। এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – ত্র্যণুকের উৎপত্তি যদি তিনটি দ্ব্যণুক হতে স্বীকার না করে, ছয়টি পরমাণু হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তা হলে ত্র্যণুকের যে মহত্ত্ব পরিমাণ তার উপপত্তি

হবে না। অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিকমতে অবয়বীর মহত্ত্ব-পরিমাণের প্রতি কার্যদ্রব্যাত্মক অবয়বের বহুত্ব-সংখ্যা, মহত্ত্ব-পরিমাণ প্রভৃতি কারণ হয়ে থাকে। এখন ত্র্যণুক যদি সাক্ষাৎভাবে ছয়টি পরমাণু হতে উৎপন্ন হত তা হলে ত্র্যণুককে আর মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট বলা যেত না। সেক্ষেত্রে তা চক্ষু দ্বারা গৃহীত হতে পারত না। যেহেতু তার অবয়ব পরমাণুতে মহত্ত্ব পরিমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, কার্যদ্রব্যাত্মক অবয়বের বহুত্ব সংখ্যাকেও ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের কারণ বলা যাবে না, যেহেতু পরমাণু কার্যদ্রব্য নয়। কাজেই তার বহুত্ব সংখ্যা ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের কারণ হবে না। কিন্তু ত্র্যণুক প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় মহত্ত্ব পরিমাণবিশিষ্টরূপেই স্বীকৃত। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে পরমাণু হতে সাক্ষাৎভাবে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হতে পারে না; পরমাণু হতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুক এই ক্রমে স্থূল কার্যদ্রব্যসমূহের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এখন যদি বলা হয়, অকার্য পরমাণুর বহুত্ব সংখ্যাকে তো ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের কারণ বলা যেতেই পারে। এর উত্তরে বলা হয়, অকার্য পরমাণুর বহুত্ব সংখ্যাকে যদি ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের কারণ বলা হয়, তা হলে চতুরণুক হতে শুরু করে সমস্ত স্থূল কার্যদ্রব্যের মহত্ত্ব পরিমাণের প্রতি পরমাণু ও তার বহুত্ব সংখ্যা কারণ হবে – এরূপ স্বীকার করতে হবে। ফলস্বরূপ স্থূলদ্রব্য বিনষ্ট হলে তার ধ্বংসাবশেষের উপলব্ধি হবে না। কিন্তু স্থূল দ্রব্য বিনষ্ট হলে তার ধ্বংসাবশেষ রূপে যে কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সর্বানুভবসিদ্ধ। কাজেই স্বীকার করতে হবে চতুরণুক হতে শুরু করে স্থূল দ্রব্যাদি যেমন পরমাণু জন্য নয়, তদনুরূপ ত্র্যণুকও ছয়টি পরমাণু হতে উৎপন্ন হতে পারে না। ত্র্যণুকের মহত্ত্বপরিমাণের উপপত্তির জন্য পরমাণু হতে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। দ্ব্যণুক কার্যদ্রব্য হওয়ায় কার্যদ্রব্যের বহুত্ব সংখ্যা ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের প্রতি কারণ হবে। কাজেই ত্র্যণুকের অবয়বরূপে দ্ব্যণুক অবশ্যস্বীকার্য।

এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন – কার্যদ্রব্যের বহুত্ব সংখ্যা ইত্যাদি যদি ত্র্যণুকাদির মহত্ত্ব পরিমাণের জনক হয়, তা হলে ছয়টি নিত্য পরমাণু হতে ছয়টি অনিত্য তথা কার্য পরমাণু স্বীকার করে তা থেকে যদি ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তা

হলে তো ত্র্যণুকের মহত্ত্ব পরিমাণের উপপত্তিতে কোনওরূপ সমস্যা থাকবে না। কাজেই দ্ব্যণুক স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নেই। এর উত্তরে বলা যায়, যদি একটি নিত্য পরমাণু হতে একটি অনিত্য বা কার্য পরমাণুর উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তা হলে ঐ কার্য পরমাণুর কখনও বিনাশ সাধিত হবে না। কারণ বৈশেষিকমতে কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতি হয় সমবায়ি-কারণের নাশ নতুবা অসমবায়ি কারণের নাশ কারণ হয়ে থাকে। এখন একটি নিত্য পরমাণু হতে একটি কার্য পরমাণু উৎপন্ন হলে ঐ নিত্য পরমাণুটি কার্য পরমাণুটির সমবায়িকারণ হবে। কিন্তু যা নিত্য তার বিনাশ হয় না। ফলত প্রদত্ত স্থলে সমবায়ি-কারণের নাশ সম্ভব হবে না। আবার একটি নিত্য পরমাণু হতে একটি কার্য পরমাণুর উৎপত্তি স্বীকার করা হলে, প্রদত্ত স্থলে নিত্য পরমাণুটি সংখ্যায় একটি হওয়ায় 'অবয়ব-সংযোগ' রূপ অসমবায়িকারণটি এস্থলে স্বীকৃত নয়। কাজেই উক্ত কার্য পরমাণুটির বিনাশ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং ত্র্যণুক নামক কার্যদ্রব্যের মহত্ত্ব পরিমাণের উপপত্তির নিমিত্ত নিত্য পরমাণু হতে কার্য পরমাণু প্রভৃতি স্বীকার না করে দ্ব্যণুক নামক কার্যদ্রব্য স্বীকার করা অধিক শ্রেয়ঃ।

পুনরায় কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ দু'টি পরমাণু সংযোগ হতে একটি দ্ব্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এস্থলে তিনটি বা ততোধিক পরমাণু হতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হলে অসুবিধা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায় – যেখানে দু'টি পরমাণু-সংযোগ হতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, সেখানে তিন বা ততোধিক পরমাণু-সংযোগ হতে প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করলে কল্পনাগৌরব হয়ে থাকে। মূল কথা হল, বৈশেষিকমতে দ্ব্যণুক হল অণুপরিমাণবিশিষ্ট, তা মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য হতে পারবে না। কারণ দ্ব্যণুক মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট হলে দ্ব্যণুকের অবয়ব তথা পরমাণুকে সাবয়ব বলতে হবে। যেহেতু মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়ব সাবয়ব হয়ে থাকে, যেমন – ঘট একটি মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য; তাই তার অবয়ব তথা কপাল সাবয়ব হয়ে থাকে। কিন্তু দ্ব্যণুকের অবয়ব তথা পরমাণু ন্যায়-বৈশেষিকমতে নিরবয়ব ও নিরংশ হয়ে থাকে। তাছাড়া দ্ব্যণুক যদি মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট হত, তা হলে তার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষেরও

আপত্তি হবে। তাই ন্যায়-বৈশেষিক-আচার্যগণ দ্ব্যণুককে অণুপরিমাণবিশিষ্ট বলেছেন। আর যা অণুপরিমাণবিশিষ্ট এবং যেটি প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্য, তা দু'টি পরমাণু-সংযোগ হতে উৎপন্ন -এমন স্বীকার করা অধিক সঙ্গত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে ত্র্যণুক নামক কার্যদ্রব্যটি একটি কিংবা দু'টি দ্ব্যণুক হতে উৎপন্ন হতে পারবে না। তিনটি দ্ব্যণুক হতেই একটি ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুক উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ দু'টি পরমাণু সংযোগ হতে একটি দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুক হতে একটি ত্র্যণুক-এরূপ স্বীকার করেছেন। একটি দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাবে না; কারণ ত্র্যণুক হল মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য। এখন নিয়ম আছে কার্যের মহত্ত্বপরিমাণ হয় তার অবয়বের মহত্ত্বপরিমাণ, আথবা কার্যদ্রব্যাত্মক অবয়বের বহুত্ব সংখ্যা কিংবা প্রচয় নামক শিথিল সংযোগ জন্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। একটি দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হলে ত্র্যণুককে আর মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট বলা যাবে না। কারণ ত্র্যণুকের অবয়ব একটি দ্ব্যণুক হলে, দ্ব্যণুকে মহত্ত্ব পরিমাণ না থাকায় তা হতে ত্র্যণুকে মহত্ত্ব-পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারবে না। তেমনই ত্র্যণুকের অবয়ব একটি দ্ব্যণুক হলে তাতে বহুত্ব সংখ্যা না থাকায় তা হতে যে ত্র্যণুকে মহত্ত্ব পরিমাণের উৎপত্তি হয় -এমনও বলা যাবে না। শুধু তাই নয় ত্র্যণুকের অবয়ব দ্ব্যণুকে প্রচয় নামক শিথিল সংযোগ[১৭৪] না থাকায় তা হতে অবয়বী তথা ত্র্যণুকের মহত্ত্বপরিমাণের উৎপত্তি হয় এমনও বলা যায় না। অথচ ত্র্যণুক একটি মহত্ত্ব পরিমাণ-বিশিষ্ট দ্রব্য। যেহেতু আমরা সুস্থ চক্ষু দ্বারা কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মি ত্র্যণুকের প্রত্যক্ষ করে থাকি। কাজেই একটি দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুক উৎপন্ন হতে পারে না। একইভাবে দু'টি দ্ব্যণুক হতেও ত্র্যণুকের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ প্রথমত ত্র্যণুকের অবয়ব দ্ব্যণুকে মহত্ত্ব পরিমাণ নেই; দ্বিতীয়তঃ দু'টি দ্ব্যণুকে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকলেও বহুত্ব সংখ্যা নেই; তৃতীয়তঃ দ্ব্যণুক দ্বয়ের

[১৭৪] লেপ, তোষকাদিতে যখন তুলা থাকে তখন তাদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ থাকে। তাই তা অল্প পরিমাণবিশিষ্ট দেখতে লাগে। কিন্তু ধুনুরীর সাহায্যে যখন সেই তুলাকে পেঁজা হয় তখন তাদের নিবিড়-সংযোগের নাশ হয় এবং শিথিল-সংযোগের দ্বারা তুলা আয়তনে অনেক বেশি হয়ে যায়। তুলার এই আয়তন বৃদ্ধির কারণই হল তুলাসমূহের শিথিল-সংযোগ।

যে সংযোগ তা শিথিল সংযোগ নয়। কাজেই স্বীকার করতে হয় একটি কিংবা দু'টি নয়; তিনটি দ্ব্যণুক হতেই ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। তবে এখানে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, তিনের অধিক দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হতে পারে। কারণ যেখানে তিনটি দ্ব্যণুক-সংযোগ হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি এবং তার মহত্ত্ব-পরিমাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, সেখানে তিনের অধিক দ্ব্যণুক হতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি স্বীকার করা হলে গৌরব দোষ দেখা দেবে। তাই বৈশেষিকমতে তিনটি দ্ব্যণুক হতেই একটি ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়ে থাকে। একইভাবে চারটি ত্র্যণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি চতুরণুক, পাঁচটি চতুরণুক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি পঞ্চাণুক, ছয়টি পঞ্চাণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি ষড়াণুক এভাবে সপ্তাণুক, অষ্টাণুক ক্রমে স্থূল হতে স্থূলতর, স্থূলতর হতে স্থূলতম বিচিত্র বস্তু সমন্বিত এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়

সুপ্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত মানুষ জগৎ-সৃষ্টির রহস্য উন্মচনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। এই জগতের সৃষ্টি হল কীভাবে? এটি এসেছে কোথা থেকে? যাচ্ছেই বা কোথায়? মহাবিশ্বের কি কোনও শুরু ছিল? যদি কোনো শুরু থেকে থাকে তা হলে তার আগে কি ছিল? কার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট? এই জগতের স্থায়িত্ব কতদিন? যাকিছু সৃষ্ট তা যেহেতু মহাকালের গহ্বরে একদিন বিলীন হয়ে যায় সেহেতু এই বৈচিত্র্যময় যে জগৎ তা কি এক সময় কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে? এই জগতের ধ্বংস কীভাবে হতে পারে? এমন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর মানুষ নিরন্তর খুঁজে চলেছে। সে দার্শনিক হোন কিংবা বৈজ্ঞানিক কিংবা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ আঙ্গিকে জগতের সৃষ্টি রহস্যের সমাধান খুঁজছেন। যদিও সকলের মূল লক্ষ্য এক; তা হল জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের সৃষ্টিরহস্যের সমাধান অনুধাবন। তথাপি তাঁদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। যাঁরা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ, তাঁরা তাঁদের ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের আলোকে জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যিনি দার্শনিক তিনি যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন। আবার যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে জগৎ এর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। মূল কথা হল বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক তাঁদের মূল লক্ষ্য মূলত এক - জগৎ-সম্পর্কীয় নানা রহস্যের অনুসন্ধান; যদিও তাঁদের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

বর্তমান অধ্যায়ে আমি মূলত আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ে আলোকপাত করব। যদিও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আমী একজন দর্শন শাখার ছাত্রী হয়ে হঠাৎ কেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান অনুসন্ধানে সময় ব্যয় করছি? প্রকৃতপক্ষে আমার গবেষণার মূল বিষয় হল বৈশেষিক-দর্শনের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপ অনুধাবন; তথাপি বর্তমান অধ্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপ বিষয়ে

কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করছি। কারণ আমরা জানি আজকের মানুষ অধিক মাত্রায় বিজ্ঞানমুখী। তাঁরা ধর্মীয় লোকগাথা কিংবা আপ্তের বাণী অপেক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর অধিক আস্থা পোষণ করে থাকেন। বিজ্ঞান যা সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেছে কিংবা যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাকেই তাঁরা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরভাবে অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারবো যখন বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করেনি তখন অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তার মধ্যে আজকের মহীরুহরূপী আধুনিক যে বিজ্ঞান তার অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়ে গিয়েছিল। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে বলে দাবী করেন তার বহু ধারণাই শত শত বছর পূর্বে অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তায় সমুদ্ভাসিত। আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে বিষয়টা অনুধাবনের চেষ্টা করি তা হলে বুঝতে পারবো সহস্রাধিক বছর পূর্বে আমাদের ভারতীয় আচার্যগণ যে সুতীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি এবং বিচার-বিশ্লেষণশৈলী প্রয়োগ করে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ-ব্যাখ্যা হতে কোনও অংশে কম বলে মনে হয় না। যদিও সে সময় আজকের মত আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত পরীক্ষণাগার কিংবা উন্নত প্রযুক্তি ছিল না, তথাপি সত্যদ্রষ্টা মহর্ষিগণ তাঁদের উন্নতচিন্তা ও কঠোর অধ্যাবসায়ের দ্বারা সেই সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন; আজ যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের সূক্ষ্ম মেধাশক্তির আলোকে পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করছেন কিংবা ভবিষ্যতে করবেন। যাই হোক আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন এবং বৈশেষিক-দর্শনের প্রেক্ষিতে তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করাই হল আমার এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানে যে দু'টি মত অধিক প্রচলিত, তাদের একটি হল সদা সমাবস্থা-তত্ত্ব বা স্থিতাবস্থাশীল-তত্ত্ব (Steady State Theory) এবং আর একটি হল বিবর্তন তত্ত্ব (Theory of the Evolving Universe). অ্যারিস্টটল (Aristotle) –এঁর সময়কাল (আনুমানিক ৩৮৪ - ৩২২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) হতে পরবর্তী একশত বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস ছিল – মানবজাতি এবং তার চারপাশের

এই বিশ্ব-জগৎ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। মূল কথা হল, আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি তা চিরকালই অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান। মানুষ জন্মানোর পর থেকে যেভাবে জগৎকে দেখে আসছে, জগৎ আসলে তেমনই। মানুষ শৈশবে জগৎকে যেমন দেখেছে, কৈশোর ও যৌবনের গণ্ডি পেরিয়ে যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখনও জগৎকে তেমনই দেখবে। এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি ছিল – আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহ কিংবা তাঁদের পিতামহ-প্রপিতামহ সবাই যেভাবে জগৎকে দেখে আসছে, জগৎ প্রকৃতপক্ষে তেমনই রয়েছে। কাজেই বলা যায়, এই মহাবিশ্বকে আমরা যেভাবে দেখে আসছি, তা তেমনই চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল।

স্যার্ আইজ্যাক্ নিউটন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মহাকর্ষতত্ত্বটি আবিষ্কারের পর জগৎ সম্পর্কে উক্ত ধারণাটি ভেঙে পড়তে থাকে। কারণ মহাকর্ষতত্ত্ব অনুসারে, এই জগত-এর সমস্ত বস্তুই একে অন্যকে একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে। যাকে মহাকর্ষ বল বলা হয়েছে। যাই হোক মহাকর্ষতত্ত্ব স্বীকৃত হলে, আর জগতের স্থিতাবস্থা স্বীকার করা যাবে না। এই জগৎ যে স্থির নয়, তা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে – এই তথ্যটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডুইন পি. হাব্ল (Edwin P. Hubble). তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ঘোষণা করেন যে, এই মহাবিশ্বে রয়েছে লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ (Galaxy)। তার মধ্যে আমরা যে ছায়াপথের বাসিন্দা, তার নাম হল আকাশগঙ্গা ছায়াপথ (Milky way). এই ছায়াপথে দশ হাজার কোটি নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে। যার মধ্যে সূর্য হল মধ্যম আকারের একটি নক্ষত্রমাত্র। যাই হোক হাব্ল সর্ব প্রথম লক্ষ্য করলেন, একটা ছায়াপথ অন্য ছায়াপথ হতে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি আলোক তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, আমাদের সাপেক্ষে কোনও ছায়াপথের যদি গতি থাকে তা হলে সেখান থেকে ছুটে আসা আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মনে হবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ডপলার শিফট (Doppler Shift)[১৭৫]।

[১৭৫] এই তত্ত্ব অনুসারে কোন চলমান বস্তু থেকে নির্গত শব্দ কিংবা আলোক বস্তুর গতিবিধির কারণে আমাদের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এখন একটা চলমান গাড়ি যদি হর্ন বাজাতে বাজাতে তার পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তাহলে গাড়িটি যখন ব্যক্তির কাছাকাছি আসতে থাকে,

ছায়াপথের কোনও নক্ষত্র যদি আমাদের সাপেক্ষে দূরে সরে যায়, তাহলে আলোক তরঙ্গটি বিস্তৃত হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় রেড শিফট (Red Shift)। আর যদি আমাদের সাপেক্ষে নক্ষত্রটি কাছে আসত, তা হলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকবে। একে বলা হয় ব্লু শিফট (Blue Shift)[১৭৬]। বিজ্ঞানী হাব্‌ল দেখলেন, একেক ছায়াপথ থেকে আসা আলোক তরঙ্গ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, ছায়াপথগুলি আমাদের সাপেক্ষে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ হল এই জগৎ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে।

'মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে'[১৭৭] হাব্‌ল এর এই সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করা যায় একটা সময় ছিল যখন সমস্ত বস্তুপিণ্ড পরস্পরের নিকটে অবস্থান করতো। তারপর কোনওও এক সময়ে সবকিছু গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল। মনে করা হয় আনুমানিক দশ কিংবা কুড়ি হাজার মিলিয়ান বছর পূর্বে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু একই জায়গায় ছিল। সেই সময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম। মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু এবং শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে একটি অতিক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'মহাডিম্ব' (Cosmic Egg). ঐ অতিক্ষুদ্র পিণ্ডটির ভিতরের তাপমাত্রা ছিল বহু লক্ষ ফারেনহাইট। প্রচণ্ড চাপ ও ঘনত্বের কারণে একদিন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবিস্ফোরণ বলতে বিজ্ঞানিগণ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন প্রসারণকে বুঝিয়েছেন। এই বিস্ফোরণের পর অতি ঘন পিণ্ডটি টুকরো টুকরো অংশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার

তখন তার কম্পাঙ্ক এক রকম থাকে; আবার যখন গাড়িটি পাশ কাটিয়ে চলে যায় তখন তার কম্পাঙ্ক অনেক কম বলে মনে হয়। এর কারণ হল গতিশীলতার কারণে শব্দের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হচ্ছে। অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ক্রিশ্চিয়ান ডপ্‌লার ১৮৪২ সালে প্রথম এই ঘটনাটির বর্ণনা দেন। তাই তাঁর নাম অনুসারে এই ক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে ডপ্‌লার ক্রিয়া (Doppler Shift).

[১৭৬] দৃশ্যমান আলোতে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে লম্বা হয় আর নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোট হয়। তাই দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গটি যদি ক্রমাগত লাল হয় তাহলে বুঝতে হবে তা আমাদের সাপেক্ষে তারকাটি ডুরে ডুরে যাচ্ছে। আর যদি আলোক তরঙ্গটি নীল হয় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সাপেক্ষে তার দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে। দূরত্বের এই হ্রাস-বৃদ্ধি তথা পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য যথাক্রমে 'ব্লু শিফট' (blue shift) এবং 'রেড শিফট' (red shift) এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

[১৭৭] Bartusiak, Marcia, The Day We Found the Universe, New York, Pantheon Books, 2009, pages – 250-270.

বেগে ছুটতে থাকে। এই গতিশীল বস্তু থেকেই নীহারিকাপুঞ্জ কিংবা ছায়াপথ সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের মতে এই আদি বিস্ফোরণ (Big Bang)[১৭৮] থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েই চলেছে। এই প্রসারণ কোটি কোটি বছর ধরে চলতে থাকবে। তারপর একটা সময় আসবে যখন মহাকর্ষের প্রভাবে এই প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রচণ্ড চাপের কারণে যাবতীয় বস্তু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। বছরের পর বছর ধরে এভাবে সঙ্কুচিত হতে হতে একটা সময় সবকিছু পুনরায় অতি ঘনত্ববিশিষ্ট পিণ্ডে পরিণত হবে। তারপর আবার ঘটবে মহাবিস্ফোরণ[১৭৯]। এভাবে সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বয়ে চলবে।

বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন, বিস্ফোরণের সময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আয়তন ছিল শূন্য এবং উত্তাপ ছিল অসীম। কিন্তু মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হতে থাকল, তখন তার তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকল। বিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রিতে নেমে এসেছিল। এই তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চেয়েও এক হাজার গুণ বেশি। বিস্ফোরণের প্রায় একশ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমতে কমতে নেমে এসেছিলো আনুমানিক একশ কোটি ডিগ্রিতে। এরকম তাপমাত্রা সব চেয়ে উত্তপ্ত যে তারকা তার অভ্যন্তরে পাওয়া যেতে পারে। এরূপ উত্তাপের মধ্যে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বলের (Strong Nuclear Force) আকর্ষণ থেকে প্রোটন ও নিউট্রন মুক্ত হতে না পেরে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন একসঙ্গে মিলিত হয়ে ডুয়েটোরিয়াম (Deuterium) নামক ভারি হাইড্রোজেন গঠন করতে থাকে। এরপর ঐ ডুয়েটোরিয়াম (Deuterium) কেন্দ্রক আরও প্রোটন ও নিউট্রন কণাকে সংযুক্ত করে হিলিয়াম (Helium) গঠন করতে থাকে। সাধারণত দু'টি করে প্রোটন ও দু'টি করে নিউট্রন নিয়ে তৈরি হয় হিলিয়াম

[১৭৮] বিজ্ঞানের জগৎ-এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ে এটি একটি সর্বজন গৃহীত তত্ত্ব। ১৯২৯ সালে বেলজিয়ামের ধর্মপ্রচারক জর্জ এদুয়ার ল্যমেত্র সর্বপ্রথম এই তত্ত্বের সাহায্যে জগৎ-এর সৃষ্টি বর্ণনা করেছিলেন। এই তত্ত্বের অনুসারে আনুমানিক ১ হাজার ৩৮০ বছর পূর্বে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও অতীব ঘন এক বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিশ্বজগৎ-এর সৃষ্টি হয়েছে।

[১৭৯] Hawking, Stephen, *A Brief History of Time*, London, Bantam Books, 1988, pages – 39-58.

(Helium)। এভাবে আরও প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত হয়ে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থ যেমন – লিথিয়াম (Lithium), বেরিলিয়াম (Beryllium) প্রভৃতির সৃষ্টি হতে থাকে। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'Big Bang Nucleosynthesis'[১৮০] বলে।

বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হিলিয়াম (Helium) ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত কেবল সম্প্রসারণ ঘটে চলে। এরপর তাপমাত্রা যখন কয়েক হাজার ডিগ্রিতে নেমে আসে তখনই বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুগুলি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে তার উত্তাপ ক্রমশঃ কমতে থাকে। এমতাবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সমস্ত স্থানের ঘনত্ব, গড় ঘনত্ব থেকে সামান্য বেশি, সেই সমস্ত অঞ্চলের অতিরিক্ত মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সেই সমস্ত স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এখন যে সমস্ত স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে তার চারপাশের অংশের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য ঐ স্থানের সমস্ত পদার্থগুলি ঘুরপাক খেতে শুরু করে এবং তার চারপাশের ধূলিকণা প্রভৃতিকে গ্রাস করে নিজেদের আয়তন ও ঘনত্ব বাড়াতে থাকে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে হতে একসময় নীহারিকার সৃষ্টি করে। এই নীহারিকাগুলির মধ্যে যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস তা ক্ষুদ্রতর মেঘখণ্ডে ভেঙে পড়ে এবং নিজেদের মহাকর্ষের চাপে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এগুলির সঙ্কোচনের এবং আভ্যন্তরীণ পরমাণুসমূহের সংঘর্ষের ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে একসময় কেন্দ্রকীয় সংযোজন অভিক্রিয়া (Nuclear Fusion Reaction)[১৮১] শুরু হয়ে যায়। ফলস্বরূপ যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে তার জন্য চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মেঘগুলির অধিকতর সঙ্কোচন বন্ধ হয়ে

---

[১৮০] R. A. Alpher, H. Bethe, G. Gamow, "The Origin of Chemical Elements", American Physical Society, Vol 73, Iss. 7 (1st April, 1948) : 803-804
https://doi.org/10.1103/PhysRev.73.803

[১৮১] কেন্দ্রকীয় সংযোজন অভিক্রিয়া (Nuclear Fusion Reaction) হল একধরণের বিক্রিয়া যার মাধ্যমে দুটি হাল্কা পারমাণবিক নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে একটি ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে, যার ফলে বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।

যায়। তখন সেগুলিই মহাকাশে নক্ষত্র-রূপে জ্বলজ্বল করতে থাকে। এরপর সেই নক্ষত্রগুলি তাদের আভ্যন্তরীণ হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার পুড়িয়ে হিলিয়াম তৈরি করতে থাকে। এর ফলস্বরূপ যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা তাপ ও আলোক-রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমরা সূর্য থেকে যে তাপ এবং আলোক পেয়ে থাকি, যা আমাদের জীবকুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য, সেই আলোক ও উত্তাপ আসলে সূর্যেরই হাইড্রোজেন দহন হতে উৎপন্ন শক্তি বিশেষ।

এখন বৃহৎ যে তারকাগুলি সেগুলি নিজেদের বৃহত্তর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বেশি উত্তপ্ত হতে থাকে। ফলত কেন্দ্রকীয় সংযোজন প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর হয়। এমতাবস্থায় মাত্র দশ কোটি বছরের মধ্যেই তাদের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যে সঙ্কোচন শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং অঙ্গারের মতো আরও ভারী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এর ফলে তারকাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চল অতীব মাত্রায় সঙ্কুচিত হতে হতে কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole)[১৮২]-এর মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর তার বাইরের অংশ অনেক সময় বিরাট বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান অংশ থেকে নানা নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় আর বাকি অংশ সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঐ নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। যাদেরকে গ্রহ বলা হয়ে থাকে। আর এমনই একটি গ্রহ হল আমাদের এই পৃথিবী।

সৃষ্টির আদিতে আমাদের এই পৃথিবী ছিল আজকের চেয়ে বহুগুণ বড় এবং ভীষণ উত্তপ্ত, সেখানে না ছিল কোনও বায়ুমণ্ডল, না ছিল বৃষ্টির মেঘ, চারিদিক্ বিষাক্ত নানা গ্যাস, ধুলোর মেঘ। তারপর কোটি কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে উপরিভাগ শীতল হতে থাকে। গ্যাসীয় উপাদানগুলি প্রথমে তরলে তারপর কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন

---

[১৮২] বিজ্ঞানীদের অনুমান কৃষ্ণগহ্বর হল একটি মৃত নক্ষত্র। যা অতীব ঘনত্ববিশিষ্ট। এর ভর এত বেশি যে এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোনকিছুকে তার ভেতর হতে বেরোতে দেয় না। কোনো তড়িৎচুম্বকীয় বিকরণ তথা আলোককেও বের হতে দেয় না। তাই এই স্থানটি দেখতে কালো গর্তের ন্যায়। এই স্থানের মহাকর্ষীয় বলের মান এতটাই বেশি যে এটি মহাবিশ্বের অন্যান্য বলকেও অতিক্রম করে যায়।

প্রস্তর প্রভৃতি হতে নির্গত বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল গঠিত হল। তবে সেই বায়ুমণ্ডলও কিন্তু জীবের বাসের উপযোগী ছিল না। কারণ তা নানা বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ ছিল, বেঁচে থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য যে অক্সিজেন তখনও তা সৃষ্টি হয়নি। এরপর ঐরকম পরিবেশে জীবনধারণ ও বংশ বিস্তার করতে পারে এমন কিছু জীবের আবির্ভাব ঘটল মহাসমুদ্রে। তারপর কালের নিয়মে কেউ টিকে থাকতে পারল আবার কেউ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এভাবে চলতে চলতে একসময় সৃষ্টি হল এককোশী জীব অ্যামিবার। এরপর এলো সামুদ্রিক কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তারপর মাছ গোত্রের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল। এরপর ১০০ মিলিয়ন বছর পর উদ্ভিদ জন্মালো। তারপর সামুদ্রিক জীবরা ক্রমান্বয়ে স্থলভাগে বিচরণ করতে লাগলো এবং বংশবিস্তার করতে লাগলো। এর পরবর্তী ১৪০ মিলিয়ন বছর ধরে চলল সরীসৃপের যুগ। তারপর আসে পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবেরা। এবং সবশেষে পৃথিবীতে আসে মানুষ। যারা বর্তমান দিন পর্যন্তও রাজত্ব করে চলেছে এই পৃথিবীর বুকে। কোটি কোটি বছর ধরে নানা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে পৃথিবীর বহির্ভাগে ও অন্তরভাগে। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবকুলের ওপর। যারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে পারছে অর্থাৎ বিবর্তনের ধারাপথে নিজেদের অভিযোজিত করতে পারছে তারা টিকে যাচ্ছে আর যারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে তারা পৃথিবী হতে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এভাবেই জগৎ এর সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে আধুনিক বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য সঙ্কোচন ও প্রসারণের নীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল। প্রচণ্ড চাপ ও ঘনত্বের কারণে এক সময় তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর সেগুলি প্রচণ্ড গতিতে ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রসারিত হতে হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু তথা নানা নক্ষত্রপুঞ্জ, আমাদের এই পৃথিবী, মেঘরাশি, জল, আলো, বাতাস, প্রাণী সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। আবার যখন এই মহাবিশ্বের চাপ ও তাপ ক্রমশঃ কমে আসবে, তখন শুরু

হবে সঙ্কোচনের পালা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে অতিক্ষুদ্র কিছু মৌল উপাদানে পরিণত হবে। তারপর আবার ঘটবে মহাবিস্ফোরণ; তারফলে নতুন সৃষ্টি আসবে। সেই সৃষ্টির পর পুনরায় সঙ্কোচন তথা প্রলয় -এভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের তথা প্রসারণ ও সঙ্কোচনের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বজগৎ আবর্তিত হয়ে চলবে যুগ হতে যুগান্তর। এই আবর্তনের কোনো শেষ নেই। এখন আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রক্রিয়া অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারবো আজ থেকে সহস্রাধিক বছর পূর্বে ভারতীয় আচার্যগণ একথাই বলে গিয়েছেন। *বৈশেষিক-দর্শনে* বলা হয়েছে, এই জগৎ-সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছে। আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি, সেই জগতের সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় ছিল এবং সেই প্রলয়ের পূর্বে এক সৃষ্টি ছিল এবং সেই সৃষ্টির পূর্বে ছিল অন্য প্রলয় - এভাবে অনন্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় আমরা যদি বৈশেষিক-সম্মত জগৎ-সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করি তা হলে বুঝতে পারবো তাঁদের সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনার মূলেও রয়েছে সঙ্কোচন-প্রসারণের ধারণাটি। *প্রশস্তপাদভাষ্যে* বলা হয়েছে –'ততঃ পুনঃ প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে মহেশ্বরসিসৃক্ষানন্তরং সর্বাত্মগতবৃত্তিলব্ধাদৃষ্টাপেক্ষেভ্যস্তৎসংযোগেভ্যঃ পবনপরমাণুষু কর্মোৎপত্তৌ তেষাং পরস্পরসংযোগেভ্যো দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ মহান্ বায়ুঃ সমুৎপন্নো নভসি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি'[১৮৩]। মূল কথা হল, ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা জাগরিত হলে সমস্ত জীবাত্মার কার্যোন্মুখ অদৃষ্ট, আত্মা এবং পরমাণুর সংযোগ হতে প্রথমে বায়ুর পরমাণুতে কর্মের উৎপত্তি হয়। তারফলে দু'টি বায়বীয় পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি দ্ব্যণুক, তারপর তিনটি দ্ব্যণুক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি ত্র্যণুক, চারটি ত্র্যণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি চতুরণুক, পাঁচটি চতুরণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি পঞ্চনুক, এভাবে ষড়ণুক, সপ্তাণুক, অষ্টাণুক এইক্রমে মহান বায়ু উৎপন্ন হয়। তারপর সেই বায়ুতে জলীয় পরমাণু সকল হতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান জলের সৃষ্টি হয়। পুনরায় সেই জলরাশিতে পার্থিব পরমাণু সকল হতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহতি পৃথিবী এবং তৈজস্ পরমাণু সকল হতে

[১৮৩] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান তেজোরাশি উৎপন্ন হয়। এভাবে প্রসারিত হতে হতে ক্রমান্বয়ে স্থূল থেকে স্থূলতর, স্থূলতর থেকে স্থূলতম জাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সংহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন – 'ব্রাহ্মেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রহ্মণোপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং...পূর্বস্য পূর্বস্য বিনাশঃ ততঃ প্রবিভক্তাঃ পরমাণবোহবতিষ্ঠন্তে ধর্মাধর্মসংস্কারানুবিদ্ধা আত্মানস্তাবন্তমেব কালম্'[১৮৪]। অভিপ্রায় এই যে, দীর্ঘ জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবর্তিত জীবকুলকে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত পরমেশ্বর এই জগতের সংহারের ইচ্ছা করেন। এর ফলে জাগতিক বস্তুসমূহের পরমাণুসকল স্পন্দিত হয়। এর ফলে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পরমাণুর সঙ্গে তার পূর্বদেশের বিভাগ উৎপন্ন হয়। ফলস্বরূপ দু'টি পরমাণুর মধ্যে যে সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণু সংযোগ বিনষ্ট হলে অসমবায়িকারণের নাশে প্রথম উৎপন্ন যে কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুক তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে তাতে সমবেত ত্র্যণুকের বিনাশ ঘটে। ত্র্যণুক বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত চতুরণুক বিনষ্ট হয়, চতুরণুক বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত পঞ্চণুক, পঞ্চণুক বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত ষড়ণুক এভাবে সপ্তাণুক, অষ্টাণুক ক্রমে মহতি পৃথিবী, মহান জল, মহান তেজ ও মহান বায়ু বিনষ্ট হয়। এইক্রমে দৃশ্যমান এই বিশ্বজগৎ ও জগতের যাবতীয় জাগতিক বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যদিও পরিশেষে এই জগতের মৌল উপাদান কিছু অবিভাজ্য পরমাণু এবং পরবর্তী সৃষ্টির নিমিত্ত নিত্য আত্মা, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। কাজেই এখানেও দেখা যাচ্ছে স্থূল মহতি বিশ্বজগৎ ছোট হতে হতে ক্রমশঃ অতীব ক্ষুদ্র পরমাণুতে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং জগতের সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান কল্পে আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আজকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন, তার একটা আভাস বৈশেষিকাচার্যগণ বহুকাল পূর্বে দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁরা আজকের যুগের বিজ্ঞানীদের মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কষ্টীপাথরে যাচাই করে প্রমাণের অবকাশ পাননি, তথাপি এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার যে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয়ে চলেছে, তা তাঁদের দূরদর্শী মননে আজ থেকে সহস্রাধিক বছর পূর্বেই ধরা দিয়েছিল।

---

[১৮৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

এখন মনে হতেই পারে, বিজ্ঞান তো সবকিছুর সৃষ্টির মূলে একজন ঈশ্বররূপী কোনও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সত্তাকে টেনে আনেন না; তা হলে দর্শনের সৃষ্টি-ব্যাখ্যায় কেন তাঁকে সর্বোচ্চ আসনে বসানো হয়েছে? কেন বলা হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে, তিনি চাইলেই জগতের সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস হবে, আর তিনি না চাইলে যেন কিচ্ছুটি হবে না? এর উত্তরে বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দম্ভে আমরা মানুষ, আমাদের ক্ষমতা যে সীমিত, তা আমরা দিন দিন ভুলতে বসেছি। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরূপ প্রভাব আমাদের জীবনে নেমে আসে নানা মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আকারে তখন আমরা বুঝতে পারি এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের মত সসীম জীবের নেই। মূল কথা হল, যেখানে বিজ্ঞান আর ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না সেখানেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতেই হয়। যেমন জগতের সৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, নক্ষত্রজগৎ-সৃষ্টির আগে অনন্ত মহাশূন্যের কোণে জমতে শুরু করেছিল এক রকমের আদিম কণিকা। পরে এই কণিকাগুলি জমাট বেঁধে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। একসময় এই অতীব ঘনত্বযুক্ত পিণ্ডটি অতিরিক্ত তাপ ও চাপের কারণে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছুটতে শুরু করে। তখন তার মধ্যে থাকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি আদিম কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে। সেই মৌলিক পদার্থগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে বিভন্ন অনুপাতে যুক্ত হয়ে নানা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এভাবেই আমাদের প্রাণের উৎস সূর্য, আমাদের আবাস্থল এই নীলাভ গ্রহটি, এ ছাড়াও নানা নীহারিকামণ্ডলী, ধুমকেতু প্রভৃতি নিয়ে যে বিশ্বজগৎ তার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এখানেই আমাদের ভাবনাকে থামিয়ে না দিয়ে যদি তাকে আরেকটু প্রসারিত করা যায় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে এই যে আদিম কণাগুলি থেকে জগতের সৃষ্টি হল; এগুলি সৃষ্টির শুরুতে এলো কোথা থেকে? তাদের সৃষ্টি করল কে? এখানেই কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেন না। কাজেই স্বীকার করতে হয় নিশ্চয়ই একজন

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রয়েছেন, যিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা। যাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয়ে থাকে।

তবে এখানে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, দর্শনেই কেবল ঈশ্বর প্রভৃতি পূর্বতঃসিদ্ধ-ধারণাগুলি স্বীকৃত হয়েছে। আমরা যদি বিজ্ঞানের আলোচনার-পরিসরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, তা হলে বুঝতে পারবো বিজ্ঞানেও এমন পূর্বতঃসিদ্ধ-ধারণা গৃহীত হয়েছে। যেমন - শক্তি (Energy) এর ধারণা। তাঁদের মতে আমাদের এই জগৎ-এ যা কিছু ঘটে তার মূল কারণ হল এই শক্তি। এই যে লাইট জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, মেশিনে জামা-কাপড় কাচা হচ্ছে, রান্না করা হচ্ছে, চলমান দূতাবাসে তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে, যানবাহন ছুটছে, আমরা নানা-কাজ করছি, কথা বলছি, চিন্তা করছি - এসবের মূলে রয়েছে শক্তি। জগৎ-এর যাবতীয় পরিবর্তন, ঋতুবৈচিত্র, এসব কিছুই প্রাকৃতিক-শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তিকে যেমন সৃষ্টি করা যায় না, তাকে ধ্বংসও করা যায় না। তা এক, নিত্য এবং শাশ্বত। যদিও তা নানারূপে পরিবর্তিত হয়। যেমন- স্থিতিশক্তি হতে গতিশক্তিতে, তাপশক্তি হতে বিদ্যুৎ-শক্তিতে - এভাবে এক শক্তি নানাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তিকে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এই যে ট্রেন ছুটছে, পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে - শক্তির এরূপ বিচিত্র-কাজ দেখে অদৃশ্য-শক্তিকে আমরা আনুমান করে থাকি। তদনুরূপ আমরা যদি ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনের প্রতি আলোকপাত করি তাহলে বুঝতে পারবো তাঁরাও স্বীকার করেন এই জগৎ এবং জাগতিক-ঘটনাসমূহের মূল কারণ হল এক অদৃশ্য শক্তি বিশেষ। যাঁকে ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ 'ঈশ্বর' নামে আভিহিত করেছেন। এই ঈশ্বরকে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। তাঁকে আমরা অনুমানের মাধ্যমে জানতে পারি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বর-সাধক অনুমানের আকারটি হল- 'ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং কর্তৃজন্যং (সকর্তৃকং) কার্যত্বাদ্ ঘটবৎ' অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি কার্য যেমন কর্তৃজন্য তেমনি ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি কার্যও কর্তৃজন্য। এখানে 'ক্ষিত্যঙ্কুর' শব্দের অর্থ প্রথমোৎপন্ন কার্য। যদিও ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ মনে করেন দ্ব্যণুক হল প্রথমোৎপন্ন-কার্য। কিন্তু প্রদত্ত স্থলে দ্ব্যণুককে পক্ষ করা যাবে না। কারণ দ্ব্যণুক অতীন্দ্রিয় হওয়ায় চার্বাক কর্তৃক স্বীকৃত নয়। আবার রঘুনাথ

শিরোমণি দ্ব্যণুককে স্বীকারই করেননি। যেহেতু তা প্রত্যক্ষগম্য নয়। কাজেই প্রদত্ত স্থলে দ্ব্যণুককে পক্ষ করলে চার্বাক, রঘুনাথ প্রভৃতির মতে পক্ষাসিদ্ধি দোষ ঘটবে। তাই 'ক্ষিত্যঙ্কুরাদি'কে পক্ষ করা হয়েছে। আর 'আদি' পদে এখানে ত্র্যণুকাদিকেও বুঝতে হবে। সুতরাং যিনি যাকে প্রথমোৎপন্ন কার্য মানেন তাকেই এস্থলে পক্ষ ধরতে হবে। কাজেই আর পক্ষাসিদ্ধির আশঙ্কা থাকবে না। প্রদত্ত আনুমানের সাধ্য হল কর্তৃজন্যত্ব, হেতু হল কার্যত্ব এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটরূপ কার্য-দ্রব্যকে ধরা হয়েছে। মূল কথা হল ঘটাদি কার্যের অচেতন-কারণসমূহ তথা, দন্ত, চক্র, কপালে প্রভৃতি উপস্থিত থাকলেও একজন চেতন কর্তা তথা কুম্ভকারের সহযোগিতা ব্যতীত যেমন কেবল জড় কারণসমূহ হতে ঘট প্রভৃতি কার্য জন্মায় না; তদনুরূপ ক্ষিত্যঙ্কুর, জলাঙ্কুর প্রভৃতি কার্য হওয়ায় অবশ্যই এসব কার্যের পূর্বে একজন চেতন কর্তার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। আর তিনিই হলেন ঈশ্বর। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বৈশেষিকাদি দর্শনেও এক অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে, যিনি আমাদের পরিদৃশ্যমান-নানাত্বের-জগৎ এবং জাগতিক ঘটনাবলীর মূল কারণ।

আমাদের এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ-এ আমরা দেখি ছয়টি ঋতুর আনাগোনা। এখানে গীষ্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসকে ঘিরে। গীষ্মের দাবদাহে যখন ধরণী থরহরি-কম্প, যখন একবিন্দু জলের জন্য চাতক আকাশের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায়, যখন জীবকুলে ত্রাহি ত্রাহি রব উদ্গাত হয়। তখনই প্রকৃতির অমোঘ আশীর্বাদরূপে ধরণী-বক্ষে আবির্ভূত হয় বর্ষাঋতু। এই বর্ষাঋতুতে দাবদাহে-ক্লিষ্ট তরু-তৃণরাজি সজল সম্ভারে প্রাণময় হয়ে ওঠে। আকাশে চলে কালো-মেঘের আনাগোনা। আর সেই মেঘের গুরুগম্ভীর-শব্দের মাঝে ধরণীর বুকে নেমে আসে প্রগাঢ় শান্তি। বর্ষার বরিষণে কবি-মনে জাগে উল্লাস, সঞ্চারিত হয় মধুর রস-মাধুরি। নদীনালা পূর্ণ হয়ে ওঠে; সুগম হয় জলযানের গমনাগমনে। এভাবে বর্ষাঋতুর প্রান্ত ধরে ধরণীর-বুকে আবির্ভূত হয় শরৎ-এর। তখন বর্ষার বর্ষণক্লান্ত সাদা মেঘ পুঞ্জের বাতাসে ভেসে বেড়ানোর উন্মাদনা আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষার রসসিক্ত ধরণী সবুজ-শ্যামলা হয়ে ওঠে। কাশবনে জাগে বায়ুর হিল্লোল। আর বাঙালীর মনে মৃদু হলেও জেগে ওঠে পুজোর সানাই, আগমনীর পদচ্ছায়া। তারপর

মহাসমারোহে পালিত হয় দুর্গাপুজো। এই শরৎ-ঋতুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হয়ে ওঠে। এরপর আসে হেমন্ত, সেখানে মাঠে মাঠে শষ্যের-প্রাচুর্য আমাদের চোখে পড়ে। চোখে পড়ে পাকা-শষ্যকে ঘরে তোলার উন্মাদনা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবান্নে মেতে ওঠে এবং হেমন্তের নাতিশীতোষ্ণ-বায়ুমণ্ডল জীবের প্রাণ জুড়ায়। তারই সূত্রধরে আসে শীত। উত্তুরে-হাওয়ার দাপটে তখন আমাদের শীত-বস্ত্রের আনুসন্ধানে রত হতে হয়। এই সময় বেড়ানোর উন্মাদনা আমাদের মনে দেখা দেয়। বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আমন্ত্রণ, রঙ-বেরঙের নানা শীত-পোষাকে-সজ্জিত হয়ে বেড়িয়ে পড়ার উন্মাদনা, কচি-কাঁচাদের কলকাকলি আর নলেন গুড়ের নানা সুস্বাদু পিঠে-পায়েসের সমাহারে শীত আমাদের রসনার পরিতৃপ্তি ঘটায়। এই শীতের প্রান্তে উপস্থিত হয় বসন্ত, যাকে বলা হয় ঋতুরাজ। কত ফুলের সমারোহ। এই ঋতুতে মানুষের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোথাও ঘুরে আসার অদম্য বাসনা এসময় চেপে ধরে আমাদের মনকে। এই বসন্তকে নিয়ে কবিদের কল্পনার অন্ত থাকে না। এই ভাবে ধরণীবক্ষে ছয়টি ঋতুর এই যে বিচিত্র-আবির্ভাব যে শক্তি বলে, সে শক্তিকে আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারিনা।

মানুষ আজ নিজেকে অনেক উন্নত বলে ভাবে। শিল্পে, কলায়, কাব্যে, বিজ্ঞানে মানুষ আজ অনেকটা উন্নতি করেছে - তা ঠিকই; কিন্তু এই উন্নতির ফলে আজ তারা অনেকাংশে প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তার ফলে আবির্ভূত হচ্ছে অকাল বর্ষা, অত্যধিক শীত অথবা উত্তপ্ত-পৃথিবীর আগুন-ঝরা নিঃশ্বাস। এখানে কিন্তু মানুষ অসহায়। এই যে জলচ্ছ্বাস, ঘূর্ণি-ঝড়, দাবানল - এসব প্রকৃতিকে শাসন করার বিপরীত ফল। প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষ চির অসহায়। কাজেই এই যে প্রাকৃতিক শক্তি, যে শক্তির জন্য ঋতুপরিবর্তন হয়, যথাসময়ে সূর্য ওঠে, চন্দ্র সুশীতল কিরণ দেয়, বায়ু বয়, ফুল ফোটে, কোকিলের কুহূ কিংবা ময়ূরের নাচ - এসবই সংঘটিত হয়, তাঁকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? নিশ্চয়ই না। যদি না পারি তাহলে এই শক্তি যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী অর্থাৎ নিয়ামিকা - এটা মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর আমরা এই শক্তিকেই যদি ঈশ্বর বলি তাহলে অসুবিধা কোথায়? বিজ্ঞান কি এই শক্তিকে

অস্বীকার করতে পারবে? নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, যে অলঙ্ঘনীয় শক্তি বলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরাচর, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির উৎপত্তি-বিনাশ, পৃথিবীর ঘূর্ণন - সেই মহাশাক্তিই এই জগৎ এর মূল আদ্যাশক্তি, তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কার? আমাদের শাস্ত্র যদি তাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করে তাহলে অসুবিধা কোথায়? কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান যাকে শক্তি বলছে তা দর্শনের পরিভাষায় ঈশ্বরেরই নামান্তর মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধিঃ।।১।।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।।২।।

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ'।।৩।।

'শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ'।।৪।।

অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি বায়ুসমূহ মধুর হয়; নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে; ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।

রাত্রি এবং দিবস সকল মধুময় হউক; পৃথিবী লোক মধুময় হউক; পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হউন।

অরণ্যাধিপতি দেব আমাদিগকে মিষ্ট ফল দান করুন; সূর্য আনন্দ প্রদায়ক হউন; গরুসকল আমাদিগের নিকট সুখপ্রদ হউন।

মিত্রদেব আমাদের সুখকারী; বরুণ আমাদের সুখপ্রদ ও সূর্য আমাদের আনন্দপ্রদ হউন; দেবগণের পালয়িতা ইন্দ্র আমাদের সুখকারী এবং বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু মঙ্গলপ্রদ হউন।

নিবন্ধীকৃত গবেষণা নিবন্ধটি হল 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ'। প্রথম অধ্যায়ে আমরা মূলত আলোকপাত করেছি 'ভারতীয়-দর্শনে পদার্থতত্ত্ব'-এর ওপর। কারণ জাগতিক বিষয়সমূহকে বাদ দিয়ে জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি সম্পূর্ণ হয় না। আর বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে গেলে অন্যান্য ভারতীয়-দর্শনের দৃষ্টিতে

জগতের স্বরূপ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই প্রথম অধ্যায়ে মূলত ভারতীয়-দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিকভেদে যে নয়টি সম্প্রদায় সমধিক পরিচিত তাদের জগৎ ও জাগতিক বিষয় সম্পর্কে যে অভিমত তা কথঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে জগৎ বিষয়ে যে ধারণাগুলি উঠে আসে তা হল –

নাস্তিক শিরোমণি চার্বাকমতে জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ - এই চারটি মূল উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। তাই এই ভূতচতুষ্টয়কেই তাঁরা জগতের মূল উপাদান মেনেছেন। তাঁদের এই জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁদের প্রমাণতত্ত্বের ওপর। প্রাচীন চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করায় তাঁরা সেই সমস্ত জাগতিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যেগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পেয়ে থাকি; যা কিছু প্রত্যক্ষগম্য নয়, যেমন – অতীন্দ্রিয় আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতির অস্তিত্ব চার্বাক-দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। কাজেই চার্বাকমতে যা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাই, তা নিয়েই আমাদের এই বৈচিত্র্যময় জগৎ রচিত। অন্যদিকে আমরা যদি বৌদ্ধদর্শনের দিকে দেখি তা হলে বুঝতে পারবো জগৎ ও জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন - হীনযানী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায় জাগতিক বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে বস্তুবাদী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। মূল কথা হল তাঁদের মতে, আমরা জগৎকে জানি কিংবা না জানি, জগৎ এবং জাগতিক বিষয়সমূহ অস্তিত্বশীল। যদিও যোগাচার বৌদ্ধ দার্শনিকগণ একমাত্র বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করায়, তাঁদের মতে জগৎ বলতে আমরা যা পাই তা হল নানা প্রকার বিজ্ঞানের সমাহার; বিজ্ঞান-অতিরিক্তভাবে জগৎ বলতে কিছুই নেই। আবার শূন্যবাদী নাগার্জুন প্রমুখ আচার্যগণের মতে স্থায়ী জগৎ বলে কিছুই নেই, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। আর যা পরিবর্তনশীল তার নিজস্ব কোনও স্বভাব থাকতে পারে না। কাজেই তাঁদের মতে জগৎ হল নিঃস্বভাব, এই অর্থে শূন্য। জৈন-দার্শনিকগণ আবার এই বৈচিত্র্যময় জগৎকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে এই জগৎ এবং জগতের যাবতীয় জাগতিক বস্তুমাত্রই অনন্তধর্মবিশিষ্ট। যদিও আমাদের মতো সসীম জীবের পক্ষে

এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগতের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে জানা সম্ভব হয় না। অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় এই নানাত্বের জগতের আংশিক চিত্র আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়। তথাপি, যিনি কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত এমন কেবলজ্ঞানী ব্যক্তিই জগতের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অবগত হয়ে থাকেন।

এখন আমরা যদি সাংখ্য দর্শনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, তাঁদের দর্শনে মূল যে দু'টি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তা হল – প্রকৃতি এবং পুরুষ। এই জগৎ এবং জগতের যাবতীয় জাগতিক বস্তুসমূহ হল প্রকৃতির পরিণাম। জড়স্বভাবা প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে অভিব্যক্ত হয়। পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি জগৎ এবং জাগতিক বিষয়ে পরিণত হয়ে থাকে। কাজেই এই কার্যাত্মক জগৎ আর মূল কারণ যে প্রকৃতি তা স্বরূপতঃ ভিন্ন নয়; এস্থলে কারণটিই কার্যে পরিণত হয়। কাজেই সাংখ্যমতে জগৎ নতুন কোনও সৃষ্টি নয়, তা অব্যক্ত প্রকৃতিরই ব্যক্তরূপ মাত্র। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেও জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলা হয়েছে। তবে অদ্বৈত বেদান্তিগণ ব্রহ্মকেই একমাত্র পারমার্থিক সৎ হিসাবে স্বীকার করায়, এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে তাঁরা মিথ্যা বলেছেন। তবে মিথ্যা বলতে তা আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অলীক নয়। যতক্ষণ জীববুদ্ধি অজ্ঞানরূপী চাদরের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাবহারিক জগৎ তাদের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে পর যখন অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হয়ে যায় তখন জীব উপলব্ধি করে এই মায়িক জগৎ প্রকৃত অর্থে সত্য নয়, তা ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। যদিও রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ ব্যাবহারিক জগৎকে সত্য বলেছেন। কারণ তাঁদের মতে ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ এই দু'টি অংশ যথাক্রমে জীব ও জড়ে পরিণত হয়ে থাকে। কাজেই এই জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ তাঁদের মতে ব্রহ্মেরই পরিণামমাত্র। সৎ ব্রহ্মেরই অংশ হওয়ায় জগৎ এবং জাগতিক বিষয়সমূহ কখনও মিথ্যা হতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়ই নিজ নিজ আঙ্গিকে জগৎ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত 'বৈশেষিক-দর্শনে পদার্থতত্ত্ব' এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা যদি ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তা হলে বুঝতে পারবো, বৈশেষিক-দর্শন মূলত জগৎ-কেন্দ্রিক। জগৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসা থেকেই এই দর্শনের শুরু হয়েছে। যদিও বৈশেষিক-দর্শন একটি আধ্যাত্মিক দর্শন। মুক্তি বা মোক্ষ হল এই দর্শনের মূল অভিপ্রেত। তথাপি পরম কারুণিক মহর্ষি কণাদ তাঁর '*বৈশেষিকসূত্র* গ্রন্থে নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে জাগতিক বিষয়সমূহকে মূল সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স লাভে আবশ্যক বলেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করেই বৈশেষিক-দর্শনের অন্যান্য দার্শনিক প্রস্থানগুলি আবর্তিত হয়েছে। তাই বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত বৈশেষিকাচার্যগণ জাগতিক বিষয়সমূহকে যে সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেই সপ্ত-পদার্থের স্বরূপ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'বৈশেষিক-দর্শনে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়' এই বিষয়ের ওপর যথামতি আলোচনা করেছি। জগৎ-বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে শুরুর দিকে যে প্রশ্নগুলি আমাদের মাথায় আসে, তা হল জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? তা কতকাল বিদ্যমান থাকবে? কিংবা এটি কীভাবে ধ্বংস হতে পারে? এরূপ নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়' বিষয়ের ওপর কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এই আলোচনা করতে গিয়ে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা করেছি।

উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে তত্ত্বগুলিকে নিজেদের আবিষ্কার বলে দাবী করছে এবং বহুজনের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে, আমরা যদি একটু বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করি তা হলে বুঝতে পারবো সেই তত্ত্বগুলি তাদের সর্বপ্রথম আবিষ্কার নয়; বরং আমাদের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ হাজার হাজার বছর পূর্বে সেই সমস্ত তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে গেছেন। সেগুলিকেই

তাঁরা জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে, গ্রীক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদের সমালোচনা করে ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে নিকোলাস কোপার্নিকাসের যে বক্তব্য – 'পৃথিবী নয়, বরং সূর্য স্থির; পৃথিবী তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে' – এই অভিমত কিন্তু তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞানের জগৎ-এ বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই একই কথার প্রতিধ্বনি বিষ্ণু পুরাণে হাজার হাজার বছর আগে ধ্বনিত হয়েছিল এভাবে –

'যৈ র্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ তত্রৈবমুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈ বাস্ত মনং রবেঃ।
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।
উদয়াস্ত মনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ'[১৮৫]।

-অর্থাৎ যে স্থান থেকে সূর্য প্রথম দৃশ্য হয়, সেই স্থানে উদয় এবং যে স্থান থেকে সূর্যকে আর দেখা যায় না, সেখানে অস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয়, অস্ত নেই। তিনি সর্বদাই আছেন। তাঁর দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত। শুধু তাই নয়, *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে – ' স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদোতি' অর্থাৎ সূর্যের অস্তও নেই, উদয়ও নেই। পরবর্তিকালে মহামনীষি আর্যভট্ট (আনুমানিক ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর *আর্যভট্টীয়* গ্রন্থে সগর্বে উল্লেখ করেছিলেন – 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর আকৃতি গোল, গোলাকার পৃথিবী তার নিজের কক্ষপথে আবর্তিত হয় বলেই দিনের পর রাত; রাতের পর দিন আসে। কাজেই বিজ্ঞানের জগৎ-এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের প্রথম প্রবক্তা কোপার্নিকাস কখনওই নন; বরং ভারতীয় আচার্যগণের পূর্বসিদ্ধ এই মতবাদটিকে তিনি নির্ভুল গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য তাঁর *'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'* গ্রন্থের গোলাধ্যায়-অংশে বলেছেন – 'কপিত্থফলবৎ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্' অর্থাৎ পৃথিবীর আকার হল কপিত্থফলের তথা কৎবেলের ন্যায়; উত্তর ও দক্ষিণভাগ চাপা। কাজেই পৃথিবীর আকৃতি বিষয়ে আজকের

[১৮৫] বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (অনুবাদক), *বিষ্ণুপুরাণ,* কলকাতা, শ্রী অরুণোদয় রায়, ১২৯৭, পৃষ্ঠা – ২৪।

বিজ্ঞান যে তত্ত্ব স্বীকার করেন তার প্রতিধ্বনি বহু কাল পূর্বে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণের লেখনীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারংবার। শুধু তাই নয়, ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে – 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি' অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত পৃথিবী স্থির বলে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীর আকার গোল এবং তা আকাশে অবস্থান করছে। কাজেই পৃথিবী যে স্থির নয় বরং চলমান তার আভাস ভাস্করাচার্যের লেখা হতেও পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী আইজাক্ নিউটন আনুমানিক ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 'সমস্ত বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে' এই কথার প্রতিধ্বনি আজ থেকে বহু কাল পূর্বে ভাস্করাচার্যের *'সিদ্ধান্তশিরোমণি'* গ্রন্থের গোলাধ্যায়-অংশে বর্ণিত হয়েছে এভাবে –

'আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে'।

--অর্থাৎ পৃথিবী তার আকর্ষণ শক্তিবলে আকাশস্থ বস্তুকে নিজ কক্ষের অভিমুখে আকর্ষণ করে – যা আমাদের কাছে পতনরূপে মনে হয়। এই আকর্ষণ শক্তিই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নামে অভিহিত। সুতরাং পৃথিবীর আকৃতি, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যের আলোয় চন্দ্র আলোকিত, পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান, এমনকি গাণিতিক পদ্ধতিতে চন্দ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যে অভিমত তা ভারতীয় আচার্যগণের চিন্তায় বহু বহু কাল পূর্বেই উদ্ভাসিত হয়েছিল, পরবর্তিকালে নতুন আঙ্গিকে আধুনিক মানুষের উপযোগী করে সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্যকে বৈজ্ঞানিকগণ জনসমক্ষে প্রকাশ করছে মাত্র।

আজ বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রাদুর্ভাবে জীবকুল জর্জরিত। এভাবে যদি পরিবেশের উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে তা হলে একটা সময় মানুষের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে। তাই আধুনিক বিজ্ঞান আজ সদাব্যস্ত পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার। এর জন্য 'গাছ লাগাও,

পরিবেশ বাঁচাও' শ্লোগান বিশ্ববাসীর মুখে মুখে। জল, আলো, বাতাস ও মাটি – এই চারটি হল আমাদের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। বিশ্বের বিচিত্র প্রাণধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে জল, বাতাস, মাটি প্রভৃতিকে বিশুদ্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই আজকের বিজ্ঞানমুখী মানুষের কাছে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সংরক্ষণ প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য রূপে বিবেচিত। কিন্তু আমরা যদি ফিরে যাই বেদ-উপনিষদের যুগে তা হলে দেখতে পাব, আজ থেকে প্রায় সহস্রাধিক বছর পূর্বে অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিগণ পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য রাখার পথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গেছেন। অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে একটি প্রার্থনা রয়েছে – 'যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রঃ তদপি রোহতু' অর্থাৎ তোমার ভূমিতে যে গাছটি কাটা হল, সেটি পুনর্জাত হোক। সেই সহস্রাধিক বছর পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন আজকের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা তা সবেমাত্র কিছু বছর হল ভাবতে শুরু করেছেন।

আমরা যদি আর্য সভ্যতার দিকে তাকাই, তা হলে সেখানেও দেখব পরিবেশ সচেতনতার ইঙ্গিত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০২ সুক্তের তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে – 'যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুদ্ধম্, কৃতে যেনৌ বপতেহ বীজম্' অর্থাৎ নাঙল জোড়ো, যুগ অর্থাৎ জোয়ালগুলি বিস্তারিত করো। এখানে যে ক্ষেতগুলো তৈরি হয়েছে তাঁতে বীজ বোনো। এই কৃষিই আর্যদের আকাশ-মাটি-জল-স্থলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করেছে। তাই তাঁরা বলেছিলেন –

'ওঁ দ্যৌঃ অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ'।

অথর্ববেদের ঋষি বলেছেন – 'ইমে গৃহাময়ো ভব উর্জস্বন্তঃ পয়স্বন্তঃ' অর্থাৎ এই গৃহ আমাদের সুখের আকর হোক, হোক তেজোময়, হোক জলময়। তেজ মানে রৌদ্র ও আলোক। অর্থাৎ গৃহ হোক আলোকজ্জ্বল। জীবনধারক জলের অভাব যেন গৃহে না ঘটে। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে – 'উপহূতা ইহ গাবঃ উপহূতা অজাবয়ঃ' – আমরা ডাকছি গাভীদের, ডাকছি অজা-অবিদের। মানুষের আর জীবজগতের মধ্যে এই সামীপ্য, সান্নিধ্য ও পারস্পরিকতাই তো নিসর্গ-সংস্থানের প্রাণের কথা। ভবন আর ভূমির এই সমীকৃতি ছিল আর্যদের স্বীকৃত সত্য। তাতে থাকবে আহার, বাসস্থান, নিরাপত্তা আর নীরোগতা। শুধু

'জীবেম শরদঃ শতং' নয় 'অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্' – শতবর্ষ তো বাঁচবই, আর অদীনা অর্থাৎ অপীড়িত হয়েই বাঁচবো। তাই প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা তো বাঁচার উপকরণ নেবই; কিন্তু দস্যু-তস্করের মতো লুটে পুটে নেব না। ভূমিসূক্তে বলা হয়েছে 'গবাং অশ্বানাং বায়সাশ্চ বিষ্ঠা' অর্থাৎ গাভি, অশ্ব, বিহঙ্গের বিশিষ্ট সংস্থান কাম্য। ঋষিদের প্রার্থনা 'ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু' – পৃথিবী আমাদের ঐশ্বর্য ও তেজের মধ্যে যথাযথভাবে ধারন করে থাকুন। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে আছে অক্ষয়তার ইঙ্গিত, আর তেজের মধ্যে আছে জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপসঞ্চয়। ঋষিরা পৃথিবীকে মাতৃরূপেই দেখেছেন – 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ' – ভূমি আমাদের মা, আমরা ভূমির পুত্র। ভূমিসূক্তে বলা হয়েছে – 'পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু' অর্থাৎ পর্বজ্য আমাদের পিতা, তিনি আমাদের পোষন করুন। পৃথিবী গর্ভবতী হন বৃষ্টিপাতে, পর্জন্য সেই বৃষ্টির অধিদেবতা। পৃথিবীর সঙ্গে এই বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের পর নিসর্গ ব্যবহারে আমরা তাস্কর্যের আশ্রয় নিতে পারি না। 'শিলা ভূমিরশ্মা পাংশু সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা' অর্থাৎ শিলা-মাটি-পাথর-ধূলি -সব নিয়ে এই পৃথিবী। সবাই যেন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছি। 'ভূমে মাতর্নির্ধেহি মা ভদ্রয়া সু প্রতিষ্ঠিতম্'। সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াম্ মা ধেহি ভূত্যাম্' অর্থাৎ মাতা ভূমিঃ! তুমি আমাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমি সিসৃক্ষু কবির মতোই, আকাশের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে বিশ্বপ্রকৃতির স্থির আসনে প্রতিষ্ঠিত করো।

আমরা এবার তাকাবো অথর্ববেদের অরণ্যসূক্তের দিকে। সেখানে বলা হয়েছে – অঞ্জনসুগন্ধি বিনা কৃষিতেই বহু আহার্যের জন্মদাত্রী। সমস্ত পশুর জননী, সুরভিতা অরন্যানীকে বন্দনা করি। সর্বত্রই এই কৃতজ্ঞতা, সর্বত্রই সন্তানরূপে প্রার্থনা। সংরক্ষণেরও অপূর্ব সুর বেজেছে এখানে – 'সৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু' – হে ভূমি! তোমার যতটুকু আমি খনন করেছি – তা দ্রুত ভরে উঠুক। 'মা তে মর্ম মৃগ্বরী মা তে হৃদয়ং অর্পিপম্' – এই বিদারণ যেন মৃত্তিকার মর্মঘাতী না হয়, আমি যেন তোমার অন্তস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ না করে ফেলি।

পুরাণাদিতেও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা আমরা পাই। সেখানে বলা আছে – কোনও পশুই বনের পক্ষে বর্জনীয় নয়। কারণ যার যার মতো করে সে সংরক্ষণের কাজ করে। *মহাভারতে*র উদ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে – 'বনং হি রক্ষ্যতে ব্যাঘ্রৈঃ ব্যাঘ্রান্ রক্ষতি কাননম্' – ব্যাঘ্র লুব্ধকদের হাত থেকে বনকে রক্ষা করে, তাই বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করে। সুতরাং "নির্ব্যাঘ্রং ছিদ্যতে বনম্" – বাঘ নিঃশেষ হলেই বনও শেষ। বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, তা শান্তিপর্বে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বিদূর একটি জায়গায় বলেছেন – 'পুস্পং পুস্পং বিচিন্বীত মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ" – ফুল তোলো, কিন্তু গাছ উপড়ে ফেল না। রামায়ণে ওষধি পর্বতকে সর্বরোগের ভেষজের ধারক বলা হয়েছে। লক্ষণ-এর চিকিৎসার ভেষজ বিশল্যকরণী সেখানেই মিলেছিল। অগ্নিপুরাণে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে সর্বফলপ্রদ গৃহরচনার কথা বলা আছে। মৎস্য পুরাণে বৃক্ষ মহৎসব নামে একটি পৃথক অধ্যায়ই রচিত হয়েছে।

পৌরাণিক যুগের একাংশ হল মৌর্য যুগ। মৌর্য যুগে কৌটিল্য বা চাণক্য অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। কৌটিল্য নিসর্গের ভারসাম্য বিষয়ে অবহিত ছিলেন। এজন্য তিনি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য রাজাকে যত্ন নিতে বলেছিলেন। বন সম্পদ যে ধ্বংস করবে তাঁকে শাস্তিদানের বিধানও তিনি দিয়েছিলেন।

পৌরাণিক যুগ থেকে যদি আমরা ধ্রুপদি যুগে আসি তা হলে আমরা পৌঁছে যাব কালিদাসের কালে। কালিদাসের *'কুমারসম্ভব* দেবতাত্মা হিমালয় দিয়ে শুরু। এই হিমালয় অনন্ত রত্নের প্রভব। এখানে রত্ন ভূর্জ আর দেবদারু তরুর মতো অসংখ্য বৃক্ষরাজি। বংশ যেখানে বংশী হয়ে ওঠে রন্ধ্রমারুতে। এক কথায় হিমালয় নিজেই একটি নিসর্গ। মেঘদূতে তো চেতন অচেতনের প্রভেদ বিলুপ্ত হয়েছে। যেখানে মানুষে-দেবতায় গ্রামে-নগরে, ভ্রমরে-কৃষ্ণসারে, রেবা-বিন্ধ্যায় মাখামাখি। উজ্জয়িনীর বর্ণনা তো প্রকৃতিরই বন্দনা। কালিদাসের *'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'* মর্ত্যে স্বর্গের নন্দন কানন। কণ্বমুনি চতুর্থ অঙ্কে বলেছেন – শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাত্রার অনুমতি দেওয়ার তিনি কেউ নয়, অনুমতি দেবে গাছপালারাই। সন্নিহিত তরুদের সম্বোধন করে কণ্বমুনি যখন বলেছেন – 'সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্', তখন কোকিলেরা ডেকে উঠল। বনপ্রকৃতি কোকিলের কণ্ঠে বিদায় অনুমতি জানাচ্ছে। শকুন্তলার রওনা হওয়ার মুখে

তার পালিত হরিণ শিশুটি আঁচল টেনে ধরেছে। সমস্ত নিসর্গ যেন হরিণ শিশুর মূর্তি ধরে বলছে – 'যেতে নাহি দিব'। শকুন্তলা নাটকের একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমরা দেখি দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বসে আছেন। দুষ্মন্তের হাতে একটি জলপাত্র, দূরে দাঁড়িয়ে একটি হরিণ শিশু। দুষ্মন্ত হরিণ শিশুটিকে জল খাওয়ানোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সে এলনা। কিন্তু শকুন্তলা হাতছানি দিয়ে ডাকতেই হরিণ শিশুটি দৌড়ে এল তাঁর কোলে। দুষ্মন্ত হেরে গিয়ে বললেন – 'দ্বাবপি যুবাম্ আরণ্যকৌ' – অর্থাৎ তোমরা দুজনেই যে আরণ্যক।

আলো, বাতাস, জল ও জমি – এই চারটি জীবন তথা বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ। আলো বা তাপের উৎস সূর্য হল ছায়াপথেরই একটি নক্ষত্র। সমস্ত প্রাণের উৎস এই সূর্য। পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে ধর্মের সূচনা সূর্য-উপাসনায়। তবে এক একটি দেশে সূর্য উপাসনার রীতি নীতি এক একরকম। আর্যদের আগে সিন্ধু সভ্যতার যুগেও (খৃঃ পূঃ ২৫০০-৩০০০) সূর্য পূজার প্রচলন ছিল। তারও আগে নব্যপ্রস্তর যুগে সূর্য-উপাসনা যে হত, তার প্রমাণ মিলেছে মধ্যপ্রদেশের সিংহানপুরে, কর্ণাটকের বেল্লারি প্রভৃতি স্থানের পার্বত্য চিত্রে। তবে বৈদিক্ যুগ থেকেই ভারতে সূর্য উপাসনার ছবিটি স্পষ্ট হয়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে – 'সূর্য আত্মা জগতঃ তস্থূসশ্চ' অর্থাৎ এ জগৎ -এর স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুর আত্মা সূর্য। 'আকৃষ্ণেণ রজসা' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা সূর্য উপাসিত হয়েছেন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* বলা হয়েছে – সূর্য হলেন সকল জীবের মধু বা আনন্দস্বরূপ। সুতরাং সভ্যতার সেই ঊষালগ্ন হতে আমরা জ্যোতির ধ্যান করে চলেছি – যা আজও অব্যাহত।

বেদ, *উপনিষদ* তথা ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে বায়ুর উপযোগীতা অবনত মস্তকে স্বীকার করা হয়েছে। বায়ুর অসীম ক্ষমতা। মানব কল্যাণে তার ভূমিকা বার বার বলা হয়েছে। শরীরের অভ্যন্তরে ও বাইরে বায়ুর নানা কার্য কলাপ শাস্ত্রসমূহে বিবৃত হয়েছে। শরীরাভ্যন্তরচারী একই বায়ু নানা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে অভিহিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যখন স্বতন্ত্র একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশই করেনি, সেই সহস্রাধিক বছর পূর্বে বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদির কালে কিন্তু আমাদের ভারতীয় মনীষি যে বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করে গেছেন, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান তার অনুরণন করে চলেছে মাত্র। বৈচিত্র্যেভরা এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা সেই বেদ-পুরাণাদির কাল হতে ভারতীয় আর্য ঋষিগণের লেখনীর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। যদিও জগৎ-বিষয়ক নানান তথ্যসমূহকে তাঁরা বিভিন্ন গল্প-গাথা কিংবা কল্প-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতেন। কারণ তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন মানুষ নীরস তথ্য-কথা শুনতে ততোটা পছন্দ করে না যতটা পছন্দ করে নানা কল্প-কাহিনী শুনতে। তাই সেই সময় জগৎ-বিষয়ক নীরস তথ্যগুলিকে অধিক হৃদয়স্পর্শী করে তোলার জন্য নানা কল্প-কাহিনীর আশ্রয় নেন।

আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাব আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব, যেমন – পরমাণুতত্ত্ব, বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা, জগৎসৃষ্টি এবং তার বিবর্তন প্রক্রিয়া, বস্তুর গুরুত্ব, গতির ধারণা, বলবিদ্যা, অভিকর্ষ শক্তি, শব্দ-পরিবহনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈশেষিক আচার্যগণের যে ব্যাখ্যা তা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও মানুষকে বিস্মিত করে।

বিজ্ঞানী জন্ ডালটন (John Dalton) ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা করেন – আমাদের পরিদৃশ্যমান এই জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহ কতকগুলি অতীব ক্ষুদ্র, নিরেট ও অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। যাদেরকে তিনি পরমাণু (Atoms) নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে এই অবিভাজ্য পরমাণুসমূহের রাসায়নিক সংযুক্তিতে নানা প্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাঁর এই পরমাণুতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ-এ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু আমরা যদি ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের দিকে আলোকপাত করি তা হলে দেখতে পাবো বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ (আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) সর্বপ্রথম বলেছিলেন আমাদের এই বিশ্বজগৎ অসংখ্য ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত। আমরা যদি একটা ঘটকে ভাঙতে শুরু করি তা হলে ভাঙতে ভাঙতে এমন জায়গায় পৌঁছাবো যাকে আর ভাঙা যাবে না, সেই

অবিভাজ্য, নিরংশ কণাসমূহকে তিনি পরমাণু নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে এই অবিভাজ্য পরমাণুসকলই হল পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের মৌল উপাদান। এখানে উল্লেখ্য যে, জন্ ডাল্টনের বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক লিউকিপাস (Leukippus, আনুমানিক ৪৪০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) ও ডেমোক্রিটাস (Democritus, ৪৬০-৩৬০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) জগতের মূল উপাদান হিসাবে অসংখ্য অবিভাজ্য অতীন্দ্রিয় পরমাণুর কথা বলেছিলেন। তবে আধুনিক বিজ্ঞান কিংবা গ্রীক দর্শনে পরমাণুবাদের উল্লেখ থাকলেও সময়ের বিচারে ভারতীয় আচার্য মহর্ষি কণাদকেই এই মতবাদের প্রথম আবিষ্কারক বলাই সঙ্গত।

এখন মনে হতে পারে, জন্ ডালটন (John Dalton) পরমাণুবাদ কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে সমালোচিত। ব্রিটিশ পদার্থবিদ্, জে. জে. থমসন (J. J. Thomson) ১৮৯৭ সালে সর্বপ্রথম দেখান যে পরমাণুর মধ্যে রয়েছে অসখ্য ঋণাত্মক (Negative) আধানযুক্ত কণা, যাকে ইলেকট্রন (Electrons) বলা হয়েছে। এরপর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) প্রোটনের (Protons) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তারও বেশ কিছু বছর পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে জেমস চ্যাডউইক (James Chadwick) নিউট্রন (Neutrons) আবিষ্কার করেন। শুধু তাই নয় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মারে গেলম্যান (Murray GellMann) আবিষ্কার করেন যে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, নিউট্রন ও প্রোটন ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য কণা, যেগুলি প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের কিংবা দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সঙ্গে প্রোটনের সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয়। যেগুলির তিনি নাম দেন কোয়ার্ক (Quarks)। মূল কথা হল আধুনিক বিজ্ঞান পরমাণুকে অবিভাজ্য বলেন না। তাই জন্ ডালটন (John Dalton) প্রদত্ত প্রকল্পটি তথা পদার্থের মৌল উপাদান হল পরমাণু আর তা অবিভাজ্য – এরূপ মত পরিত্যক্ত হয়। কাজেই এই একই আপত্তিটি বৈশেষিকাচার্যগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এর উত্তরে বলা যায়, আমরা যদি বৈশেষিক শাস্ত্র গভীরভাবে অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারবো – জাগতিক বস্তুসমূহকে বিভাগ করতে করতে একেবারে শেষ পর্যায়ে যেখানে পৌঁছাবো, যাকে আর ভাঙা যাবে না, সেই অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশকে বৈশেষিকাচার্যগণ পরমাণু নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে যাকে পরমাণু বলা হয়েছে, তা মাইক্রোস্কোপ

প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণ পদার্থের যে কণা প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় তাকে পরমাণু বলেন না। তাঁদের মতে তা হল পার্থিব-ত্র্যণুক। যাই হোক আধুনিক বিজ্ঞান তার নিজস্ব পদ্ধতিতে জাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন আর ভারতীয় আচার্যগণ তাঁদের দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জগৎ এবং জাগতিক বিষয়সমূহের বর্ণনা করেছেন। তাই পদ্ধতিগতভিন্নতা হেতু উভয়ের মতেরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তথাপি আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহকে যেভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে বৈশেষিকাচার্যগণ বর্ণনা করেছেন, তা আধুনিক মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে বলে আমি মনে করি।

বৈশেষিকাচার্যগণ বহু কাল পূর্বে অতীব ক্ষুদ্র পরমাণুসমূহ হতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রক্রিয়ার যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তা আজকের দিনে বসে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। বৈশেষিকমতে পরমাণু হতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে যুক্ত হতে হতে দৃশ্যমান স্থূল জগৎ আবার এই স্থূল জগৎ অবয়বক্রমে বিভক্ত হতে হতে শেষে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। কাজেই জগতের সৃষ্টি ও সংহারের বর্ণনায় বৈশেষিক-দর্শনে যে ব্যাখ্যা, আর আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও পার্থিব রূপ-রসাদির উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical Changes) বিষয়ক ভাবনার একটা আভাস পাওয়া যায়। বৈশেষিকমতে প্রতিটি পরমাণুর কিছু সামান্য গুণ আর কিছু বিশেষ গুণ থাকে। এ ছাড়াও আরও কিছু গুণ আছে যা পাকজন্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, যেগুলিকে বৈশেষিকাচার্যগণ পাকজ গুণ বলেছেন। প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন – 'পার্থিবপরমাণুরূপাদীনাং পাকজোৎপত্তিবিধানম্'[186] অর্থাৎ পার্থিব দ্রব্যের পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণগুলি হল পাকজ। অভিপ্রায় এই যে, একটা মাটির তৈরি শ্যামবর্ণের ঘটকে যদি আগুনের মধ্যে দিয়ে পোড়ানো হয় তা হলে দেখা যাবে আগুনের অভিঘাতে ঘটটির শ্যামবর্ণ রক্তবর্ণে পরিবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে

[১৮৬] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ২০৭।

সূর্যের আলোক ও উত্তাপের প্রভাবে সবুজ আমকে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করতেও দেখা যায়। এস্থলে পাকজন্য অর্থাৎ তেজ-সংযোগ জন্য পূর্বের কাঁচা আমটির সবুজ বর্ণ, তার গন্ধ, স্বাদ, কাঠিন্য প্রভৃতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এগুলিকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় রাসায়নিক পরিবর্তনের (Chemical Changes) বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাক দু'প্রকার – পীলুপাক এবং পিঠরপাক। 'পীলু' মানে পরমাণু। কাজেই যাঁরা বিশ্লিষ্ট-পরমাণুতে পাক স্বীকার করেন তাঁরা হলে পীলুপাকবাদী। বৈশেষিক সম্প্রদায় হলেন পীলুপাকবাদী। অপরদিকে 'পিঠর' মানে অবয়বী। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় হলেন পিঠরপাকবাদী। যদিও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কেবলমাত্র অবয়বীটে পাক হয়, এমনটা বলেন না। তাঁদের মতে অবয়বীর ন্যায় পরমাণুতেও পাক হতে পারে। তবে পরমাণুতে পাকের জন্য অবয়বীর সম্পূর্ণ বিনাশ এই মতে স্বীকার করা হয় না। যাই হোক বৈশেষিক মতে একটি মৃত্তিকানির্মিত ঘটকে যখন আগুনের মধ্যে দেওয়া হয়, তখন অবয়বী ঘটে কোনওপ্রকার ছিদ্র না থাকায় তেজ কণিকাগুলি অবয়বী ঘটের সমস্ত অবয়ব তথা পরমাণুতে ঢুকতে পারে না। কিন্তু আমরা শ্যামবর্ণের ঘটকে আগুনের মধ্যে দিলে রক্তবর্ণ হতে দেখি। এর ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা বলেন মৃত্তিকা নির্মিত ঘটকে আগুনের মধ্যে যখন দেওয়া হয় তখন আগুনের অভিঘাতজন্য পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এর ফলে বিভাগ উৎপন্ন হয়। বিভাগ হতে তার পূর্বদেশ-সংযোগ বিনষ্ট হয়। ফলত দ্ব্যণুক হতে শুরু করে করে মহাবয়বী ঘট পর্যন্ত সকল অবয়বীই বিনষ্ট হয়ে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। কার্য দ্রব্য বিনষ্ট হলে উষ্ণতার নিরিখে পূর্বরূপের তথা শ্যামরূপের বিনাশ ঘটে। তখন ঐ বিশ্লিষ্ট পরমাণুতে পাক হয় এবং তার ফলে তাতে শ্যামরূপের নাশ হয়ে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। তারপর জীবের অদৃষ্টাদির জন্য পুনরায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ফলত দু'টি দু'টি করে পরমাণুগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে নতুন একটি অবয়বী তথা রক্তঘটের উৎপত্তি হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে বৈশেষিকাচার্যগণ পাকজন্য রূপাদির পরিবর্তন হয় বলে চুপ থাকেননি; কীভাবে সে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান দিনে পদার্থবিদ্যার আলোচনায় গতি (Motion) বিষয়ক আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বৈশেষিকশাস্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করি তা হলে বুঝতে পারবো বৈশেষিক-দর্শনেও গতি বিষয়ক আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বৈশেষিকাচার্যগণ সমস্ত জাগতিক বিষয়সমূহকে যে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তার মধ্যে তৃতীয় পদার্থটি হল কর্ম। 'কর্ম' শব্দটিকে বৈশেষিকাচার্যগণ বৈয়াকরণ যে অর্থে তথা কর্মকারক অর্থে প্রয়োগ করেন সেই অর্থে প্রয়োগ না করে কেবল 'ক্রিয়া' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কারণ কর্ম কারক কখনও দ্রব্য, কখনও গুণ, কখনও ক্রিয়া, কখনও সামান্য, কখনও বিশেষ আবার কখনও সমবায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যগণ 'কর্ম' বলতে কেবল ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। এই ক্রিয়া হল গতিরই নামান্তর। বস্তুর যে অবস্থার জন্য স্থান পরিবর্তন হয় তাকে গতি বলা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে বৈশেষিক-দর্শনের প্রায় অনেকটা অংশ জুড়েই গতির আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর *ভাষ্যে* 'কর্মপ্রকরণ' নামে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে শুধু গতিরই আলোচনা করেছেন। বিশেষ ক্ষণে সংঘটিত যে গতি তাকে বলা হয় 'ক্ষণিক গতি' (Instantaneous Motion)। আচার্য প্র শস্তপাদ বলেন – 'একদা একস্মিন্ দ্রব্যে একমেব কর্ম্ম বর্ত্ততে' [১৮৭] অর্থাৎ বিশেষ এক ক্ষণে একই বস্তুর কেবলমাত্র একটি গতিই থাকতে পারে। যে গতিতে বস্তুর স্থান পরিবর্তন একই দিকে তথা সরল রেখায় সংঘটিত হয় তাকে 'সরলগামী গতি' (Rectilinear Motion) বলা হয়। বৈশেষিক-সম্মত উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি হল এই প্রকারের গতির উদাহরণ। আর যে গতি সরল রেখায় না হয়ে দিক্ পরিবর্তিত হয় সেই গতিকে 'গমন' (Curvilinear Motion) বলে। 'ভ্রমন' (Rotatory Motion), 'স্পন্দন' (Vibratory Motion) প্রভৃতি এই গতির উদাহরণ। বিজ্ঞানিগণ বলেন গতিসৃষ্টির কারণ হল বল (Force)। আমরা যদি স্যার্ আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) গতিসূত্রসমূহ পর্যালোচনা করি তা হলে বুঝতে পারবো তাঁর এই সূত্রগুলির মূলে রয়েছে বল (Force) এর ধারণা। এখন আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের দিকে তাকাই তা হলে বুঝতে পারবো তাঁরাও কিন্তু প্রতিটি জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটা অদৃশ্য 'Force' তথা

---

[১৮৭] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ৪৭৪-৪৮০।

বল-এর ভূমিকা স্বীকার করেছেন। বৈশেষিকাচার্যগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু সকল হতে পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুসমূহে গতিসঞ্চারিত হয়। পরমাণুসমূহ সক্রিয় হলে দু'টি দু'টি সজাতীয় পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক-ত্র্যণুকাদি ক্রমে বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কাজেই ঈশ্বরেচ্ছা রূপ অতীন্দ্রিয় Force তথা বল যে জগতের সৃষ্টি কিংবা সংহারের মূল কারণ তা বৈশেষিকাচার্যগণ বহুপূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন।

সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তা হলে আমরা বুঝতে পারবো আজ হতে সহস্রাধিক বছর পূর্বে বৈশেষিকাচার্যগণের জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণী চিন্তা তা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। আধুনিক বিশ্ব পরমাণুবাদে উন্নত থেকে উন্নততর পথে পা বাড়িয়েছে। একটু কান পাতলে শোনা যায় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে ওপর রাষ্ট্রের শক্তির প্রতিযোগিতা ও পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুঙ্কার। এই পরমাণু-বিজ্ঞানের উৎস খুঁজে পাই যে দর্শনে তা হল বৈশেষিক-দর্শন। বৈশেষিক-দর্শনই পরমাণুর অমিত শক্তির সন্ধান বিশ্ববাসীকে সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন। তবে যে পরমাণু থেকে ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, যে পরমাণুর অসাধারণ ক্ষমতা বৈশেষিক-দর্শনের ছত্রে ছত্রে নিহিত; সেই পরমাণুর প্রয়োগ যাতে মানব-কল্যাণের নিমিত্ত হয়, সেটাই ছিল আর্য-ঋষিগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজ আমরা লক্ষ্য করছি 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' যে শাস্ত্রের উদ্ভব, সেই শাস্ত্রের অভিলাষকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নিজেদের স্বার্থে তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা মেতে উঠেছি বিশ্বের ধ্বংসলীলায়। যে আগুন আমাদের পাকের জন্য উদ্ভূত, তাকে আমরা অন্যের গৃহদাহের নিমিত্ত ব্যবহার করছি। কিন্তু এটা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতবর্ষ শান্তির পিয়াসী একটি দেশ। সকল ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই ভারতবাসীর আদি ধর্ম। তাই প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ তাঁদের অভূতপূর্ব নানান আবিষ্কারকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে প্রচার করে গেছেন জগতের মঙ্গলের জন্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

- আরণ্য, সাংখ্যযোগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৮।
- কবিরাজ, ডঃ গোপীনাথ, *ভারতীয় সাধনার ধারা,* কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৫।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর ন্যায়াচার্য (অনুদিত), শ্রী কেশব মিশ্র বিরচিতা *তর্কভাষাঃ,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৫।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর, *নাস্তিকদর্শনে প্রমাণতত্ত্ব,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর, *নীল আকাশের নীচে,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।
- গোস্বামী, ডঃ শ্রীসীতানাথ (অনুদিত), শ্রী শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত *বেদান্তসার,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৯।
- গোস্বামী, মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (সম্পাদিত), *তত্ত্বমুক্তাবলী* (মায়াবাদ শতদূষণী), কলকাতা, গৌড়ীয় মঠ, ১৩১৯।
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র (অনুদিত), শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩।
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র (অনুদিত), ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত *'সাংখ্য-কারিকা',* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।
- ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র, শ্রীমদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত *বেদান্ত-পরিভাষা,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪।
- চক্রবর্তী, শ্রী অমৃতলাল (সম্পাদিত), *শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন,* বোম্বাই, ভুলেশ্বর বড় মন্দির, ১৩২৪।
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০১৯।
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০২০।

- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮৭।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন,* কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৬৬৩।
- চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা (অনুদিত), মোক্ষাকরগুপ্ত বিরচিত *বৌদ্ধ তর্কভাষা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২০।
- চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা,* কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।
- চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, *চার্বাকদর্শন,* কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
- চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অক্ষয়কুমার, *বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব,* কলকাতা, বারআনা, ১৯৩১।
- চৌধুরী, ডঃ সুকোমল, শ্রীমদাচার্য বসুবন্ধুকৃতা *বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ,* কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালায়, ২০১৭।
- চৌধুরী, শ্রী তারাকিশোর শর্ম্মা*, ওঁ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা* – শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যকৃত ভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন, কলিকাতা, গ্রন্থাকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৩৩।
- জর্জ, ইফতেহার রসুল (অনুদিত), *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর;* স্টিফেন ডব্লু হকিং, ঢাকা, ঐশী পাবলিকেশন, ২০১৫।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৭/এ।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪/বি।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৯।

- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়-পরিচয়,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮।
- তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চানন (সম্পাদিত), *বৈশেষিক-দর্শনম্-* মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্, কলিকাতা, শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩।
- তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত, *শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বসুমল্লিকের ফেলোশিপের লেকচার,* কলকাতা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮২৬।
- ত্রিপাঠী, শ্রী দীননাথ, *মানমেয়োদয়ঃ,* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৯।
- দত্ত শর্মা, রত্না, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
- দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০।
- দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০।
- দাসগুপ্ত, শত্রুজিৎ (অনুদিত), *স্টিফেন হকিং এর কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৩৯৯।
- নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র (সম্পাদিত), *চরক-সংহিতা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪।
- নিজামী, মাহমুদুল হাসান, *সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান,* ঢাকা, রোদেলা, ২০১৮।
- পাল, শ্রী মহেশ চন্দ্র(অনুদিত), *সাংখ্যদর্শনম্-* শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত প্রবচন ভাষ্য সহিতম্, কলকাতা, শ্রী মহেশ চন্দ্র পাল, ১৮০৭।
- পাত্র, সুধাংশু, *প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান,* কলকাতা, বাণীশিল্প, ১৩৬৭।
- বড়ুয়া, সুভূতিরঞ্জন, ভদন্ত অনুরুদ্ধাচার্য বিরচিত *অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫।
- বন্দোপাধ্যায়, নবনারায়ণ (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণযজ্ববিরচিত *মীমাংসা-পরিভাষা,* কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩।

- বসু, রণদীপম, *চার্বাকেতর ভারতীয়দর্শন ঃ পূর্ব-মীমাংসা,* তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭।
- বসু, রণদীপম, *চার্বাকের খোঁজে ঃ ভারতীয়দর্শন,* ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭।
- বসু, রণদীপম, *নাস্তিক্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ,* ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৮।
- বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ, *বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রী মাধ্ব,* ঢাকা, শ্রী সুপতিরঞ্জন নাগ, ১৯৩৯।
- বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (অনুবাদক), *বিষ্ণুপুরাণ,* কলকাতা, শ্রী অরুণোদয় রায়, ১২৯৭।
- বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য, শ্রী পূর্ণচন্দ্র (সংকলিত), *পাতঞ্জলদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৮৯৮।
- বেদান্তবাগীশ, শ্রী কালীবর, *সাংখ্যদর্শন,* কলকাতা, রয় প্রেস, ১৮৭৭।
- বেদান্তবাগীশ, শ্রীকালীবর, *পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ পরিশিষ্ট,* কলিকাতা, শ্রী হীরালাল ঢোল, ১২৯১।
- ব্রজবিদেহী, মহন্ত শ্রীস্বামী সন্তদাসজী, *ওঁ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, ১৩৯২।
- ব্রহ্মচারী, ডঃ মহানামব্রত, ভারতীয়-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা, কলিকাতা, শ্রী মহানামব্রত কালচারাল অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯২২।
- ব্রহ্মচারী, ডঃ মহানামব্রত, *ভারতীয়-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা,* কলিকাতা, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৫৯।
- ব্রহ্মচারী, শ্রী শীলানন্দ, *অভিধর্ম-দর্পণ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৭।
- ভট্টাচার্য শাস্ত্রিনা, শ্রীপঞ্চানন (অনুবাদক), শ্রীমৎ সায়ণমাধবকৃত *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে প্রথমং ঃ চার্বাক-দর্শনম্,* আগড়পাড়া-২৪ পরগনা, শ্রী সাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪।
- ভট্টাচার্য, করুণা, *ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩।
- ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী,* কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০।

- ভট্টাচার্য, ডঃ চন্দন, শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য বিরচিত *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪।
- ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীঝর্ণা, *অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,* কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮২।
- ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৮।
- ভট্টাচার্য, মধুসূদন (অনুদিত), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্,* কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬।
- ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮।
- ভট্টাচার্য, শ্রী বিশ্ববন্ধু, *অনুমানচিন্তামণি,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।
- ভট্টাচার্য, শ্রীরামশঙ্কর (সম্পাদিত), পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্; তত্ত্ববৈশারদীসংবলিত ব্যাসভাষ্যসমেতম্, বারাণসী, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৬৩।
- ভট্টাচার্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত *বেদান্ত পরিভাষা,* কাঁথি, শ্রীনাথ ভবন, ১৩৭৭।
- ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩।
- ভট্টাচার্য্য, শ্রী অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ, *বৈভাষিকদর্শন,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫।
- ভট্টাচার্য্য, শ্রী, শ্রীমোহন, শ্রীমদাচার্যোদয়ন-প্রণীতঃ *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।
- ভট্টাচার্য্য, সুখময়, *পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।
- ভিক্ষু, শ্রী বিজ্ঞান, মহর্ষিকপিল-প্রণীত *সাংখ্যদর্শনম্,* কলিকাতা, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল, ১৮০৭।
- মহাপ্রজ্ঞ, আচার্য, *জীব-অজীব,* লক্ষ্ণৌ, জৈন বিশ্ব ভারতী, ২০০৩।
- মহাস্থবির, শ্রীধর্ম্মাধার (অনুদিত), মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রণীত *বৌদ্ধদর্শন,* কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, ১৩৬৩।

- মিশ্র, অধ্যাপক শ্যামাপদ, শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য প্রনীতঃ *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* (প্রথমদ্বীতিয়স্তবকমাত্রম্), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০।
- মিশ্র, মহামহোপাধ্যায় শালিক নাথ, *প্রকরণ-পঞ্চিকা,* কাশী, হরিদাস গুপ্ত, ১২০৪।
- মুৎসুদ্দি, শ্রী বিরেন্দ্রলাল, *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪।
- মুনি, নথমল, *জৈনদর্শন কি মৌলিক তত্ত্ব,* কলকাতা, মতিলাল বেংগানী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ২০০০।
- মোহান্ত, দিলীপ কুমার, *মধ্যমকদর্শনের রূপরেখা ও নাগার্জুনকৃত সবৃত্তিবিগ্রহব্যবর্তনী,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫।
- শর্মা, ডি আর বি এন কে (সম্পাদিত), শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত *শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্,* ব্যাঙ্গালোর, পূর্ণপ্রজ্ঞ রিসার্চ ইন্সিটিউট অব পূর্ণপ্রজ্ঞ ট্রাস্ট, ১৯৬৭।
- শর্ম্মা, শ্রী সতীশচন্দ্র, *চরক-সংহিতা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩১১।
- শাস্ত্রী, দক্ষিনারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* তৃতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* দ্বিতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ এবং ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ব্রহ্ম-পুরাণ,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯।
- শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমৎ-সায়ণমাধবকৃত *সর্বদর্শন-সংগ্রহে প্রথমং চার্বাক দর্শনম্,* আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪।

- শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৩৯২।
- শ্যামসুখা, শ্রী পূরণচাঁদ, *জৈনদর্শনের রূপরেখা,* কলকাতা, আর এন চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৫৫।
- সপ্ততীর্থ, শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১।
- সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ (সম্পাদিত ও অনুদিত), *মীমাংসা-দর্শনম্,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪১৬।
- সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ (সম্পাদিত ও অনুদিত), *মীমাংসা-দর্শনম্,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭।
- সরকার, তমোঘ্ন, *জৈন জ্ঞানতত্ত্ব ও তর্কপরিভাষা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২১।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্তদর্শনের ইতিহাস,* তৃতীয় ভাগ, বরিশাল, শ্রী শঙ্কর মঠ, ১৩৩৪।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস,* দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ট্রাস্ট, ১৩৩৪।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস,* প্রথম ভাগ, বরিশাল, শ্রী শঙ্কর মঠ, ১৩৩২।
- সরস্বতী, স্বামী প্রত্যগাথানন্দ, *পুরাণ ও বিজ্ঞান,* কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ , ১৯৬২।
- সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ (অনুদিত ও সম্পাদিত), *শ্রীভাষ্যম্,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৯।
- সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার, শ্রী জয়ন্তভট্টকৃত *ন্যায়মঞ্জরী,* কলকাতা, সদেশ, ২০০৬।
- সাধুখাঁ, সঞ্জিতকুমার (সম্পাদিত), আচার্য ধর্মকীর্তি বিরচিত *ন্যায়বিন্দু,* কলকাতা, সদেশ, ২০০৭।

- সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসা-পরিচয়,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।
- সেন, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ, *বিজ্ঞানের ইতিহাস,* দ্বিতীয়খণ্ড, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ১৯৫৮।
- সেন, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ, *বিজ্ঞানের ইতিহাস,* প্রথমখণ্ড, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ১৯৬২।
- স্বামী, ভর্গানন্দ (অনুদিত), পাতঞ্জল *যোগদর্শন সূত্র,* সূত্রানুবাদ, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও মন্তব্য, কলকাতা, স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।
- Bartusiak, Marcia, '*The Day We Found the Universe*', New York, Pantheon Books, 2009.
- Bhattacharya, Sri Gadadhara, *Saktivada*, Benres City, Chowkhamba Sanskrit Series, 1929.
- Bhavgava, Dr. Dayanand, Mahopadhyaya Yasovijaya's *Jaina Tarka Bhasa,* Delhi, Motilal Banersidas, 1973.
- Griffith, R. T. H, and G. Thibaut PH, *Tantravartika* by Bhatta Kumarila, Benares, Benares Sanskrit Series, 1882.
- Hawking, Stephen, *A Brief History of Time*, London, Bantam Books, 1988.
- Jain, Vijay K. (ed.), Acharya Umasvami's *Tattvartha Sutra*, Calcutta, Vira Sasana Sangha, 1960.
- Jha, Ganganath(ed.) *Slokavartika* with the commentaries "Kasika" of Sucarita Misra and *'Nayaratnakara'* of Partha Sarathi Misra, India, Sri Satguru Publications, 1983.
- Kak, Subhash, , Stillwater, U.S.A., Oklahoma State University, 2016.

- Kalupahana, David J. (ed.), *Mulamadhyamakakarika* of Nagarjuna, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2015.
- Kaviraja, Gopinath (ed.), *Kiranavali Prakasa* by Vardhamana Upadhyaya, Allahabad, 1936.
- Misra, sri Narayana (ed.), SriSankarMisra's *Vaisesikasutropaskara* with the '*Prakasika*' hindi commentary by Acarya Dhundhirajasastri, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1969.
- Ramanan, K. Venkata, *Nagarjuna's Philosophy as Present in The Maha-Prajnaparamita-Sastra*, Delhi, Motilal, Banarsidass Publishers Private Limited, 2016.
- S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, volume-1, New Delhi, Oxford University press, 2008.
- Sastri, Gaurinatha (ed.), *Kiranavali-Rahasyam* of MM Mathuranath Tarkavagisa, Varanasi, Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 1981.
- Sastri, Mimamsa Ratnam pt. A. Subrahmanya(ed.), *Prakarana Pancika* of Saliknath Misra with the Nyaya-Siddhi of Jaipuri Narayana Bhatta, Kashi, Banaras Hindu University, 2013.
- Sastri, Pandit Harihara and Pandit Dhundhiraja Sastri (ed.), *Nyalilavati* by Vallabhacharya, Benares, Chowkhamba Sanskrit Series, 1934.
- Sastri, pt. Haragovinda, *Amarkosa*, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1998.
- Sastri, T. Ganapati(ed.) *Manameyodaya* of Narayana Bhatta and Narayana Pandita, Trivandrum, The Maharajan of Travancore, 1992.

- Sengupta, Kaviraja Shree Narendranath and Kaviraja Shree Balaichandra Sengupta, *Charaka-Samhita* by Maharsi Caraka with 'Ayurvedadipika' commentaries of Srimat Cakrapanidatta and 'Jalpakalpataru' explanatory notes and annotations of Mahamahopadhyaya Sri Gangadhar Kaviraja, Varanasi, Chaukhambha Orientalia, 1991.
- Shamashastry, R., *Tantrarahasya* by Ramanujacharya, Baroda, Central Library, 1923.
- Swami, Yogindrananda (ed.), *Pramanavartik* of Dharmakirti, Varanasi, Saddarsana Prakasan Sansthan, 1991.
- Tailanga, Ramasastri (ed.), Sivaditya's *Saptapadarthi* with The Mitabhashini of Madhava Sarasvati, Vol- Vi, Benares, E. J. Lazarus & Co., 1893.
- Tarkartirtha, Amarendra Mohan and Narendra Chandra Vedantatirtha (ed.), Sivaditya's *Saptapadarthi* (with three commentaries), Calcutta, Metropolitan Printing House Limited, 1994.
- Telang, Mangesh Ramakrishna (ed.), Shri Vallabhacharya's *Nyayalilavati,* Bombay, Tukaram Javaji, 1915.

Articles and Book chaptersঃ

- ব্যানার্জী, ডঃ কল্যাণ, *“নব্য-ন্যায়দর্শনে পদের অর্থ নির্দেশ”,* ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অব ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিস (IRJIMS), ভলিউম- I, ইস্যু-XII, (জানুয়ারি, ২০১৬) ঃ পৃষ্ঠা- ১-৬।

  httpঃ //www.irjims.com
- ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন* (জড়বাদ), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ঃ প্রথম ভাগ, সম্পাদক ঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, আর্ দেশির রাতন্ জি ওয়াড়িয়া, ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, হুমায়ুন কবির, ১৪৫-১৫২, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৬।
- রায়, ডঃ সব্যসাচী, “*সৃষ্টির রহস্য ঃ বিজ্ঞান, দর্শন ও স্টিফেন হকিং*”, প্রতিধ্বনী দ্য ইকো, ভলিউম- VII, ইস্যু- III, (জানুয়ারি, ২০১৯) ঃ পৃষ্ঠা - ৫৮-৬২।

  httpঃ //www.thecho.in
- Ghosh, Prasit Ranjan, ‘*‘The Concept of Motion”.* The Vaisesika Philosophy and Modern Science”, JETIR, Vol-7, Issue-2 (Feb, 2020)ঃ Page-256-259.

  www.jetir.org
- Gokhale, Pradeep P, *“The Terms Padartha and Prameya in the context of “Nyayasutra”*, Philosophy East and West, Vol. 32, No. 2, page- 207-2011, Hawai, Hawai University Press, 1982.

  httpsঃ //doi.org/10.2307/1398718
- Jain, Dr. Sonam and Dr. Rani Singh, *“The applied aspect of Karma in Ayurveda”*, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), Vol-5, Issue-04, December 2018ঃ 997- 1006.

  www.ijrar.org

- Kapoor, K, *"Concept of Padartha in Language and Philosophy",* Bulletin of the Decean College Post-Graduate and Research Institute, vol. 54/55, Page – 197-221, Pune, Decean college Post-Graduate and Research Institute, 1995.
  httpsঃ //www.jstor.org
- Kumar, A. Dubey S.D., S. Prakas and Singh P*., "Principle of Dravyaguna (Ayurvedic Pharmacology)",* Biomedical & Pharmacology Journal, Vol.-4,(1), July, 2011ঃ 147-152
  httpঃ //biomedpharmajournal.org/?p=1785
- Patel, Dr. Shruti, Dr. Vijay Vitthal Bhagat and Dr. Krishna Rathod, "*A Comprehensive and Comparative view of Gunas in Ayurveda and vaisesika",* International Journal of Advanced Research (IJAR), 7(7), (July 2019)ঃ 576-587.
  www.journalijar.com
- R. A. Alpher, H. Bethe, G. Gamow, "The Origin of Chemical Elements", American Physical Society, Vol 73, Iss. 7 (1st April, 1948) ঃ 803-804
  httpsঃ //doi.org/10.1103/PhysRev.73.803
- Rao, A. Venkoba, *"Mind in Ayurveda*", Indian Journal of Psychiatry, 44(3) (2002)ঃ Page 201-211
  httpsঃ //journals.iww.com
- S. G. Ashalatha, "*The Indian Tradition of Physics in Vaisesika",* International Journal of Novel Research and Development (IJNRD), Vol-7, Issue 11 (November, 2022), Page-168-170.
  www.ijnrd.org

- S. Rekha Bajpaimona, Maik Meenakshi and Shivudu K. Venkat, "*Englightening the role of Samanya and Visesa Siddhanta in Chikitsa Aspecet",* International Journal of Ayurveda and Pharma Research, Vol-4, Issue 5, May 2016 ঃ 56-621.

  Httpঃ //ijapri.in

- Uzma, A. Qureshi, Bhatkar and Arun U., *"Conceptual Study of Samanya Vishesh Siddhanta in Treatuent of Amlapitta (Hyperacidity)*", International Journal of Resrarch in Ayurvedda and Medical Sciences, Vol.-3, Issue 1, Jan-Mar, 2020ঃ 67-71,

  httpsঃ //www.ijrams.com

কিছু গ্রন্থ ভীষণ খারাপ অবস্থায় পাওয়ার জন্য সেখানে প্রকাশকের নাম, তারিখ প্রভৃতি বোঝা সম্ভব ছিল না, তাই সেই গ্রন্থগুলি এখানে উল্লেখ করা যায়নি।